জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

"বনফুল"

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫০

পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৫১, অগ্রহায়ণ ১৩৫২,

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড

বেলগাছিয়া

কলিকাতা-৩৭

সাড়ে চার টাকা

সহযাত্রী সুহৃৎ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

ভাগলপুর
২৪. ৪. ৪৩

জঙ্গম

প্রথম অধ্যায়

১

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভিড়। সেই ভিড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের বেশি সময় নাই। হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় স্লো ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভিড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়!

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরিও হইয়া গেল, পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্যন্ত নাই, হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু-হাতে দেখা করিতে পারে না তো! বাহিরের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জনতার মত তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভিড় করতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর-জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে

এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছন দিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং এক ফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য সৃজন করিয়াছিল—এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি-উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়!

এই গ্যানৃঢঅ—গ্যানৃঢঅ—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভন্টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভন্টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যানৃঢ' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্তা ভন্টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভন্টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান-বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াই শঙ্কর ভন্টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে শুরু করিবে, এমন সময় আবার ডাক আসিল—

চায় গ্যানৃঢঅ—

শঙ্কর আবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, হ্যারিসন রোডের একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকারে ভন্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিক্‌ল, ডান হাতে ছোট একটা প্যাকেট—নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি-গোছের। শঙ্কর আগাইয়া যাইতেই ভন্টু তাহাকে বলিল, বাইকটা একবার ধর্ তো, এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে।

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল, তুই এখানে হঠাৎ?

দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।

ভন্টুর চোখ দুইটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, দাড়ি ?

দাড়ি। চরম লদ্‌কালদ্‌কি!

এই এক পুঁটুলি দাড়ি!

জটাও আছে। জটিল লদ্‌কালদ্‌কি!

শঙ্কর বলিল, তুই আজকাল কলেজে যাস না কেন ? থিয়েটারে ঢুকেছিস নাকি ?

ভন্টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্বেই শঙ্কর বলিল, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ, জানিস না ?

তাই নাকি ? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই ? যা, আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যান্‌থার আমাকে খেয়ে ফেলবে।

প্যান্‌থার কে ?

ছোটবাবু।

ছোটবাবু কে ?

আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি, সেই আপিসের ছোটবাবু। ইয়া চোয়াল, ইয়া লাল চোখ, চাম লদ্‌! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যান্‌থার রসিক আছে। যাক, চললাম ভাই আমি। উৎপলকে ব'লে দিস, বিলেত যাচ্ছে যাক—দক্‌চে না যায়। চললাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল, তুই চাকরিতে ঢুকেছিস নাকি ? কিছু জানি না তো! পড়াশোনা ছেড়ে দিলি ?

আসছে বছর আবার শুরু করা যাবে।

ভন্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভন্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়তো দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভন্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আড়ময়লা-বুক-খোলা-জামা-পরা হাস্যমুখ ভন্টুকে সে যেদিন প্রথম ক্লাসে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভন্টু তেমনই নোংরা আছে। কিন্তু আর তো তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না! শঙ্কর ভন্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়িতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়ার পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল, উৎপলের কথা নয়, ভন্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভন্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানা রকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটাতে এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভন্টুর বাসা। যাওয়াই মুশকিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে, ভন্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভন্টুর বাসার দূরত্ব নহে; অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের পর হইতেই শঙ্কর ভন্টুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরের অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্তায়, আচারব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব। সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা আছে। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ে মানুষ। মফস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই. এস-সি., বি. এস-সি.-টাও মফস্বলের কলেজেই কাটিয়েছে।

সুরমার মত মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার

মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলেত যাওয়াটাকে উপলক্ষ্য করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌঁছিল, তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশি বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকি ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল, উৎপল একদল নরনারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল, এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হ'লে! আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হ'ল না! ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। স্লিপিং স্যুটটা বাক্সের ভেতরেই থেকে গেছে। সুরমা, বার ক'রে ফেল না—ওই বড় স্যুটকেসটায় আছে, এখুনি তো দরকার হবে।

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল। বড় বড় লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত সুরে বলিল, এ কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ, এত সেন্টিমেণ্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট-কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল তো একটু পরে শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করছে দেখ!

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিতমুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল, বিছানার এক ধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক ক'রে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্যন্ত।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ভালই তো।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যভরে উৎপল কহিল, তুমি কবি মানুষ, তুমি তো বলবেই। বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা—পথি নারী বিবর্জিতা—

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র-আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম্ তুই।

গাড়ির ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্‌লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন।

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন-কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন, তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। পরিপাটীরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না-পরিলে তাঁহাকে মানাইবে—এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে, তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি, এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বইকি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাশ খাটবার মত একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে তো! এইবার আসুন, আদব-কায়দামত আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়। আর ইনি হচ্ছেন মিসেস মিত্র—প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী, আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টিদিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসছেন, উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন, ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়; ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন; ডাকনাম ওঁর সোনাদিদি। আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন মিস মিত্র—বেথুনে বি. এ. পড়ছেন; ওঁর ডাকনাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ, সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া পরোপকারী এবং সর্বোপরি কবি।

যাব।

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কে ইহারা? ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু! জীবনে ইতিপূর্বে সে আর কোনদিন কোন যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল, তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না তো! ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও তো কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে! মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়ার পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃতকন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি!

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভন্টু তাহার অপেক্ষায় কমন-রুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ঘোর জালে প'ড়ে ফের এসেছি ভাই।

কি হ'ল?

ভীম জাল।

মানে?

মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছে।

ভন্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, তাই নাকি?

একেবারে থলথলে কাণ্ড! মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন! ইয়া নদ্‌নদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার!

শঙ্কর বলিল, তাই নাকি ?

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিস কেন ?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, মেজকাকা চাকরিটা যদি পায়, তবেই না ভাল। সেইজন্তেই তো তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই যদি একটু বোস সায়েবকে অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হ'লেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি, মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্ত কিছু। গুরুর আদেশ নেই।

শঙ্কর শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ ? তোকে তখন জিজ্ঞেসই করা হয় নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল ?

দাদাকে নিয়েই তো মুশকিল। দাদার আবার জ্বর শুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেইজন্তে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হ'ল। পেয়েও গেলাম একটা। কি করি বল্ ? দাদার হাফ পে-তে ছুটি। সংসার তো চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, তিনি পদ্মাসনে ব'সে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় প'ড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সায়েবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন ? এই সময় বোস সায়েব বাড়িতে থাকে।

এখুনি ?

দেরি ক'রে লাভ কি ?

এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধ হয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চ'লে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।

আচ্ছা।

ভন্টু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভন্‌টু বলিল, গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস ?

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল, ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। বলিল, কাছে তো নেই ভাই।

ওপর থেকে নিয়ে আয়।

কি করবি পয়সা নিয়ে ?

কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তার পর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাই নি। পেটে এ রকম আগুন জ্বলছে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট্‌ ক'রে নিয়ে আয় চারটে পয়সা।

শঙ্কর উপরে গিয়া ভন্‌টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভন্‌টু চলিয়া গেল।

শঙ্করও উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এখানে থাকেন ?

হ্যাঁ, আমিই। কি চাই ?

চিঠি আছে।

কই, দেখি ! আমার নামে ?

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারীহস্তে লেখা।

চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা টী-পার্টি আছে। আপনাকে আসতে হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়তো আপনি কলেজে থাকবেন, কোথায়

আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলেছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আমুন আর নাই আমুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, আচ্ছা, যাব।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমন-রুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেন সে যে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভন্টুর কথাই ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল, তাহার মায়ের পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্ছিতা যুবতীর কথা? না, কিছুই তো নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল, যখন টং টং করিয়া নয়টা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

২

ভন্টুর বউদিদি বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোওয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার উপরেই একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবমবর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলির একটি তরকারি হইবে। খোসা-চচ্চড়ি ভন্টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে, তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ঐ স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক, তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছর এগারোর

বউদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, আবার বিয়ে করলে মৃন্ময়-ঠাকুরপো?

ভন্টু গম্ভীরভাবে বলিল, এ বউটাও পালাবে।

বউদিদি বলিলেন, আচ্ছা, বউটার কোনও খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃন্ময়-ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা।

লুদ্দুর, লুদ্দুর—

ভন্টু ভঙ্গীভরে শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে লাগিল।

বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

ভালবাসত না?

নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।

বউদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, পুরুষরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।

লুদ্দুর লুদ্দুর—

সত্যি, ভারি আশ্চর্য লাগছে কিন্তু।

হাসিয়া বউদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভন্টু হাঁকিল, এই ফন্তি, পান দিয়ে যা মাকে।

ফন্তি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন; বউমা, ডাল নামল তোমার?

বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে, চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখে মুখে হাসি।

ভন্টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

৩

শঙ্কর এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

সামান্য চা-খাওয়ানো ব্যাপারটা যে এতদূর কবিত্বময় করা সম্ভব, সদ্য-মফস্বল-আগত শঙ্করের তাহা ধারণাতীত ছিল।

কি পরিপাটী আয়োজন !

গৃহসংলগ্ন উদ্যান-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে শুভ্র আস্তরণ। তাহার উপর একটি ফুলদানি, প্রত্যেকটিতে দেশী-বিদেশী নানারকম ফুল। ইহা ছাড়া প্রতি টেবিলে সিগার, সিগারেট, ছাই ফেলিবার পাত্র ও ছোট ছোট কাচের জলপূর্ণ বাটি। বাটিগুলির পাশে পাট-করা পরিষ্কার ছোট ছোট তোয়ালে। প্রত্যেক টেবিলে দুইটি করিয়া বেতের চেয়ার। শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহার মন এই মার্জিতরুচি পরিবারটির উপর সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

শঙ্কর একটু আগেই গিয়াছিল, তখনও অন্যান্য অতিথিবর্গ আসিয়া পৌছান নাই। এমন কি, প্রফেসার মিত্র তখনও পর্যন্ত কলেজ হইতে ফিরেন নাই। শঙ্কর গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উদ্যানে সজ্জিত টেবিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সলজ্জকণ্ঠে কে বলিল, এই যে, আপনি এসে গেছেন—আসুন, নমস্কার।

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া দেখিল, রিনি।

একটা ট্রেতে অনেকগুলি খালি পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে একজন বেয়ারা, তাহার হাতে একটি ট্রে এবং তাহাতেও পেয়ালা, দুধ রাখিবার পাত্র, চিনির পাত্র, ছাঁকনি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম।

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল এবং রিনির হাত হইতে ট্রেটা লইবার জন্য হাত বাড়াইল—দিন, আমাকে দিন।

রিনি মৃদু হাসিয়া লজ্জায় মুখটি একটু নত করিল, ট্রে কিন্তু শঙ্করের হাতে দিল না। তাড়াতাড়ি নিজেই গিয়া তাহা একটি টেবিলের উপর রাখিল এবং বেয়ারাটার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুই এগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখ্ ততক্ষণ। দেখিস, আবার যেন ভাঙিস না কিছু। তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আসুন।

শঙ্কর রিনির পিছন পিছন চলিল।

একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কাউকে দেখছি না !

বউদি সোনাদি সব ওপরে। দাদা এখনও ফেরেন নি কলেজ থেকে।

ইহার পর আর কি বলিবে, শঙ্কর ভাবিয়া পাইল না। নীরবে রিনির দোদুল্যমান বেণীভঙ্গিমা দেখিতে দেখিতে তাহার পিছন পিছন আসিয়া সে ড্রয়িং-রূমে ঢুকিল। বেণী-দোলানো রিনি আর স্টেশনে-দেখা রিনি—দুইজনে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রসাধনের সামান্য ইতরবিশেষে মানুষটাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। অতি সাধারণ একটা আটপৌরে রঙিন শাড়ি, কাঁধের কাছে সাধারণ রকম এম্ব্রয়ডারি করা একটা ব্লাউজ, হাতে দুইগাছি করিয়া পাতলা সোনার চুড়ি, কানে দুল, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথায় দোদুল্যমান বেণী। এই অতি সাধারণ বেশেই রিনিকে অত্যন্ত অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ড্রয়িং-রূমে ঢুকিয়া রিনি বলিল, আপনি বসুন। আমি এগুলো ফেলে দিই ততক্ষণ।

কি ফেলে দেবেন ?

এই যে।

শঙ্কর দেখিল, একটা ভাঙা পোর্সিলেনের বাসনের টুকরা চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।

রিনি বলিল, বেয়ারাটার হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেল টী-পটটা।

রিনি টেবিল হইতে একটা খবরের কাগজ লইয়া টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল। শঙ্করও হেঁট হইয়া কুড়াইতে শুরু করিল।

রিনি বলিল, আপনি বসুন না।

সেটা ভাল দেখায় না।

রিনি কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রতিবাদ করিল না। দুইজনেই কুড়াইতে লাগিল।

কুড়ানো শেষ হইলে রিনি টুকরাগুলি খবরের কাগজটাতে মুড়িয়া বলিল, আপনি তা হ'লে বসুন একটু। আমি বউদিদিদের খবর দিই।

রিনি চলিয়া গেল।

শঙ্কর একা বসিয়া বসিয়া ড্রয়িং-রূমের আসবাবপত্রাদি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সুন্দর দামী 'সেটি', মেঝেতে কার্পেট পাতা। সামনের দেওয়ালে

একটি ছোট, কিন্তু দামী আয়না। সেই দেওয়ালেই দুইখানি বড় বড় অয়েল্‌-পেন্টিং ছবি—দুইখানিই নারীমূর্তি, এলিজাবেথান যুগের পোশাক-পরিহিতা স্বাস্থ্যবতী তরুণী দুইটি। চোখের নীলিমা ও গালের লালিত্য মুগ্ধ করে। অপর একটি দেওয়ালে বিরাট একখানা দেওয়াল-জোড়া ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য—সেকালের যুদ্ধক্ষেত্র। নানাভাবে উত্তেজিত অশ্ব ও অশ্বারোহীর দল একটা নিষ্ঠুর সংঘর্ষকে যেন মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। ভিতর হইতেই দেখা যাইতেছে, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট হ্যাট-র‍্যাক এবং তাহার সঙ্গেই ছড়ি রাখিবার র‍্যাক। ঘরের এক কোণে ছোট একটি গোল শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কালো পাথরের নটরাজ, আর এক কোণে অনুরূপ টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি—পাথরের নয়, পিতলের। আয়নার দুই পাশে ছোট ছোট দুইটি কাঠের সুদৃশ্য ব্র্যাকেট। ব্র্যাকেটের উপর উন্মুক্তবক্ষা বঙ্কিমতনু প্রস্তরময়ী দুইটি রমণী—অজন্তা-শিল্পের নিদর্শন। দেওয়ালে একটি বড় ঘড়ি। পাশের ঘরেই টেবিলের উপর ফোন দেখা যাইতেছে।

হঠাৎ ঝনঝন করিয়া ফোনটা বাজিয়া উঠিল। কাছে-পিঠে বোধ হয় কেহ ছিল না, অন্তত ফোনের ডাকে কেহ সাড়া দিল না। একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে উঠিয়া গিয়া ধরিল।

হ্যালো, কে আপনি ?

আমি ? আমি অপূর্ব। আপনি কে ?

আমাকে চিনবেন না, চা-খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছি, আমার নাম শঙ্কর।

ও, আমারও যাওয়ার কথা ; কিন্তু আই অ্যাম সো সরি, মিস রিনি দুঃখিত হবেন জানি ; কিন্তু আই কান্‌ট্‌ হেল্‌প্‌। এইটে জানাবার জন্যেই ফোন করছি।

আচ্ছা, ওঁরা কেউ এখন নীচেয় নেই, এলে আমি ব'লে দেব।

শঙ্কর রিসিভারটা রাখিয়া দিল।

কে এই অপূর্ববাবু ? মেয়েমানুষের মত গলার স্বর।

তাহার একা ড্রয়িং-রুমে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আদি সাজানো প্রায় শেষ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে বিনীতভাবে বলিল, বসুন হুজুর। দিদিকে ডেকে দিই।

না, ডেকে দেবার দরকার নেই। বাগানটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বেয়ারা ভিতরে চলিয়া গেল।

শঙ্কর এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নানাজাতীয় মরসুমী ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে গেট দিয়া আবার সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ তাহার মনে কৈশোরের একটা স্মৃতি ভাসিয়া আসিল। শৈলদের বাড়িতেও ঠিক এমনই একটা গেট ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রতি অপরাহ্ণে শৈল গেটে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়িতেছে, একদিন শৈলকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কার জন্যে তুই রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস শৈল? আমার জন্যে নাকি?

ভারি ব'য়ে গেছে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার। দাদাদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

শৈলর দুইটি দাদা—পঙ্কজ ও উৎপল শঙ্করের সহপাঠী ছিল। পঙ্কজ বেচারা মারা গিয়াছে। শৈলও কি বাঁচিয়া আছে? সেই দুরন্ত বালকস্বভাব শৈল, কোথায় আজ সে? সে স্বচ্ছন্দে পেয়ারাগাছে চড়িত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়িত, প্রাচীর ডিঙাইয়া মিত্তিরদের বাগান হইতে ফলসা চুরি করিয়া আনিত, কথায় কথায় খামচাইয়া কামড়াইয়া খেলার সাথীদের অস্থির করিয়া তুলিত—সেই শৈলও তো আর বাঁচিয়া নাই। সেও মরিয়াছে। যে তরুণী আজ বোস সাহেবের পত্নী, সে অন্য লোক, অতিশয় নকল একটা আনন্দকে সে যেন জোর করিয়া চোখে মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছে। শঙ্করের কবি-মন এই গেটটাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিগত কৈশোর-জীবনের স্মৃতি-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। অতীতকালে যে প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে করিয়াছে, এই প্রশ্নটাই আবার

তাহার মনে জাগিল—শৈল কি তাহাকে ভালবাসিত? কই, কোনদিন তো তাহাকে বলে নাই! কিন্তু সে তাহার কবিতার খাতাখানা চুরি করিয়াছিল। কেন? যখন তখন লুকাইয়া সে তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইত। কেন? সে বহুবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোনও উত্তর পায় নাই; একটা না একটা ছুতা করিয়া শৈল প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। শঙ্কর কি তাহাকে ভালবাসিত? বাসিত বইকি। কমলারঙের শাড়িটি পরিয়া শৈল যেদিন শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, শঙ্করের সে রাত্রে ঘুম হয় নাই। ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ নয়? কিন্তু শঙ্করও তো শৈলকে কোনদিন কিছু বলে নাই! বরং শৈল শ্বশুরবাড়ি যাইবার আগে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার জন্যে মন কেমন করবে শঙ্করদা? ছদ্ম বিদ্রূপের সুরে সে উত্তর দিয়াছিল, ঘুম হবে না আমার। সত্যই তো ঘুম হয় নাই। অনর্থক বিদ্রূপ করিতে গেল কেন তবে? মনখানি মেলিয়া ধরিলে ক্ষতি কি ছিল? কিশোরকালের প্রথম প্রেম এমন ভাবে নষ্ট হইয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মধ্যে ইহাও একটি।—শৈলকে ভুলিতে দেরি হয় নাই তো! থলসি আসিয়াছিল। শৈলর দূরসম্পর্কের বোন থলসি। শৈল চলিয়া গেলে থলসিই হইয়াছিল তাহার সঙ্গিনী। সেই একদিন অন্ধকার রাত্রে পিছন দিকের বারান্দার সিঁড়ির ধারে দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া বসিয়া থাকা—অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর আর একদিন রাত্রে, সেদিনও গাঢ় ঘন অন্ধকার; শঙ্কর শ্মশানে বসিয়া ছিল—সম্মুখে থলসির চিতা। থলসিও থাকে নাই। শঙ্করের আনন্দ-অনুসন্ধিৎসু অমৃত-পিপাসী কবি-মন সুধার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আজও মিলিল না। জ্যোৎস্নাস্নাত সাগরে, পর্বতে, প্রান্তরে তাহার মুগ্ধ মন মাতিয়া উঠে—জ্যোৎস্না কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, চাঁদ ডুবিয়া যায়। নববর্ষার মেঘোদয়ে তাহার মনের ময়ূর পেখম মেলে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ থাকে? বৃষ্টি নামে, মেঘ মিলাইয়া যায়। সব আসে, কিন্তু থাকে না।

চাই কমলালেবু, ভাল কমলালেবু—

শঙ্করের স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সে অকারণে কমলালেবুওয়ালাকে ডাকিয়া কমলালেবু কিনিতে লাগিল। সুন্দর বড় বড় কমলালেবু! তাহার পকেটে ও হাতে যতগুলা আঁটিল, সে কিনিয়া লইল। তাহার পর গেট দিয়া সে আবার ভিতরে গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এমনভাবে চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই, কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়া দ্বিতলের একটা খোলা জানালা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অসম্বৃতবসনা একটি নারীমূর্তি, তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র জানালা হইতে সরিয়া গেলেন, প্রসাধন করিতেছিলেন বোধ হয়। শঙ্কর চোখ নামাইয়া লইল, ছি ছি, সে উপরের দিকে তাকাইতে গেল কেন? কি মনে করিলেন উনি? দেখিতে পাইয়াছেন কি? সে দ্রুতপদে আসিয়া ড্রয়িং-রুমে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আশ্চর্য লোক আপনি শঙ্করবাবু! এত আগে এলেনই বা কেন, আর এলেন যদি, বেরিয়েই বা গেলেন কেন?

শঙ্কর বলিল, এত আগে মানে? আমি এসেছি সাড়ে চারটের সময়।

সাড়ে তিনটের সময়।

শঙ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, তাই তো! সাড়ে তিনটাকে তাহার সাড়ে চারিটা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। একটু অপ্রস্তুতভাবে সে বলিল, আরে, সাড়ে তিনটেকে আমি সাড়ে চারটে ভেবে উর্ধ্বশ্বাসে এসে হাজির হয়েছি!

তাতে আর কি হয়েছে? ভালই তো, আসুন না, একটু গল্প করা যাক।

সোনাদিদির মুখে একটা চাপা হাসি চিকমিক করিতেছিল।

কমলালেবু কোথায় পেলেন?

কিনলাম রাস্তায়।

কিনলেন? খিদে পেয়েছে বুঝি আপনার? কলেজ থেকে সোজা এসেছেন বুঝি?

শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত হইল। মুখে কিন্তু সে হটিবার পাত্র নয়। বলিল, কেমন সুন্দর দেখতে বলুন তো! দেখলে কি খাওয়ার কথাই মনে

হয়? আমার তো কমলালেবু খাওয়ার চেয়ে হাতে ক'রে ব'সে থাকতেই বেশি ভাল লাগে।

সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

আমাকে একটা দিন, খাই।

শঙ্কর তাঁহাকে একটা কমলালেবু দিল এবং প্রশ্ন করিল, মিষ্টিদিদি কোথায়, তাঁকে দেখছি না!

তিনি এইমাত্র স্নান ক'রে এলেন, আসছেন এখুনি।

চকিতে শঙ্করের উন্মুক্ত বাতায়নের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সোনাদিদি লেবুটি ছাড়াইয়া শঙ্করের হাতে কয়েকটি কোয়া দিয়া বলিলেন, নিন, খেয়ে দেখুন।

আপনি খান আগে।

রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। কাপড়-জামা বদলাইয়া বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। কমলালেবু দেখিয়া সে কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সোনাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে টেবিলগুলো ঠিক সাজানো হয়েছে তো? দেখেছ তুমি সোনাদি?

আমি বাইরে যাই নি, তুই দেখ্ গিয়ে।

শঙ্কর বলিল, অপূর্ববাবু ফোন করেছিলেন, তিনি আসতে পারবেন না।

এই বার্তায় রিনির মুখখানি সলজ্জ হইয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সোনাদিদি কমলালেবুর কোয়াগুলি পরিষ্কার করিতে করিতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কখন ফোন করেছিলেন অপূর্ববাবু?

এই একটু আগে। আপনারা কেউ নীচে ছিলেন না তখন।

ও। যাক, বাঁচা গেল। নিন, খান দুটো কোয়া।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, আপনি খান আগে।

আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি!

মিষ্টিদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মিষ্টিদিদি আসিতেই সোনাদিদি অনুযোগমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, শঙ্করবাবুর কথা শুনেছ মিষ্টিদি?

কমলালেবু নাকি ওঁর হাতে ক'রে ধ'রে থাকতেই ভাল লাগে, খেতে ভাল লাগে না।

মিষ্টিদিদির আগমনে শঙ্কর মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, খোলা জানালার কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। মিষ্টিদিদির দিকে তাহার চাহিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন, ঠিকই তো বলেছেন উনি। কবির মত কথাই বলেছেন।

সোনাদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আপনার কবিতা এনেছেন? কই, দেখি!

না, আজ আনি নি, আর একদিন আনব এখন। কলেজ থেকে সোজা চ'লে এসেছি কিনা!

অভিমান-ভরা স্বরে সোনাদিদি বলিলেন, কাল অত ক'রে বললাম আপনাকে!

মিষ্টিদিদি ফোড়ন দিলেন, কবির মন অত সহজে পাওয়া যায় না সোনা।

এই স্বল্পপরিচিতা নারী দুইটির প্রগল্‌ভতা শঙ্করের ভাল লাগিতেছিল না, আবার ভাল লাগিতেওছিল। তাহার ভদ্র মন এই ধরনের কথাবার্তায় সঙ্কুচিত হইতেছিল, কিন্তু তাহার অন্তরবাসী বন্য বর্বরটা ইহা উপভোগ করিতেছিল। শঙ্কর ভাবিতেছিল, কেমন মানুষ ইহারা?

মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, না? বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?

শঙ্কর একটু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আপনাদের ফুলগুলো।

এবার ডালিয়াগুলো তেমন ভাল হয় নি।

শঙ্কর এবার মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া দেখিল, এতক্ষণ সে সঙ্কোচে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে নাই। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই ভদ্রমহিলা প্রসাধনশিল্পে নিপুণা। চোখের কোলে সূক্ষ্ম কাজলের রেখাটি কি সুন্দর মানাইয়াছে! পীতাভ জরিপাড় শাড়িটি

পরিবার কি অপূর্ব ভঙ্গী, সর্বাঙ্গে তাহা যেন আবেশভরে স্বপ্ন দেখিতেছে। শঙ্করের কবি-মন প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

মিষ্টিদিদি বলিতে লাগিলেন, ডালিয়াগুলো তেমন সুবিধে হয় নি যদিও, পিটুনিয়াগুলো কিন্তু খু—ব ভাল হয়েছে। দেখেছেন আপনি ওই দিকের কোণটাতে?

শঙ্কর সত্য কথা বলিল।

বিলিতী ফুল একটাও চিনি না আমি।

তাই নাকি? আসুন, এক্ষুনি চিনিয়ে দিচ্ছি আমি। চলুন যাই। আয় সোনা।

সোনাদিদি কিন্তু অভিমান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাও, শঙ্করবাবু আমার একটা কথাও যখন রাখলেন না, তখন আমার স'রে থাকাই ভাল।

মিষ্টিদিদি অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুইটি উলটাইয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, নিন, সামলান এখন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি! কোন্ কথা রাখলাম না আপনার?

সোনাদিদি নীরব।

আচ্ছা, দিন, নেবু খাচ্ছি। আপনিও তো আমার কথা রাখলেন না! একটা কোয়া যদি আগে খেতেন, কি এমন ক্ষতি হ'ত তাতে?

শঙ্কর হাসিয়া সোনাদিদির হাত হইতে কয়েকটি কোয়া লইয়া মুখে পুরিল। সোনাদিদি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অর্ধ-নিমীলিত নয়নে মৃদুহাস্যসহকারে তিনি বলিলেন, আমার জন্যেও রাখুন দু-একটা। সব খেয়ে ফেলছেন যে!

এই যে, নিন না। চলুন, বাগানখানা এইবার দেখা যাক। মিষ্টিদিদি, আপনিও নিন।

তিনজনে লেবু খাইতে খাইতে ড্রয়িং-রুম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাহিরে রিনি চায়ের টেবিলগুলি সাজাইতেছিল।

মিষ্টিদিদি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাবা রে বাবা, রিনির মত

খুকে মেয়ে আর যদি ছুটি দেখেছি আমি! সেই আড়াইটে থেকে মেয়ে লেগেছেন চায়ের টেবিল সাজাতে, এখনও পর্যন্ত পছন্দমত সাজানো হ'ল না!

হয়ে গেছে আমার।

এই বলিয়া রিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

রিনি চলিয়া গেলে সোনাদিদি মৃদুস্বরে বলিলেন, আহা, বেচারীর এত যত্ন সাজ সব পণ্ড হ'ল। অপূর্ববাবু আজ আসবেন না, ফোন করেছেন।—বলিয়া তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ছদ্ম বিস্ময়ে মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেচারী!

শঙ্কর এ বিষয়ে মনে মনে কৌতূহলী হইলেও মুখে কিছু বলিল না। তিনজনে মিলিয়া বাগানের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শঙ্কর মরসুমী ফুল সম্বন্ধে যতটা না হউক, মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জন করিল। সুইট-পির বর্ণ-বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, রোপণ ও লালন করিবার প্রণালী ও কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে মিষ্টিদিদি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রফেসার মিত্রের মোটর গেটে প্রবেশ করিল। শঙ্কর একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখা দিল না। তিনি সুইট-পির সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন স্বামীর আগমন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সচেতন হওয়াটা অতিথির সুমুখে অশোভন। অবিচল ভাবটা বেশিক্ষণ কিন্তু টিকিল না; সোনাদিদি টিকিতে দিলেন না। সোনাদিদি বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, অপূর্ববাবু যে এসেছেন দেখছি!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, তাই নাকি?

সকলে তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফেসার মিত্র ব্যতীত মোটর হইতে আরও তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন—একজন অপূর্ববাবু এবং অপর দুইজন অবাঙালী। অবাঙালী দুইজন প্রফেসার মিত্রের প্রাক্তন বন্ধু, বিলাতে অবস্থানকালে ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। একজন মাদ্রাজী—মিস্টার পিলে, এবং অপরজন পাঞ্জাবী—সর্দার প্রতাপ সিং। দুইজনেই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দুইজনেই ছুটিতে কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের সম্বর্ধনা-কল্পে এই টী-পার্টির

আয়োজন। মিষ্টিদিদি সস্মিতমুখে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, ইতিপূর্বেই ইঁহাদের আলাপ-পরিচয় ছিল। কারণ পাগড়িমণ্ডিত শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত প্রতাপ সিং মিষ্টিদিদির সহিত কি একটা রসিকতা করিয়া দরাজ গলায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্টার পিলে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারও হাস্যদীপ্ত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ফুটিয়া উঠিল। মিষ্টিদিদি এই আগন্তুকদ্বয়কে লইয়া যখন ব্যস্ত, সোনাদিদি তখন অপূর্ববাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন।

প্রফেসার মিত্র আসিয়াই বন্ধুদ্বয়কে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর সুইট-পির বেডগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বোধ করি এই সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি সে মিষ্টিদিদির নিকট এইমাত্র শুনিয়াছিল, সেইগুলিই রোমন্থন করিতে লাগিল।

বেশিক্ষণ অবশ্য নয়। একটু পরেই সোনাদিদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আসুন শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, ইনিই ফোন করেছিলেন।

পরিচয় হইল।

শঙ্কর দেখিল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সত্যই একটি দেখিবার মত বস্তু—খর্বকায় ক্ষুদ্র মানুষটি, কিন্তু সাজসজ্জা ছোট মাপের নয়। পায়ে জরিদার নাগরা, পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি, গায়ে মিহি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি। সমস্ত মুখখানি একেবারে যেন চুনকাম-করা। স্নো এবং পাউডারে কিন্তু তাঁহার বহুক্ষৌরীকৃত গণ্ডদেশের কর্কশতা ঢাকিতে পারে নাই। মুখখানি গোল, নাকটি থাঁদা-থাঁদা, নাকের নিম্নে সামান্য একটু গোঁফ। চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির জ্যোতি আছে, দৃষ্টি কিন্তু লাজুক। অপূর্ববাবু কাহারও মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারেন না।

সোনাদিদি অপূর্ববাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন।

শঙ্কর শুনিল যে, অপূর্ববাবু লোকটি বিদ্বান, সাহিত্যরসিক, মার্জিতরুচি ও প্রগতিবাদী ; সরকারী আপিসে চাকুরি করেন। শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ক্ষুদ্র

শঙ্কর ও সোনাদিদি একটি টেবিলে বসিয়া ছিলেন। ঠিক তাহার পাশের টেবিলেই ছিলেন রিনি ও অপূর্ববাবু। অপর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় মোটরে সমাগতা একটি মহিলা ও তৎসঙ্গে আগত ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে একজন। এই ভদ্রলোক সোনাদিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, একটা খুব ভাল ফিল্‌ম হচ্ছে, দেখেছেন? **Man Woman Marriage?**

সোনাদিদি বলিলেন, কাগজে দেখেছি বটে, পরদায় দেখা হয় নি।

দেখে আসুন তা হ'লে, ওয়াণ্ডারফুল প্রোডাক্‌শান। আজই লাস্ট্‌ ডে।

সোনাদিদি হতাশভাবে বলিলেন, তা হ'লে আর হয় না। পার্টি শেষ হতেই তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

সেকেণ্ড শোতে যেতে পারেন।

দেখি।

সোনাদিদি চুপ করিয়া গেলেন। কোথাও যাওয়া না-যাওয়ার মালিক তিনি নহেন। মিষ্টিদিদি যদি না যান, তাহা হইলে তাঁহারও যাওয়া হইবে না।

একটু পরে সোনাদিদি শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি দেখেছেন ফিল্‌মটা?

না।

যান, দেখে আসুন।

হস্টেলে রাত্রিবেলা তো ছুটি পাব না।

একটু দুষ্টামি-ভরা হাসি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ওহো, আপনি যে ভাল ছেলে, সে কথা মনে ছিল না।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল, মনে থাকা উচিত ছিল।

সোনাদিদি পাশের টেবিলে রিনিকে বলিলেন, প্রকাশবাবু বলছেন, খুব ভাল একটা ফিল্‌ম হচ্ছে, যাবি?

তোমরা যাও তো যাব।

অপূর্ববাবু যাবেন?—সোনাদিদি প্রশ্ন করিলেন।

মিহি গলায় অপূর্ববাবু বলিলেন, খুবই সুখী হতাম যেতে পারলে। কিন্তু আমার টুইশনি আছে, মিস্ বেলাকে পড়াতে যেতে হবে।

শঙ্কর চকিতে একবার রিনির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

সোনাদিদি বলিলেন, মিস বেলা? মানে, বেলা মল্লিক? সে তো ছু-ছুবার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল শুনলাম। আবার পড়া শুরু করেছে নাকি?

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া নিতান্ত লাজুক কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, আমি গান শেখাই তাঁকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিনির দিকে চাহিয়া সোনাদিদি বলিলেন, ও।

ইহার উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে অপূর্ববাবু কি একটা বলিলেন, কিন্তু চতুর্থ টেবিলে উপবিষ্ট আনন্দিত সর্দার প্রতাপ সিংহের অট্টহাস্যে তাহা আর শোনা গেল না। চতুর্থ টেবিলে প্রতাপ সিং ও মিষ্টিদিদি বসিয়া আলাপ-আপ্যায়ন সহকারে চা-পান করিতেছিলেন।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, অস্তগামী সূর্যের রক্ত-কিরণরেখা মিষ্টিদিদির জরির আঁচলটায় পড়িয়া জলজল করিয়া জ্বলিতেছে।

পাশের টেবিলের প্রকাশবাবু সোনাদিদিকে বলিলেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো! এঁকে এর আগে আপনাদের বাড়িতে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

সোনাদিদি আলাপ করাইয়া দিলেন।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, এই সুসজ্জিত ফ্যাশান-দুরস্ত অধিবেশনে প্রকাশবাবু লোকটি একটু বেমানান-গোছের সাদাসিধা। গলাবন্ধ গরমের কোট গায়ে এবং তদুপরি একটি মোটা-গোছের খদ্দরের আধময়লা চাদর। দাড়িটা পর্যন্ত যেন দুই দিন কামানো হয় নাই।

সোনাদিদি পরিচয়সূত্রে বলিলেন, প্রকাশবাবু হচ্ছেন আমাদের অগতির গতি, কোন বিপদে প'ড়ে প্রকাশবাবুর শরণাপন্ন হ'লে—বাস্, নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া জানেন, উনি একজন খুব ভাল হোমিওপ্যাথ।

প্রকাশবাবু হাত জোড় করিয়া বলিলেন, মিসেস রায়, অনেক যোগ্যতর

ব্যক্তি তো এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন ; আমার ওপর এত বেশি মনোযোগ দিলে ওঁদের অপমান করা হবে যে !

প্রকাশবাবুর টেবিলে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ব্যাচিলার মানুষকে একটু জ্বালতেন ক'রে মিসেস রায় আনন্দ পান, তার থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না।

বেশ, তা হ'লে করুন।

প্রকাশবাবু সস্মিতমুখে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কর হেদুয়ার ধারে একটা বেঞ্চে একা বসিয়া ছিল। প্রফেসার মিত্রের বাড়ি হইতে সে হস্টেলে ফিরে নাই। আজিকার দিনে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের সংসর্গে তাহার বৈকালটা কাটিল, তাহারা যেন অন্য জগতের প্রাণী—স্বপ্ন-জগতের। কথাবার্তা ব্যবহার কেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ষ্ট সজীব সুন্দর! সুরমা এই জগতের লোক। ইহাদের সঙ্গলাভ করিয়া সে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করিল। স্টেশনে উৎপল সেদিন যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু তাহা তো একেবারেই অসম্ভব। কল্পনা করাও বাতুলতা। রিনির মত মার্জিতরুচি যুবতী তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে কেন? কিন্তু ওই অপূর্বকৃষ্ণ পালিতকে তো রিনি সহ্য করিতেছে! এই কথা মনে হওয়ায় শঙ্কর সোজা হইয়া বসিল। রিনিকে সে নিজে বিবাহ করিতে পারুক আর না-পারুক, অপূর্বকৃষ্ণের হাত হইতে তাহাকে সে রক্ষা করিবে।

কে রে, শঙ্কর! এখানে একা কি করছিস? আজ কলেজ থেকে তুই হস্টেলে পর্যন্ত ফিরিস নি, ব্যাপার কি বল্ তো?

শঙ্করের রুম-মেট কানাই।

শঙ্কর বলিল, একটা নেমন্তন্ন ছিল।

চল্, এবার যাওয়া যাক, আটটা তো বাজে।

চল্।

দুইজনে গল্প করিতে করিতে হেদুয়া হইতে বাহির হইল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সহসা কানাই বলিল, ওহো, তোর তিরিশটা টাকা এসেছে আজ মনি-অর্ডারে। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট তোকে দিতে এসেছিলেন, তোকে না পেয়ে আমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, তোকে দিয়ে দিতে। সঙ্গেই আছে আমার, এই নে।

কানাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তিনটি নোট ও একটি কুপন শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে তাহা পকেটে পুরিল।

ট্রাম আসিল।

উভয়েই চড়িয়া বসিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইকে বলিল, আমার একটু দরকার আছে, তুই যা, আমি আসছি একটু পরে।

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

ট্রাম চলিয়া গেল।

৪

এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর তাহাতে চড়িয়া বসিয়া প্রফেসার মিত্রের বাড়ির ঠিকানা বলিয়া দিল এবং জোরে চালাইতে বলিল। গলা বাড়াইয়া রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখিল, আটটা বাজিয়া দশ মিনিট। বেশি সময় তো নাই।

ড্রাইভারকে সে আবার বলিল, জোর্‌সে হাঁকাও।

প্রফেসার মিত্রের বাড়ি পৌঁছিয়া শঙ্কর সোজা ড্রয়িং-রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই সোনাদিদির সঙ্গে দেখা। মোটর থামিবার শব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, শঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এ কি, শঙ্করবাবু, আবার ফিরলেন যে? আমি ভাবলাম, জামাইবাবু বুঝি ফিরে এলেন স্টেশন থেকে।

প্রফেসার মিত্র বাড়িতে নেই নাকি ?

না, তিনি বন্ধুদের স্টেশনে তুলে দিতে গেছেন। আপনি এলেন যে আবার ?

শঙ্কর বলিল, চলুন, ফিল্মটা দেখে আসি।

সোনাদিদির মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন এমনই কিছু একটা তিনি প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মুখে কিন্তু সে কথা বলিলেন না। একটু ফিক করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, এই না তখন বললেন, হস্টেলের ছুটি পাওয়া যাবে না ?

শঙ্কর কিছু না বলিয়া হাসিমুখে শুধু চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনি একটু বসুন তা হ'লে, ওদের খবর দিই আমি।

সোনাদিদি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর নিকটস্থ সোফাটায় বসিয়া পড়িল। তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল।

ম্যান উওম্যান ম্যারেজ।

অদ্ভুত ছবি !

আদিম অসভ্য মানব-মানবী হইতে শুরু করিয়া মানব-সভ্যতার প্রতি স্তরে নর-নারীর প্রেমলীলা নানা বর্ণে অপূর্ব শিল্পসম্পদে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। এক পাশে রিনি, এক পাশে সোনাদিদি। রিনির পাশে মিষ্টিদিদি বসিয়া ছিলেন। রিনির হাত মিষ্টিদিদির হাতের মধ্যে ছিল। ছবি দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাতসারে রিনির হাতখানা মিষ্টিদিদি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন, এত জোরে—যেন নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চান। রিনি কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে ?

সলজ্জ রিনি কোনও উত্তর দিল না।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ও কিছু নয়।

ছবি চলিতে লাগিল। রোমের দৃশ্য। সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ়

রোম তাহার অতুল ঐশ্বর্য দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ছড়াইয়াও শেষ করিতে পারিতেছে না। বিলাস-সজ্জার প্রধান উপকরণ নারী নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, লাবণ্যময়ী জ্বলন্ত-যৌবনা রূপসীর দল সবল-পেশী বলিষ্ঠ-দেহ পুরুষদের দৃপ্ত মহিমার নিকট নিজেদের বিলাইয়া দিয়া হাসিকান্নার ক্ষিপ্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ ক্রীতদাসী, কেহ সম্রাজ্ঞী। শঙ্কর অনুভব করিল, তাহার দক্ষিণ জানুটায় কিসের যেন চাপ লাগিতেছে। যদিও সে বুঝিতেছিল ইহা কিসের চাপ, তথাপি সে ভাল করিয়া একবার দেখিল, হ্যাঁ, সোনাদিদির জানুটাই এদিকে একটু বেশি সরিয়া আসিয়াছে যেন। সোনাদিদি একেবারে আত্মহারা হইয়া ছবি দেখিতেছেন। শঙ্কর একটু সরিয়া বসিল, সরিয়া বসিতে গিয়া আবার রিনির গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। রিনি সলজ্জভাবে একটু সরিয়া বসিল। ছবি চলিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যাল।

চতুর্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্কর দেখিল, মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটি চকচক করিতেছে ; সোনাদিদি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ; রিনি সাধারণতই একটু স্থিরস্বভাব, ছবি দেখিয়া সে আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিল। সোনাদিদির বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন, একটু চা খেলে হ'ত। রিনি, খাবি ?

রিনি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাহিরে যাইতে যাইতে শঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়িল যে, প্রথম শ্রেণীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গৈরিকধারী ভন্টুর মেজকাকাও বসিয়া রহিয়াছেন। শঙ্কর হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, চেহারার বেশ পরিবর্তন হইয়াছে। শঙ্করকেও মেজকাকা দেখিতে পাইলেন না। শঙ্কর বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া চায়ের ফরমাশ দিতে দিতে আচম্বিতে মনে পড়িল, তাহার যে আজ ভন্টুর সহিত বোস সাহেবের বাড়ি যাওয়ার কথা মেজকাকার চাকুরির জন্য। হাতঘড়িটা দেখিল, দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

এখনও ভন্টু নিশ্চয় তাহার জন্য হস্টেলে বসিয়া নাই। এতরাত্রে হস্টেলে ফিরিয়াই বা সে কি জবাবদিহি করিবে? কানাইটা কি ভাবিবে, কে জানে! তাহাদের ব্লকের মনিটার রামকিশোরবাবু লোকটিও ভরসা করিবার মত নহেন। যে স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করিতেছিল, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাহা চুরমার হইয়া গেল। কবিতার যে দুইটি লাইন মনের নিভৃত কোণে গুঞ্জন তুলিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।...একটি ট্রেতে তিন পেয়ালা চা লইয়া একটি খানসামা একটু পরেই মিষ্টিদিদির সম্মুখীন হইল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করও আসিল, তাহার হস্তে একটি প্রকাণ্ড ঠোঙায় ডালমুট।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হইল।

আবার ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। শঙ্করের কিন্তু মনের সুর কাটিয়া গিয়াছিল। এই যৌবনমত্ত নর-নারীদের নর্তন-কুর্দন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার মনে হইতেছিল, ভন্টু হয়তো আপিস হইতে ফিরিয়া তাহার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ভন্টুর বউদিদির মুখখানিও তাহার মনে পড়িল, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা—মুখের হাসিটি কিন্তু মরিয়া যায় নাই।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। সোনাদিদিকে চুপিচুপি বলিল, আমি বাইরে থেকে এখুনি আসছি, আপনারা দেখুন।

সে বাহিরে আসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল যে, বিশ্বাসযোগ্য চেনা-শোনা কাহাকেও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই তিনটি নারীকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া সে ভন্টুর খোঁজে বাহির হইবে।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, অপূর্ববাবু বারান্দায় এক ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ছবি দেখতে এসেছেন দেখছি!

অপূর্ববাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এইমাত্র এলাম আমি। টুইশনি থেকে ছুটি পেতেই বড্ড দেরি হয়ে গেল। তার ওপর ওঁদের ওখানে গিয়ে দেখি, ওঁরা

সব চ'লে এসেছেন এখানে, রাস্তায় ট্রামটাও এমন আটকে গেছল—ভাবছি, এখন টিকেট কিনে আর ঢোকাটা কি ঠিক হবে ?

শঙ্কর বলিল, না, এখন আর ঢুকে কি হবে ? ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

শঙ্কর আবার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অপূর্ববাবুকে দেখিয়া সে মুহূর্ত মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল যে, ভনুটুর খোঁজে যাওয়াটা এখন বৃথা। অপূর্ববাবু অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বড়বাবুর অনেক খোশামোদ করিয়া চায়ের নিমন্ত্রণটা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মিস বেলার নিকট হইতে ছাড়া পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গেল। তা ছাড়া ট্রামটা···

সিনেমা শেষ হইল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

ট্যাক্সি করিয়া শঙ্কর যখন মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি ও রিনিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন প্রফেসার মিত্র ফিরিয়াছেন। রিনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, দাদা এখনও লাইব্রেরিতে রয়েছেন, আলো জ্বলছে।

শঙ্করের মনে একটু শঙ্কা ছিল, হয়তো প্রফেসার মিত্র রাগ করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ ভাবে সকলে মিলিয়া সিনেমায় যাওয়াটা শঙ্করের নিজের কাছেই একটু খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু শঙ্করের শঙ্কা শীঘ্রই অপসারিত হইল। মোটরের শব্দে প্রফেসার মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং নাক হইতে চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন, ও, শঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমরা গিয়েছিলে ! আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, অপূর্ব বুঝি এই হুজুক তুলেছে। কিন্তু তোমরা চ'লে যাওয়ার একটু পরেই অপূর্বও এসে হাজির, তখন বেয়ারাটা বললে যে, তোমরা শঙ্করবাবুর সঙ্গে গেছ।—বলিয়া তিনি মোটা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া বিকশিত দন্তপাঁতিকে আরও বিকশিত করিয়া বলিলেন, কেমন ছবিটা ?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, ছবিখানি সুন্দর।

প্রফেসার মিত্র তখন শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি এখন কোথায় ফিরবে ?

হস্টেলে।

শঙ্কর তাহার হস্টেলের নামটাও বলিল।

মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ওঁকে উদ্ধার কর, উনি হস্টেল থেকে ছুটি না নিয়েই চ'লে এসেছেন।

মিত্র মহাশয়ের চোখে ক্ষণিকের জন্ম একটা কৌতুকদীপ্তি জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। ভালমানুষের মত হাসিয়া তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ফোনে ব'লে দেব আমি।

রিনি উপরে চলিয়া গেল।

প্রফেসার মিত্র মিষ্টিদিদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা সব শুয়ে পড় গিয়ে। আমার শুতে আজও রাত্ত হবে; শেলির উপরে ক্রিটিসিজ্‌মের এ বইখানা ভারি চমৎকার লিখেছে, শেষ না ক'রে শোব না।

মুচকি হাসিয়া সোনাদিদি বলিলেন, দেখবেন, কালকের মত আবার ঈজি-চেয়ারে শুয়েই থাকবেন না যেন।

প্রফেসার মিত্রের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল।

শঙ্কর নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার আসছেন কবে?

আসব একদিন।

শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায়-জনহীন রাজপথ দিয়া শঙ্কর একাকী হাঁটিয়া চলিয়াছে। কলিকাতা নগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। রাস্তার দুই ধারে ইলেকট্রিক-বাতিগুলি শূন্য পথটিকে অলোকিত করিয়া কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতল-কক্ষে সহসা একটা নীল আলো দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাচের জানালা দিয়া অস্পষ্ট দেখা গেল, সেই নীলালোকিত আবেষ্টনীতে দুইটি মূর্তি সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতার পিচ-ঢালা রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শঙ্করের মনে হইল, সে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হইতেছে। আর একটু গেলেই যেন জটিল জটাজুটধারী বটবৃক্ষের দেখা পাওয়া যাইবে,

এবং তাহার শাখায় রূপকথার বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী যেন বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য কোন অপরূপ বার্তা লইয়া বসিয়া আছে।

টুং টুং টুং টুং—

একটা রিক্‌শওয়ালা মন্থরগতিতে বাম দিকের গলিটা হইতে বাহির হইল। শঙ্কর রূপকথার রাজ্য হইতে সহসা আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাথে নামিয়া আসিল।

৫

ঝামাপুকুরের একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ছোট বাড়ি। সেই বাড়ির বাহিরের ঘরে একটি চৌকির উপর বসিয়া গভীর মনোনিবেশ-সহকারে এক ব্যক্তি কোষ্ঠী বিচার করিতেছিলেন। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সম্মুখেই বোতলের মুখে গোঁজা একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি। ঘরটির মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। চৌকিটির কাছে একটি শ্রীহীন কাঠের টেবিল এবং ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারি। আলমারির কবাট দুইটি খোলা রহিয়াছে। আলমারিতে বই ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই। বইও নানারকম। অধিকাংশ অবশ্য পুরাতন পঞ্জিকা, কিন্তু অন্য নানাপ্রকার পুস্তকেরও অভাব নাই। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, শেক্সপীয়ারের একখানা নাটক, প্যারাডাইস লস্ট, ক্যাল্‌কুলাস, অ্যাস্ট্রনমি, ঘোড়দৌড় বিষয়ক দুই-চারখানি পুস্তক, ছবির অ্যাল্‌বাম প্রভৃতি নানাজাতীয় বহি অগোছালোভাবে আলমারিটিতে ঠাসা রহিয়াছে। আলমারির ঠিক নীচেই মেঝের উপরও দুই-একখানা বই পড়িয়া আছে। মেঝের উপর অসংখ্য সিগারেট ও বিড়ির টুকরা ছড়ানো। টেবিলের উপর খানকয়েক বিলাতী মাসিকপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে এক বোতল ও তাহার পার্শ্বে কাচের একটি গ্লাস। গ্লাসটিও ফাটা। তক্তাপোশটি নিতান্ত ছোট নয়—বেশ প্রশস্ত। তক্তাপোশের উপর কোষ্ঠী-বিচারক ব্যতীত আর একজন ছিল। সে ও-পাশে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; এত ঘুমাইতেছিল যে, তাহার নাক ডাকিতেছিল। বেশ জোরেই ডাকিতেছিল,

কিন্তু এই নাসিকাগর্জন সত্ত্বেও কোষ্ঠী-বিচারক নিবিষ্ট মনে আপন কার্য করিয়া যাইতেছিলেন।

কোষ্ঠী-বিচারকের নাম করালীচরণ বক্‌সি। ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশ, শীর্ণ লম্বা দেহ। একটি চক্ষু কানা, অপরটি একটু বেশি-রকম প্রদীপ্ত, যেন দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। চিবুকটা সূচালো এবং বক্রভাবে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তাহা সূক্ষ্মাগ্র সুবৃহৎ নাসাটার অনুকরণ করিতেছে। মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ সুস্পষ্ট। বসন্তরোগেই একটি চক্ষু তাঁহার গিয়াছে। সমস্ত মুখে কোন রোম নাই। শ্মশ্রু গুম্ফ তো নাইই, ভ্রূরও অভাব। অত্যধিক সুরাপানের ফলে ঠোঁট দুইটি হাজিয়া গিয়াছে। করালীচরণ বক্‌সিকে সকলেই ভয় পায়, কিন্তু অনেকেই তাঁহার কাছে আসে; তাহার কারণ, মন দিয়া গণনা করিলে তাঁহার গণনা নাকি একেবারে নির্ভুল। জ্যোতিষশাস্ত্রে এতবড় গুণী লোক সচরাচর নাকি দেখা যায় না।

পাশের বাড়ির একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল। চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে একবার তাকাইয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং উঠিয়া গিয়া টেবিল হইতে মদের বোতল তুলিয়া লইয়া গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন এবং নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিলেন। বিকৃত মুখটা র‍্যাপার দিয়া মুছিতে মুছিতেই তিনি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন এবং নিপুণভাবে সেটি ধরাইয়া স্বস্থানে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। একটি পুরাতন পঞ্জিকা খোলা অবস্থাতেই কাছে পড়িয়া ছিল। সেটি হইতে একটি খাতায় তিনি নানারূপ অঙ্ক টুকিতে শুরু করিলেন। টুকিতে টুকিতে তাঁহার চোখে বিচিত্র এক কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ কোষ্ঠীখানি আরও খানিকটা প্রসারিত করিয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন তিনি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্রাগ্রিত চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত হইলেই করালীচরণের চিবুকটা কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, অধরোষ্ঠ দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ

কোষ্ঠীখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর নীরব হাস্যে করালীচরণের মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কিছুক্ষণ কোষ্ঠীখানির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আবার তিনি উঠিলেন, বোতলটা হইতে আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন, আর কতটা অবশিষ্ট আছে। তাহার পর হঠাৎ তিনি ডাকিলেন, ভন্টুবাবু, উঠুন, কত ঘুমুবেন ?

চেরা বাজখাঁই আওয়াজ।

ভন্টুর নাসিকাগর্জন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। পায়ের পাতাটা মৃদু মৃদু নাচাইতে নাচাইতে ভন্টু বলিল, না, আমি ঘুমুই নি তো।

কর্কশকণ্ঠে হাস্য করিয়া করালীচরণ বলিলেন, কি করা হচ্ছিল তা হ'লে এতক্ষণ ? বাই নারায়ণ, এর নাম যদি ঘুম না হয়, তা হ'লে—

ভন্টু উঠিয়া হাই তুলিয়া বলিল, থিঙ্ক্ করছিলাম।

করালীচরণ এই কথায় অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, শুষ্ক শক্ত কাষ্ঠখণ্ডে কে যেন করাত চালাইতেছে।

ভন্টু বলিল, লদ্‌কালদ্‌কি রাখুন, কুষ্ঠির কি হ'ল ?

দুটো কুষ্ঠিই দেখেছি।

দাদারটা কি রকম দেখলেন ?

ভালই, কোন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন। আপনার এই বন্ধুর কুষ্ঠি কিন্তু ভয়ানক—বাই নারায়ণ।

শঙ্করের ? কেন ?

উত্তরে করালীচরণ চিবুকটি একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিলেন এবং একমাত্র চক্ষুটির তীব্র দৃষ্টি ভন্টুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এর বেশি এখন আর কিছু বলব না।

ভন্টু আর একবার হাই তুলিয়া বলিল, কি দেখলেন ?

করালীচরণ নীরবে হাসিতেই লাগিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। ভন্টু হাসিমুখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ করালীচরণ উঠিয়া টেবিল হইতে মদের বোতলটা তুলিয়া লইলেন এবং বোতলে মুখ লাগাইয়া বাকি মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বিকৃত মুখে বলিলেন, শেষ হয়ে গেল। পকেটও আজ একদম খালি। কিছু দেবেন নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু দ্বিরুক্তি না করিয়া বুক-পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া করালীচরণের হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল, আমার যথাসর্বস্ব দিচ্ছি। কালকের বাজার করবার জন্যে কিছু রেখে বাকি সবটা আপনি নিয়ে নিন।

করালীচরণ সাগ্রহে ব্যাগটি খুলিয়া মোমবাতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাগটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া ধরিলেন। একটি সিকি ও দুইটি পয়সা বাহির হইল।

করালীচরণ ভন্টুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কত চাই আপনার বাজারের জন্যে?

যা দেবেন।

দু আনায় হবে?

হবে।

যান, তা হ'লে এই সিকিটা ভাঙিয়ে দু আনার সিগারেট আনুন, আর বাকি দু আনা আপনি নিয়ে নিন।

কোন্ সিগারেট আনব?

যা খুশি।

করালীচরণ প্যাকেট হইতে শেষ সিগারেটটি বাহির করিয়া ভন্টুর দিকে পিছন ফিরিয়া সেটি ধরাইতে লাগিলেন। সেই সুযোগে ভন্টু পিছন হইতে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া করালীচরণকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। করালীচরণ সিগারেট ধরানো শেষ করিয়া বাকি পয়সা দুইটিও ভন্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, এ দুটোও নিয়ে যান, একটা ছোট পাঁউরুটি কিনে আনবেন।

দিন।

ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ বাম হস্তে জলন্ত সিগারেটটি ধরিয়া নিজের দক্ষিণ করতলটি নির্বাপিতপ্রায় মোমবাতিটির আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সহসা তাঁহার নজরে পড়িল, মোমবাতিটি আর বেশিক্ষণ টিকিবে না। আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দু-একটা মোমবাতি আনতে বললে ঠিক হ'ত। বাই নারায়ণ, হাতে একদম কিছু নেই আজ।

নির্বাণোন্মুখ শিখাটি কাঁপিতে লাগিল। একচক্ষু মেলিয়া করালীচরণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ক্যাঁচ করিয়া একটা মোটর বাহিরে থামিল।

করালীবাবু বাড়ি আছেন?

আছি।

করালীচরণ বাহিরে গেলেন। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। মোটরের ভিতর একজন মোটা-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পাশে আর একজন যিনি ছিলেন, করালীবাবু আসিতেই তিনি নামিয়া আসিলেন এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, আপনার নামই কি করালীচরণ বক্সি? রেস সম্বন্ধে আপনিই কি গণনা করেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শালুকের পরেশবাবুকে কি আপনিই গণনা ক'রে দিয়েছিলেন? তাঁর কাছে আপনার নাম শুনে আমরা এসেছি।

কি দরকার?

গোনাতে চাই।

করালীচরণ একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, আমার কাছে গোনাতে হ'লে পঞ্চাশ টাকা লাগে। আপনাদের নির্ধারিত ব'লে দেব, রেস খেলে জিতবেন কি না।

মোটরে উপবিষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এবার নামিয়া আসিলেন। ভদ্রলোক স্থূলকায় হইলেও অল্পবয়স্ক, মুখখানি নিতান্ত কচি। কচি মুখটিতেই বিজ্ঞতার

ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, আপনার দক্ষিণা নিশ্চয়ই দেব। তবে আমরা হলাম মধ্যবিত্ত লোক, ঠকতেও চাই না, ঠকাতেও চাই না।

করালীচরণ তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টি তুলিয়া এমনভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন, যেন কোন মহারাজা কোন গরিব প্রজার নিবেদন শুনিতেছেন।

আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে থাকি, তবে কাউকে পীড়ন করতে আমি চাই না। যা সাধ্যে কুলোয় দেবেন, দর-কষাকষি করা আমার স্বভাব না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করিয়া দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন। এবং বলিলেন, এই আমার প্রথম কাজ আপনার সঙ্গে, যদি পরস্পর প'টে যায়, টাকার জন্যে আটকাবে না।

আচ্ছা, দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নোট দুইটি লইয়া তাঁহার ছিন্ন জামার পকেটে রাখিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, কাল সকালে আসবেন তা হ'লে, আজ এত রাত্রে হবে না।

নোট দুইটি এভাবে করালীচরণের পকেটে অগ্রিম চলিয়া গেল দেখিয়া স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মনে মনে বোধ হয় একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন, কাজটা আজ রাত্রেই মিটে গেলে ভাল হ'ত না?

করালীচরণ উত্তর দিলেন, আজ হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নোট দুইখানি ফেরত দিয়া বলিলেন, কালও আর আসবার দরকার নেই আপনার। আপনার কাজ আমি করব না। আমার ওপর যখন বিশ্বাসই নেই, তখন আমার কাছে আসাই আপনার পণ্ডশ্রম হয়েছে। বাই নারায়ণ, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না।

সে কি কথা—সে কি কথা!

ত্রস্ত হইয়া উভয় ভদ্রলোকই আগাইয়া আসিলেন। স্থূলকায় ভদ্রলোক নোট দুইটি করালীচরণের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, রাগ করবেন না করালীবাবু, টাকাটা রাখুন। বেশ, কাল সকালেই হবে। কখন আসব বলুন?

করালীচরণ বক্সি কখনও কাউকে কথা দেয় নি আজ পর্যন্ত। কাল

সকালে দশটার ভেতর আসবেন, যদি বাড়িতে থাকি এবং মেজাজ ঠিক থাকে দেখা হবে।

স্থূলকায় ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আড়াল হইতে চোখের কি একটা ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে স্থূলকায় ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা, বেশ বেশ, তাই হবে। কাল সকালেই আসব এখন। আচ্ছা, চলি তবে, নমস্কার।

তাই আসবেন, নমস্কার।

মোটরকার চলিয়া গেল। মোটরখানার দিকে তাকাইয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, শ্‌শালা!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভন্টু আসিয়া পড়িল। পাঁউরুটিটা করালীবাবুর হাতে দিয়া ভন্টু বলিল, ছ আনায় হাতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

করালীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ভন্টুর হস্তে নোট দুইখানি দিয়া বলিলেন, এই নিন। হাতী ফেরত দিয়ে আসুন। এক টিন নাইন নাইন নাইন আর এক বোতল হুইস্কি চট্ ক'রে এনে দিয়ে যান। আপনার পয়সাটাও ফেরত নিয়ে নেবেন। নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম ব'লেই আপনার কাছে হাত পাততে হয়েছিল, বাই নারায়ণ।

ভন্টু চট্ করিয়া হেঁট হইয়া করালীচরণের পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। করালীচরণ একটু সরিয়া গিয়া বলিলেন, আঃ, কি যে করেন আপনি রোজ!

ভন্টু হাত জোড় করিয়া কহিল, এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না দাদা।

করালীচরণ বলিলেন, আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়াটা সত্যিই আমার উচিত নয়। আমার বসন্তরোগে আপনি যে সেবাটা করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। নৈহাটি স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে ম'রেই যেতাম আমি, বাই নারায়ণ। সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

ভন্টু আবার তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

করালীচরণ পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যান, দেরি হয়ে গেছে। চিৎপুর অঞ্চলে না গেলে মাল পাবেন না।

ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা পেলেন কোথা থেকে হঠাৎ?

করালীচরণের প্রদীপ্ত চক্ষুটি টর্চের মত জলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, এসেছিল দু শালা।

ভন্টু আবার বাইকে চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িল।

ভন্টু চলিয়া গেলে করালীচরণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শুকনা পাঁউরুটিটা কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে রুটিটা শেষ হইয়া গেল। জল খাইবার জন্য ভিতরে ঢুকিয়া করালীচরণ দেখিলেন যে, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। এবারও ভন্টুকে মোমবাতি আনিতে বলা হইল না—বাই নারায়ণ!

স্বল্পালোকিত গলিটির মধ্যে তৃষ্ণার্ত করালীচরণ একা একা প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। করালীচরণের পৃথিবীতে আপনার জন কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এই জীর্ণ বাড়িখানা। বিধবা মা কাশীতে ছিলেন, সেদিন দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিধবা মা-ই বহু কষ্টে করালীচরণকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবার কথা করালীচরণের মনেও পড়ে না। বাল্যকাল হইতে যতদূর মনে পড়ে, সবই মা। করালী একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কিন্তু এ কথা আজ কেহ জানে না। করালীচরণও ইহা কাহাকেও বলেন না। আধুনিক পরিচিত-মহলে করালীচরণ বক্‌সি বুদ্ধিমান জ্যোতিষী বলিয়া বিখ্যাত। কেহ বলে, লোকটা পাগল; কেহ বলে পণ্ডিত; কেহ বলে, শয়তান।

ভন্টু সেদিন রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। বউদিদি জাগিয়া ছিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

উঃ, কত রাত তুমি করলে ঠাকুরপো?

ঘোর কেতুর পাল্লায় পড়েছিলাম, বাইকটা একটু ধর তো।

ভন্টু বাইকটা দু হাতে ধরিয়া বউদিদির সাহায্যে সেটা বারান্দার উপর তুলিয়া ফেলিল।

তোমার দাদার কুষ্ঠিটা নিয়ে গিয়েছিলে নাকি জ্যোতিষীর কাছে?

হ্যাঁ, কেতুশ্রেষ্ঠ করালীই তো ডোবালে আজ। বিরাট কৈতুকী অ্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম।

বউদিদির কোলের ছেলেটা ঘরের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। বউদিদি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন ও ছেলেটাকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বললেন দেখে, কোন ভয় নেই তো?

না।

বউদিদি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ না তো? লুকিও না, লক্ষ্মীটি।

ইহার উত্তরে নেপথ্য হইতে ভন্টু ঠোঁট দুইটি বিকৃত করিয়া বউদিদিকে ভ্যাংচাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে বউদিদি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভন্টু মুখটা বিকৃত করিয়া রাখিয়া বলিল, বাইরে এস।

বউদিদি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

লদ্‌কালদ্‌কি রেখে এখন খেতে দাও।

খাবার তো ঢাকা রয়েছে ওই সামনেই, দেখতে পাচ্ছ না?

আর একটা থালায় কার খাবার?

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, আমিও এখনও খাই নি।

ভন্টু আর একবার মুখবিকৃত করিয়া ভ্যাংচাইল।

আহা, মুখ করা হচ্ছে দেখ না!

ভন্টু হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। বউদিদি বাতিটা একটু উস্কাইয়া দিয়া বলিলেন, জ্যোতিষীর নাম করালীচরণ! কি অদ্ভুত নাম গো!

সেই কানা করালী।

ও, সেই যাকে তুমি নৈহাটি স্টেশন থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে? খুব ভাল জ্যোতিষী?

অসাধারণ—চাম লদ্।

উভয়ে খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে বউদিদি হঠাৎ বলিলেন, ওহো, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছিল, রাত বারোটার পর।

ভন্টু বলিল, চোর কোথাকার! সমস্ত সন্ধ্যেটা আমার মাটি ক'রে দিয়ে রাত বারোটার পর আসা হয়েছে! কিছু ব'লে গেছে নাকি?

একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

কোথায় চিঠি?

বউদিদি এঁটো হাতেই উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটি পত্র আনিয়া ভন্টুর হাতে দিলেন। ক্ষুদ্র পত্র।—

> ভাই ভন্টু, সন্ধ্যের সময় এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম। কাল সকালে উঠেই বোস সায়েবের ওখানে যাব। তুই বিকেলে আসিস।
>
> —শঙ্কর

ভন্টু পুনরায় বলিল, চোর কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজীর খবর কি?

বাবাজী আজ সিনেমা দেখতে গেছে, কে কে সব ডাকতে এসেছিল যেন, কোথায় নেমন্তন্ন আছে; ব'লে গেছে, সকালে ফিরবে।

পাশের ঘরে খুটখুট করিয়া আওয়াজ হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাই-কাঠি জ্বালার শব্দ পাওয়া গেল। বাকু উঠিয়া তামাক সাজিতেছেন। একটু পরেই দরাজ গলায় কাশিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, বড় বউমা উঠেছ নাকি? চা চড়াও তা হ'লে।

বউদিদি হাস্য-দীপ্ত চক্ষে ভন্টুর পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি স্টোভটা ধরিয়ে দিয়ে শোও ঠাকুরপো? আমি ও ভাল ধরাতে পারি না, বড্ড তেল উঠে পড়ে। তোমাকে ব'লে ব'লে হেরে গেছি, কিছুতেই তুমি ওটা সারিয়ে আনলে না।

ভন্টু উত্তরে কিছু না বলিয়া বউদিদির পাত হইতে মাছের একটা কাঁটা তুলিয়া লইয়া চিবাইতে লাগিল।

বাঃ, ওটা আমি চিবোব ব'লে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি, বেশ তো তুমি!

ভন্‌টু বলিল, খুজবুজ।

৬

সেদিন সকালে শঙ্কর যখন বোস সাহেবের বাড়ি গেল, তখন সবে সাতটা বাজিয়াছে।

বোস সাহেব লোকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—তিনি রেলে চাকুরি করেন, শঙ্করের বাল্যসখী শৈলর স্বামী এবং সাহেবী-ভাবাপন্ন। সাহেবিয়ানার নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব সারবান মতামত আছে এবং সে মতামতগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। বোস সাহেব বাড়িতেও সাহেবী পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন, আহারাদিও সাহেবী কেতায় টেবিল-চেয়ার-প্লেট-কাঁটা-চামচ-সহযোগে সম্পন্ন হয়। তাঁহার খাস বাবুর্চি তাঁহার জন্য বাহিরে পৃথকভাবে সাহেবীখানা প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাঁহার আহারাদি বাহিরের ঘরেই নিষ্পন্ন হয়। বোস সাহেবের অন্দর-মহলের সহিত সম্পর্ক কম। তাঁহার নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি তিনি বাহিরের ঘরে বিভিন্ন আলমারিতে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়াছেন। স্নান করিবার সময় সাবান, বা জামা পরিবার সময় বোতামের জন্য হাঁকাহাঁকি করিয়া তিনি বাড়িসুদ্ধ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা পছন্দ করেন না। এ সকল বিষয়ে তিনি স্বাবলম্বী ও স্বাধীন।

শঙ্কর গিয়া শুনিল, তিনি প্রাতরাশে বসিয়াছেন। বাহিরে দণ্ডায়মান চাপরাসীর মারফৎ নিজের আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিতেই বোস সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বোস সাহেবের ধপধপে ফরসা রঙ। শক্ত-কফ-কলারওয়ালা ঘোর নীল রঙের শার্টটিতে তাঁহাকে মানাইয়াছিল ভাল। কোলের উপর একটি সাদা ন্যাপ্‌কিন প্রসারিত, খাবার পড়িয়া পরিচ্ছদ

যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, এই যে, এত সকালে কি মনে ক'রে? বসুন, বসুন।

তাঁহার প্রত্যেক কথাটি প্রয়োজন মাফিক ওজন-করা। এত কৃত্রিমতাপূর্ণ যে, মনে হয়, যেন প্রত্যেক কথাটি কহিবার পূর্বে সেগুলির মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছেন। পুনরায় স্মিতমুখে বলিলেন, বসুন না ওই সামনের চেয়ারটাতে।

আসন গ্রহণ করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে।

অর্থাৎ?

পাঁউরুটির একখানা টোস্ট বাঁ হাতে ধরিয়া কামড়াইতে কামড়াইতে বোস সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন।

অর্থাৎ ভন্‌টুর মেজকাকার জন্যে এসেছি। পারেন তো তাঁর চাকরিটা আবার ক'রে দিন। বেচারীদের বড় কষ্ট। ভন্‌টুকে সংসারের জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে।

এই বলিয়া শঙ্কর ভন্‌টুদের দুর্দশা, ভন্‌টুর দাদার অসুখ প্রভৃতির যথাযথ বর্ণনা করিয়া বোস সাহেবের করুণা উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইল। ভন্‌টুর মেজকাকার কথা শুনিয়া বোস সাহেব চা-পাঁউরুটি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, এক্‌স্‌কিউজ মি, হি ইজ এ হোপ্‌লেস চ্যাপ।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

তাহার পর বোস সাহেব বলিলেন, নিন, এক কাপ চা খান।—বলিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে একটি পেয়ালা বাহির করিলেন এবং টী-পট হইতে চা ঢালিয়া শঙ্করকে দিলেন।

আর কিছু খাবেন? টোস্ট্, কি বিস্কুট? ডিম খাবেন?

না।

শঙ্কর নীরবে চা-পান করিতে লাগিল।

একটি হাফ-বয়েল্ড্ ডিম নিপুণভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে বোস সাহেব বলিলেন, দেখুন শঙ্করবাবু, পার্‌সোনালি স্পিকিং, ভন্‌টুর মেজকাকার মত

লোকের ওপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। আই উড লাইক টু কিক আউট সাচ ফেলোজ ফ্রম মাই অফিস। আই অ্যাম স্পিকিং ফ্রাঙ্ক্‌লি—এক্‌স্‌কিউজ মি। বলিয়া তিনি সাহেবী কায়দায় স্কন্ধযুগলকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইলেন।

শঙ্কর কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল।

বোস সাহেব আবার বলিলেন, আপনাকে আমি যতদূর জানি, তাতে ও-রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের ওপর সিম্‌প্যাথি হওয়ার কথা তো নয় আপনার!

শঙ্কর চায়ে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিল এবং বলিল, সত্যিকার সিম্‌প্যাথি হতভাগাদেরই ওপর হওয়া উচিত।

বাধা দিয়া বোস সাহেব বলিলেন, এ তো হতভাগা ঠিক নয়, এ একটা 'রোগ'।

বিশেষ তফাত তো চোখে পড়ছে না।—বলিয়া শঙ্কর একটু মিনতির কণ্ঠেই বলিল, আমার নিজের বড্ড কষ্ট হয় ভনুটুটার জন্যে। ওদের বাড়ির সব অবস্থা জানি কিনা আমি, ওর দাদা হাফ-পে-তে ছুটি নিয়ে চেঞ্জে গেছেন—সংসার চলা দায়। আপনি যদি ভনুটুর মেজকাকার চাকরিটা ক'রে দেন, তা হ'লে ভনুটুর লেখাপড়াটা হয়।

এই বলিয়া সে নীরব হইল। যদিও পরের জন্য, তথাপি ইহা লইয়া আর বেশি অনুরোধ করিতে শঙ্করের কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাহার কেমন যেন সহসা মনে হইল, নিজের উচ্চ-পদের সুযোগ লইয়া বোস সাহেব যেন তাহাকে একটু কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনে হইবামাত্র শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। বোস সাহেব বলিলেন, এখন দেবার মত কোন চাকরিও আমার হাতে নেই।

শঙ্কর নীরবেই রহিল। তাহার পর সহসা বলিল, আমার যা বলবার তা তো বললাম, এখন আপনার যদি কিছু করবার থাকে করুন।

বোস সাহেব আর এক পেয়ালা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে একটা কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা ক'রে কতকগুলো লোক নেওয়ার কথা আছে।

ভন্টুর মেজকাকাকে বলুন না তাতেই অ্যাপ্লাই করতে। আই যে সিলেক্ট্ হিম, লেট হিম টেক এ চান্স্।

আচ্ছা, বলব তাই। ধন্যবাদ। চলি তা হ'লে। নমস্কার।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। দ্বারের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বাচ্চা-গোছের একটি চাকর ভিতর দিক হইতে আসিয়া বলিল, মাঈজী একবার ডাকছেন আপনাকে ভেতরে।

এখন আমার সময় নেই, পরে আসব।

অকারণে রাগ করিয়া শঙ্কর হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রতীক্ষমাণা শৈল চাকরের মুখে এই বার্তা শুনিয়া সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ও, আচ্ছা।

৭

নির্দিষ্ট সময়ে ভন্টু আসিয়া হাজির হইল।

তাহার সহিত দীর্ঘাকার, গৌরবর্ণ, পাতলা, ছিপছিপে আর একটি ভদ্রলোকও ছিলেন। শঙ্কর ইঁহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই। দেখিবামাত্র কিন্তু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রশান্ত উন্নত ললাট, ধপধপে ফরসা রঙ। মাথার চুলগুলা পর্যন্ত ঈষৎ কটা। দেখিলেই মনে হন, যেন একটা শিখা। ভন্টু পরিচয় করাইয়া দিল।

ইনি হচ্ছেন ক্যান্ড্ল অর্থাৎ মোমবাতি। আর ইনি হচ্ছে চাম লদ্, চাম গ্যান্ঢঅ বলতে পার।

শঙ্কর প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল, মোমবাতি?

আগন্তুক ভদ্রলোক মৃদুহাস্যসহকারে বলিল, ভন্টুর কথা ছেড়ে দিন, মোমবাতি আমার নাম নয়, আমার নাম মৃন্ময়—মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়।

ভন্টু অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া তাহার দিকে তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন? গাধা কোথাকার!

ভন্টুর মুখ মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পর মৃন্ময়কে

বলিল, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা, আমার এখানে দেরি হবে এখন একটু। না হয় ব'স্, একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

মৃন্ময় হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, না, আমায় যেতে হবে, এমনিই দেরি হয়ে গেছে দেখছি।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, আমি যাই তা হ'লে। পরে আলাপ হবে। আপনার নামটা নিশ্চয়ই চাম লদ্ নয়—

ভন্টু পুনরায় মুখবিকৃতি করিল।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, না, আমার নাম শঙ্করসেবক রায়।

আচ্ছা, নমস্কার।

মোমবাতি চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, অদ্ভুত চেহারা ভদ্রলোকের! যেন জ্বলছে।

ওইজন্যেই তো ওর নাম আমরা দিয়েছি মোমবাতি। সাংঘাতিক চাম গ্যান্‌চণ্ড—

এমন সময় হস্টেলের চাকরটা কিছু জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। শঙ্কর বলিল, তুই আপিস থেকে আসছিস তো? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব? নে, খা।

ভন্টু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া শঙ্করের পায়ের ধূলা লইয়া ফেলিল। শঙ্কর পা-টা সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, চা খাবি, না, কোকো?

ভন্টু সোৎসাহে বলিল, দুইই খাব।

চাকরটা খাবার রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শঙ্কর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, দু কাপ চা আর এক কাপ কোকো দিয়ে যা চট্ ক'রে।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

ভন্টু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

সিঙাড়ায় একটা কামড় দিয়া ভন্টু বলিল, বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি, বল্ সব। বোস সায়েবের ওখানে গিয়েছিলি? হ'ল কিছু?

বলে—বলব এখন, অনেক কথা আছে।

মানে ?

শঙ্কর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় 'শঙ্করদা, আপনিই বলুন তো ট্র্যাজেডি বড়, না, কমেডি বড় ?' বলিয়া একটি ছোকরা চটি ফটফট করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন। উভয়েরই হস্তে চায়ের পেয়ালা।

হস্টেলে শঙ্করের একটি দল আছে। যুবকদ্বয় সেই দলভুক্ত। ইহাদের মধ্যে একজন ভন্টুকে দেখিয়া বলিল, এই যে ভন্টুদা, আপনাকে আজকাল কলেজে তো দেখি না!

সিঙাড়া চিবাইতে চিবাইতে ভন্টু উত্তরে শুধু একট হাসিল।

শঙ্কর বলিল, হঠাৎ এখন ট্র্যাজেডি-কমেডির কথা কেন ?

একজন যুবক বলিল, কুমুদবাবু নীচের ঘরে খুব লেক্‌চার ঝাড়ছেন যে, কমেডিই হ'ল শ্রেষ্ঠ জিনিস।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, তাই নাকি ?

যুবকটি বলিল, ওঃ, নীচে মহা আস্ফালন লাগিয়েছেন কুমুদবাবু। তিনি বলছেন, ট্র্যাজেডি হচ্ছে নগ্ন সত্য। সাহিত্যে নগ্ন সত্যের স্থান নীচে। সাহিত্যে আমরা চাই আনন্দ—কমেডিই নির্মল আনন্দ দিতে পারে। ট্র্যাজেডি তা পারে না।

শঙ্কর ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, কে বললে, পারে না ? তবে ট্র্যাজেডির মধ্যে আনন্দ পেতে হ'লে মনটাও সেই রকম হওয়া দরকার। উঁচুদরের রসিক না হ'লে ট্র্যাজেডির রসাস্বাদন করতে পারে না।

আসুন না আপনি একবার নীচে।

ভন্টু, তুই একটু ব'স্—আমি আসছি এক্ষুনি।

শঙ্কর চলিয়া গেল। ভন্টু সাহিত্যরসের ধার ধারে না। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। ভৃত্য যথাসময়ে চা ও কোকো আনিল। শঙ্কর কুমুদবাবুর ঘরে গিয়াছেন শুনিয়া তাহার চা-টা সেখানেই সে লইয়া গেল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। আসিয়া দেখিল, ভন্টু অকাতরে ঘুমাইতেছে। জুতাসুদ্ধ পা চেয়ারের হাতলের উপর তুলিয়া দিয়া, গুটানো বিছানা-স্তূপের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া ভন্টু নিদ্রিত। দক্ষিণ বাহু দিয়া মুদিত চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও ভন্টু ঘুমাইতেছে।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা! আপিসের সারাদিন-ব্যাপী হাড়ভাঙা খাটুনিতে বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ক্লান্ত না হইলে এমনভাবে কেহ ঘুমাইতে পারে না।

এই ভন্টু, ওঠ্, ওঠ্। ঘুমুচ্ছিস কেন এই অসময়ে?

ভন্টু জুতাসুদ্ধ পা দুইটা মৃদু মৃদু নাচাইতে লাগিল। তাহার পর চোখ হইতে হাতটা সরাইয়া বলিল, ক্ষেপেছিস? ঘুমোব কেন? থিঙ্ক্ করছিলাম।

চল্, বেরুনো যাক।

চল্। বাবাজীর সম্বন্ধে কি সেট্‌ল্ করলি?

চল্, রাস্তায় সব বলছি।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল।

৮

কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

ভন্টুর মেজকাকা অর্থাৎ বাবাজী খোল বাজাইতেছিলেন। মুদিত নেত্র; তন্ময় বিহ্বল ভাব। পরিধানে গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন। কীর্তন জমিয়াছিল বাবাজীরই এক বন্ধুর বাড়িতে। তিনি বড়লোক এবং ভন্টুর মেজকাকাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। পুরাকালে অর্থাৎ যখন তাঁহার রক্তের তেজ ছিল, তখন এই বাড়িতে এই হলেই বহুবার বাইনাচ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন তাঁহার ধর্মে মতি হইয়াছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত প্রকারে সঙ্গীত-উৎসব

করা সঙ্গত, তাহাই তিনি ইদানীং করিতেছেন। অর্থাৎ আসলে ভদ্রলোক সঙ্গীত-অনুরাগী। গীতবাদ্যে পারদর্শিতার জন্যই সম্ভবত তিনি ভন্টুর মেজকাকাকে স্নেহ করেন। যাই হোক, কীর্তন খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। কীর্তনীয়া পুরুষ হইলেও সুদর্শন ও সুকণ্ঠ। গৌর ললাটে চন্দনের তিলক, গলায় বেলফুলের শুভ্র মালা, পরিধানে পট্টবস্ত্র—ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। সুরসমারোহে সকলেই সম্মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কীর্তনীয়ার মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। হলের মধ্যে ভীষণ ভিড়। ভন্টু ও শঙ্কর হলের বাহিরে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কীর্তনের সুরে শঙ্করও কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার এক ধারে স্বল্প অন্ধকারে একটি বেঞ্চি পাতা আছে দেখিয়া শঙ্কর ধীরে ধীরে গিয়া তাহারই উপর উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া ভন্টু মৃদু হাস্য করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, তুইও ব'সে পড়লি যে রে!

শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না।

ভন্টু কোনও জবাব না পাইয়া হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া পুনরায় বলিল, কি রে, তুইও লদ্‌কে গেলি নাকি?

চুপ কর্, কথা বলিস না।

ভন্টু কপাল কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি তা হ'লে ততক্ষণ পেছনের চাকাটায় একটু পাম্প্ ক'রে নিই। এইখানে কার একটা বাইকে পাম্প্ রয়েছে দেখছি, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, কি বলিস?

শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না।

ভন্টু গিয়া অসঙ্কোচে নিকটে দেওয়ালে ঠেসানো অপর একটি বাইকের পাম্প্‌টি খুলিয়া লইল ও একটি থামের গায়ে নিজের বাইকটিকে দাঁড় করাইয়া উবু হইয়া বসিয়া পাম্প্ করিতে লাগিয়া গেল।

সেই স্বল্পান্ধকারে বেঞ্চির উপর বসিয়া বসিয়াই শঙ্কর কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন অশ্রুর বিরাট সাগর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। তরঙ্গসমাকুল ফেনিল সমুদ্র, তাহাতে যেন কোটি কোটি রক্তকমল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর

কমলগুলি! এক-একটি দল যেন আগুনের শিখা; ফেনিল নীল জলে গাঢ় রক্তবর্ণ অগ্নিকমলদল ফুটিয়া রহিয়াছে। মদির গন্ধে ও নিরুদ্ধ উত্তাপে বিশাল সমুদ্র উদ্বেলিত।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্র মিলাইয়া গেল।...দিগন্তপ্রসারী জনহীন প্রান্তর। মৃদু জ্যোৎস্নায় গভীর রাত্রি স্বপ্নাতুর। প্রান্তরে কে যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কে সে? চেনা যায় না। প্রান্তরও অদৃশ্য হইল।...চতুর্দিক অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা গলি দেখা যাইতেছে—সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলি। দুই পার্শ্বে বড় বড় অট্টালিকা প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীপরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গলিটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে! সহসা অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গলিটা কাঁদিতেছে। তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে অন্ধকার গুমরিয়া উঠিতেছে, নক্ষত্রকুল স্পন্দিত হইতেছে। কীর্তনীয়া আবেগভরে গাহিয়া চলিয়াছে—"পাষাণ হইলে ফাটিয়া যেত"।

ভনুটুর কণ্ঠস্বরে শঙ্করের স্বপ্নভঙ্গ হইল।

পেছনের চাকাটা একেবারে দক্‌চে গেছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। টায়ারটাই জখম হয়েছে, বুঝলি?

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, তাই নাকি, তা হ'লে উপায়?

প্রোটোটাইপের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওরিজিনাল সম্ভবত এখন বাড়ি গেছে। এই ফাঁকে প্রোটোটাইপকে তিলিয়ে যদি কিছু হয়! চল্‌, তাই করা যাক। কেত্তনের এখন ঢের দেরি, বাবাজীর নাগাল পাওয়া শক্ত।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রোটোটাইপ কে?

আয় না তুই।

শঙ্করের মন তখনও স্বপ্নের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি—কিংবা হয়তো সেইজন্যই বিনা বাক্যব্যয়ে সে ভনুটুর অনুসরণ করিল। তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই লইয়া অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে নীরবে অনেকটা

যন্ত্রচালিতবৎ ভন্টুর পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল এবং এই চলমান অবস্থাতেও তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার শরীর যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গিয়াছে, সে যেন বাতাসে ভর করিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর সহসা ভন্টুর কনুইয়ের আঘাতে তাহাকে আবার কঠিন মাটিতে নামিয়া পড়িতে হইল।

তাহারা একটা গলিতে ঢুকিয়াছিল।

ভন্টু বলিল, দেখ্ দেখ্, ওরিজিনাল ব'সে আছে। মাটি করলে, দাঁড়া এইখানে একটু।

শঙ্কর ভন্টুর তর্জনীনির্দিষ্ট স্থানটায় দেখিল, একটা সাইকেলের দোকান রহিয়াছে এবং দোকানের সম্মুখভাগে এক কোণে চেয়ারে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভদ্রলোকের পরিধানে একটি টাইট-ফিটিং গলাবন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার এবং খাকি হাফপ্যান্ট। পায়ে আজানু কপিশবর্ণের গরম মোজা এবং মস্তকে কান-ঢাকা কালো টুপি। ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূম্রপান করিতেছিলেন। ভন্টু চুপিচুপি বলিল, ইনিই হচ্ছেন ওরিজিনাল মিস্টার ফাইভ।

মিস্টার ফাইভ? সাহেব নাকি?

বেনে। থাম্, একটু বসা যাক এখানে কোথাও। ওরিজিনাল বাড়ি না গেলে সুবিধে হবে না। প্রোটোটাইপ এলেই ওরিজিনাল খসবে—আসবার সময় হয়ে গেছে অল্‌রেডি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ভন্টু পুনরায় বলিল, প্রোটোটাইপ আসে নি ব'লে ওরিজিনাল রেগে টঙ হয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে। কি রকম নাক দিয়ে ভরভর ক'রে ধোঁয়া ছাড়ছে, দেখ্ দেখ্—

শঙ্কর দেখিল।

ভন্টু আবার বলিল, দেরি আছে দেখছি, প্রোটোটাইপ ডুব মেরেছে আজ। একটু বসতে হবে এখানে কোথাও।

নিকটেই একটি চায়ের দোকান ছিল। ভন্টু বাইকটা ঠেলিয়া লইয়া সেই

দিকেই অগ্রসর হইল। শঙ্করও পিছনে পিছনে গেল। চায়ের দোকানে খরিদ্দার কেহ ছিল না। যিনি দোকানের মালিক, তিনি এক কোণে চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া অপর একজন ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ব্যক্তির সহিত তন্ময় হইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে একটি অয়েলক্লথ-পাতা টেবিল প্রসারিত। ভন্টু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল, তাহার পর বলিল, আসতে পারি দাদা?

কোনও উত্তর আসিল না।

ভন্টু তখন বাইকের ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

কচে বারো।—বলিয়া ভদ্রলোক ভন্টুর দিকে তাকাইলেন। তাকাইবা-মাত্র ভন্টু সহাস্যমুখে আবার বলিল, আসতে পারি দাদা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন—কি চান আপনারা?

এই যে আসি, এসে বলছি।

ভন্টু বাইকটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিল এবং শঙ্করকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া বলিল, চলু, একটু বসা যাক।

ভন্টু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে ভদ্রলোকের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। ভদ্রলোক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

করেন কি, করেন কি মশায় আপনি?

ভন্টু হাত দুইটি জোড় করিয়া সহাস্যমুখে বলিল, অগ্রজ আপনি—

বসুন বসুন, কি চান আপনারা?

একটু বসতে চাই শুধু দাদা, চা কিন্তু খাব না, পয়সা নেই। একজনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ, যদি বসতে দেন একটু দয়া ক'রে—

ছ-তিন নয়।

ওয়েস্ট্‌কোট-পরা ভদ্রলোকটি দান ফেলিলেন এবং চকিতে এই আগন্তুকদ্বয়কে একনজর দেখিয়া লইয়া আবার পাশার ছকে মন দিলেন।

বেশ তো, বসুন না ও-ধারের বেঞ্চিটায়।

শঙ্কর বলিল, চা-ই দিন আমাদের, কাছে পয়সা আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, খান না চা, পয়সার জন্যে কিছু আসছে যাচ্ছে না। এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, পয়সার দিকে দেখলে আজ এমন অবস্থা হ'ত না আমার, কি বল মাস্টের ?

ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোক এতদুত্তরে কেবল বলিলেন, হুঃ।

ওরে কেলো, চা দিয়ে যা। তুমি খাবে নাকি আর এক কাপ মাস্টের ?

মাস্টার দক্ষিণ তর্জনীটি দক্ষিণ কর্ণে ঢুকাইয়া মুখবিকৃত করিয়া সজোরে বেশ খানিকক্ষণ কর্ণ-কণ্ডূয়ন করিয়া লইলেন। তারপর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, দাও, আর একবার ইস্‌টিম ক'রে নেওয়াই যাক।

ভন্টু ও শঙ্কর একটু দূরে একটি বেঞ্চিতে উপবেশন করিয়াছিল। ভন্টু এমন স্থানটিতে বসিয়া ছিল, যেখান হইতে ওরিজিনালকে বেশ দেখা যায়।

দোকানের মালিক আবার হাঁকিলেন, ওরে কেলো, তিন কাপ চা দিয়ে যা—আচ্ছা, চার কাপই আন্‌, আমিও খাই আর এক কাপ, কি বল মাস্টের ?

মাস্টার নীরবে সম্মুখের দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

এই চায়ের জন্যেই সর্বস্বান্ত হয়েছি মশায়, বুঝলেন, চা-কে আমি খেয়েছি, চা-ও আমাকে খেয়েছে।

ভন্টু এই কথা শুনিয়া সস্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া তাহার পর বলিল, এ আর নতুন কথা কি শোনালেন দাদা ? ভাল লোকের দুর্দশা চিরকালই। মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘ'টে আসছে। হাতটা একবার দেখাবেন দয়া ক'রে ?

হাত দেখতে জানেন নাকি আপনি ?

যৎসামান্য।

তবে আপনি তো গুণী লোক মশায়।

পাশা ফেলিয়া দোকানের মালিক করতল প্রসারিত করিয়া ভন্টুর নিকট আসিয়া বসিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার জমাটী খেলাটা এইভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তুমি আবার নতুন হুজুগে মাতলে দেখছি ! আশ্চর্য লোক বটে তুমি !

কেহ ইহার কোনও উত্তর দিল না। ভন্টু ভদ্রলোকের দক্ষিণ করতলটি

লইয়া তাহাতে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল। কেলো নামক ভৃত্যটি ভিতরের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া চা দিয়া গেল।

সকলেই নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। ভনুটু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোক বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে করকোষ্ঠী ব্যাপারে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত মাস্টার ডিশে ঢালিয়া ঢালিয়া অল্প সময়েই চাটুকু নিঃশেষ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি মরিচা-ধরা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি অতি নিপুণতার সহিত ধরাইয়া বেশ জুত করিয়া বসিলেন এবং মুখের এমন একটা ভাব করিয়া ভনুটু ও দোকানের মালিক ভদ্রলোকের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, যেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি দুইজন শিশুর ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানা নিরুপায় হইয়া সহ্য করিতেছেন এবং উপভোগও করিতেছেন।

কীর্তন শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনটা কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে খাইতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া ভনুটু অবশেষে দোকানের মালিক ভদ্রলোকের করতলটি ছাড়িয়া দিল এবং বামহস্তধৃত পেয়ালা হইতে বাকি চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

কি দেখলেন মশায় ?

ভনুটু কোনও উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একটি অত্যন্ত মলিন রুমাল বাহির করিয়া নির্বিকারচিত্তে মুঁখটি মুছিল এবং তাহার পর বলিল, যা দেখলাম, তাতে আপনার পায়ের ধুলো আর একবার নিতে হবে। এর বেশি আর কিছু বলব না এখন।—বলিয়া সে সত্য সত্যই আর একবার চট্ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলেন।

আহা, কি যে করেন আপনি খালি খালি ! কি দেখলেন তাই বলুন ?

কিছু বলব না দাদা, খালি পায়ের ধুলো নেব। শঙ্কর, পায়ের ধুলো নে এঁর—সঙিন ব্যাপার !

শঙ্কর মৃদু হাসিল। দোকানের মালিক ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে উঠি
দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, আচ্ছা লোক তো আপনি মশায়!

ভন্টু স্মিতমুখে বলিল, কিছু বলতে হবে না, হদিস পেয়ে গেছি দ
আপনার। এখন মাঝে মাঝে এসে জ্বালাতন করব আপনাকে। অ
সময় কম।

ভন্টু দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে শঙ্করকে বলিল, প্রোটোটাইপ এ
গেছে, ওঠ্।

শঙ্কর চায়ের দাম বাহির করিয়া দিতে গেলে দোকানী ভদ্রলোক নমস্
করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, মাপ করবেন, আপনাদের চা তো আমি বি
করি নি। মনে রাখবেন অধীনকে, তা হ'লেই যথেষ্ট।

ভন্টু হাসিয়া বলিল, হাত দেখেই সে বুঝেছি।

ভন্টু ও শঙ্কর দোকান হইতে নামিয়া পড়িল। ভন্টু স্মিতমু
ওয়েস্ট্‌কোট-পরিহিত ভদ্রলোকের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনা
আর একদিন এসে চাঙাব দাদা, আজ সময় বড় কম।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

শঙ্কর ও ভন্টু বাইকের দোকানের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভন্টু বলিল, থাম্।

বাইকের দোকানের সন্নিহিত একটি স্বল্পান্ধকার স্থানে উভয়ে থামিল
শঙ্কর দেখিল, একটি যুবক দোকানে আসিয়াছে এবং ভন্টু যাহাকে ওরিজিনা
নামে অভিহিত করিয়াছিল, তিনি যুবকটিকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

সমস্ত বিকেলটা পার ক'রে দিয়ে এলে, অথচ একটি পয়সা আদায় হয় নি-
কি রকম? তাগাদায় বেরিয়েছিলে, না, আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলে? পাশে
বাড়ি এক গাইয়ে মেয়ে জুটেছে, সে তো তোমার মাথাটি খেলে দেখছি
মৃগেনবাবুর ওখানে কি বললে? আজ তো তার দেবার কথা।

যুবক অপ্রতিভ হইয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিল, বা
ছিলেন না।

বাড়িতে জনপ্রাণী কেউ ছিল না?

কেউ সাড়া তো দিলে না, অনেকক্ষণ কড়া-নাড়ানাড়ি করলাম।
ভূতের কাছে যামদোবাজি! দাও, বিলটা আমাকে দাও, যে
দেখি যদি ধরতে পারি। স্পষ্ট কথাটি হচ্ছে, কোন কাজেরই তুমি
বি. এ. পাস করলে কি হবে? ফিনফিনে জামা গায়ে দিয়ে বেরি
এই শীতে? সোয়েটার কোথা? ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার একটা
বাধাও, কিছু টাকা লম্বা হয়ে যাক আমার। সোয়েটার কোথা?

এখানেই আছে।

গায়ে দাও দয়া ক'রে সোয়েটারটি। আর এই নাও, এই টুপিটা
বেশ ক'রে কান-টান ঢেকে-ঢুকে ব'স। দশটার আগে দোকান বন্ধ
না যেন।—বলিয়া ওরিজিনাল মঙ্কি-ক্যাপটি খুলিয়া ফেলিলেন।

ভন্টু শঙ্করের কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি বলিল, ঘোর
পড়েছে প্রোটোটাইপ। দেখ্ দেখ্, মিস্টার ফাইভকে দেখ্ এইবার।

শঙ্কর দেখিল, টুপি খুলিয়া ফেলাতে ওরিজিনালের অনাবৃত মুখমণ্ডল
দেখা যাইতেছে। মুখখানির বিশেষত্ব আছে। দেখিতে ঠিক বাংলা পাঁ
মত। কিছু গোঁফদাড়িও আছে। শঙ্কর ইহাও লক্ষ্য করিল যে, যুব
মুখও ওরিজিনালের অনুরূপ, কেবল গোঁফদাড়ি নাই।

ভন্টু চুপিচুপি আবার বলিল, মিলিয়ে দেখ্ ওরিজিনাল
প্রোটোটাইপ পাশাপাশি রয়েছে—দেখ্, দেখ্, ভাল ক'রে দেখ্
রাস্‌কেল।

ভন্টু শঙ্করকে একটা খোঁচা মারিল।

ওরিজিনাল বলিতেছেন শোনা গেল, দাও, আমার সাইকেলটা দা
মৃগেনবাবুর বিলটাও দাও, দেখি যদি ব্যাটার নাগাল পাই।

প্রোটোটাইপ একটি সেকেলে ধরনের বাইক বাহির করিল, এবং তদুপরি
আরোহণ করিতে করিতে ওরিজিনাল পুনর্বার প্রোটোটাইপকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে
সতর্ক করিয়া দিলেন।

তোমার একে কোফো ধাত, ঠাণ্ডা লাগিও না যেন, সোয়েটার আর টুপিট
প'রে ফেল। যাই, দেখি মৃগেনবাবুকে যদি ধরতে পারি!

ওরিজিনাল চলিয়া গেলে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল প্রোটোটাইপ ওরিজিনালের কে হয়?

ছেলে। আয়, এইবার যাওয়া যাক—কোস্ট্ ইজ ক্লিয়ার।

উভয়ে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া বাইকের দোকানের সম্মুখবর্তী হইল। ভন্টুকে দেখিবামাত্র প্রোটোটাইপ নমস্কার করিল এবং হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, সেদিন আপনি কোথায় চ'লে গেলেন ভন্টুবাবু? আমি রাশিচক্রের ছকটা টুকে নিয়ে এসে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় ব'সে ছিলাম। কোথায় গেলেন বলুন তো, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ভন্টু হাস্যস্নিগ্ধ মুখে কেবল তাহার দিকে একবার চাহিয়া বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিল।

প্রোটোটাইপ আবার বলিল, কোথা গেলেন সেদিন বলুন দেখি, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

সব বলছি। ওই টিনের চেয়ারটা নাবান তো আগে।—বলিয়া ভন্টু দোকানের অভ্যন্তরস্থ একটি টিনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হ্যাঁ, এই যে।

প্রোটোটাইপ নানাভাবে-জখম নানাবিধ বাইকের জঙ্গলের ভিতর হইতে টিনের চেয়ারটি বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। ভন্টু সেটি ফুটপাতে পাতিয়া দিয়া শঙ্করকে বলিল, ব'স্ তুই। শঙ্কর বসিল। দোকানের ভিতরে এক কোণে একটা ময়লা চট পাতা ছিল, ভন্টু তাহাতেই বেশ জমায়েত হইয়া বসিল এবং তাহার বুক-খোলা জামার ভিতরের পকেট হইতে একটি ছোট নোট-বুক বাহির করিয়া বলিল, কই, দেখি রাশিচক্রটা!

প্রোটোটাইপ কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া একটি টিনের বাক্স খুলিল এবং এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া ভন্টুর হাতে দিল। উহাতেই রাশিচক্র টোকা ছিল। ভন্টু কাগজখানি লইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেটির দিকে তাকাইয়া রহিল এবং তৎপরে তাহা নোট-বুকে টুকিয়া লইয়া বলিল, জটিল ব্যাপার দেখছি। এ বংকসি মশায়ের কাছে না গেলে হবে না। আমি

বক্সি মশায়ের কাছে যাব ভাবছিলাম আজই, কিন্তু বাইকের পেছনের চাকাটা একেবারে দকচে গেছে। রাম দক্চান দক্চেছে।

বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি আপনার, ভয় কি! কি হ'ল বাইকের?

ভন্টু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাকে ঠেঙালেও আজ পয়সা বেরুবে না।

প্রোটোটাইপ আহত আত্মমর্যাদার স্থরে বলিল, আপনার সঙ্গে কি আমার খদ্দের-দোকানী সম্পর্ক? কেবল দেখবেন, বাবা না জানতে পারেন—বাস্। জানেন তো সবই।

ভন্টু কিছু না বলিয়া সহাস্যদৃষ্টি মেলিয়া প্রোটোটাইপের দিকে চাহিয়া রহিল।

দাঁড়ান, সোয়েটারটা প'রে নিই আগে। তা'র পর আপনার বাইক ঠিক ক'রে দিচ্ছি এক্ষুনি। ওরে মটরা, বাইকটা তোল্ তো।

আড়ময়লা ফতুয়া ও লুঙ্গি পরা একটি ছোকরা বিড়ি টানিতে টানিতে পিছনের একটি ঘর হইতে বাহির হইল এবং ভন্টুর প্রতি একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এসব মেরামতির কাজ সকালের দিকে আনলেই স্থবিধা হয় বাবু, বুঝলেন? মিসিনারির কাজ—

ভন্টু কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

প্রোটোটাইপ ধমক দিয়া উঠিল।

তুই বাজে কথা ছেড়ে যা বলছি কর্ দিকিন—তোল্ বাইকটা।

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়া মটরা সেটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং অস্ফুটস্বরে গজর গজর করিতে করিতে বাইকটা তুলিয়া ফেলিল। প্রোটোটাইপ বাইকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, চল্ না, ততক্ষণ আমরা মেজকাকার ব্যাপারটা সেরে আসি। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

ভন্টু প্রোটোটাইপের দিকে মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, লক্ষ্মণবাবু রাজী হ'লেই যেতে পারি, উনিই এখন মালিক।

লক্ষ্মণবাবু অর্থাৎ প্রোটোটাইপ এই কথায় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

কি যে বলেন আপনি ভন্টুবাবু! কোথা যাবেন এখন আবার, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে?

ইহাতে ভন্টু এমন একটা মুখভাব করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, যেন মেজকাকার সহিত দেখা করাটা শঙ্করেরই প্রয়োজন এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে।

শঙ্কর লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি, বাইকটা ততক্ষণ সারা হোক। আয় ভন্টু।

ভন্টু করজোড়ে লক্ষ্মণবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুমতি দিচ্ছেন তো? এ ছোকরা কিছুতে ছাড়বে না।

সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিভ হইয়া লক্ষ্মণবাবু বলিল, মানে? নিশ্চয়। তবে সেদিনকার মতন আবার করবেন না যেন, আসা চাই।

বাইক জামিন রইল।

একবার তো বাইক ফেলে পালিয়েছিলেন। বাবার কাছে নানারকম মিথ্যে কথা ব'লে শেষটা নিস্তার পাই সেদিন।

না, ঠিক আসব।

ভন্টু ও শঙ্কর মেজকাকার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভন্টু অযাচিতভাবেই ওরিজিনাল ও প্রোটোটাইপের কাহিনী শঙ্করকে শুনাইতে লাগিল। ওরিজিনালের নাম দশরথ। দশরথের দুই পুত্র—রাম ও লক্ষ্মণ। রাম মারা গিয়াছে, নিউমোনিয়া হইয়াছিল। স্ত্রীও বহু আগে মারা গিয়াছেন। লক্ষ্মণই এখন ওরিজিনালের সবে-ধন নীলমণি। ওরিজিনাল টাকার কুম্ভীর। বাইকের দোকান আছে, মহাজনী কারবার আছে, কলিকাতায় দুইখানা বাড়ি আছে, ব্যাঙ্কে বেশ কিছু নগদ টাকাও আছে। তথাপি ওরিজিনালের এক পয়সা বাপ-মা। এদিকে প্রোটোটাইপ অন্যপ্রকৃতির। কৃপণ তো নয়ই—রসিক। পাশের বাড়ির একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস থাকায় গোপনে মেয়েটির কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েটির সহিত যদি প্রোটোটাইপের কোষ্ঠীর মিল হয়, তাহা হইলে প্রণয়-ব্যাপারে

নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইবে এবং ওরিজিনালের নিকট কাহারও মারফৎ প্রস্তাবটা করিবে। ওরিজিনালও কোষ্ঠী-পাগল লোক। সুতরাং কোষ্ঠীর মিল সর্বাগ্রে দরকার। কোষ্ঠীর মিল না হইলেই সর্বনাশ। তখন যে প্রোটোটাইপ কি করিবে, তাহা ভনুটুর কল্পনাতীত।

গলিটা হইতে বাহির হইয়া শুনিতে পাইল, কীর্তন চলিতেছে। একটু কাছাকাছি হইতেই শঙ্কর শুনিতে পাইল—রসভরে ছুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই। আর একটু কাছে যাইতেই তাহারা দেখিতে পাইল, ভনুটুর মেজকাকা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, অপর আর একজন খোল ধরিয়াছেন।

ভনুটু কাছে গিয়া বলিল, মেজকাকা, শঙ্কর এসেছে।

শঙ্কর? কই, এই যে, এস এস এস।

মেজকাকা শঙ্করকে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিলেন, ভেতরে বসবে নাকি তোমরা? বসিয়ে দেব?

শঙ্কর বলিল, না থাক্। আমাকে আবার এখুনি হস্টেলে ফিরতে হবে। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে চলুন একটু গল্প করা যাক্, অনেক ঘুরে এলেন আপনি।

বেশ বেশ বেশ—চল, তাই চল। ও-দিককার ঘরটায় যাওয়া যাক, চল তা হ'লে।

শঙ্কর ও ভনুটুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পিছনের দিকে একটা ঘরে গেলেন। ঘরের ভিতর একটি প্রকাণ্ড চৌকিতে ফরসা চাদর বিছানো ছিল। তিনজনে গিয়া তাহাতেই বসিলেন। ভনুটু কপাটটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

মেজকাকা সহাস্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই ভনুটুও হাসিমুখে বলিল, আসুন, নিরিবিলিতে একটু লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক। শঙ্কর এসেছে—

মেজকাকা শঙ্করের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, ভনুটুটা চিরকালই একরকম রইল। ওর শিশুত্ব আর ঘুচল না, কি বল?

শঙ্কর বলিল, কিন্তু ও হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছে, এটা তো ঠিক নয়।

না না না, পড়তে হবে ওকে। আমরা অর্থাভাবে পড়তে পাই নি; ভন্টুকে কিন্তু পড়তে হবে। সেটি হবে না।—বলিয়া মেজকাকা চক্ষু বুজিয়া কি যেন প্রণিধান করিতে লাগিলেন। 'অর্থাভাবে পড়তে পাই নি' কথাটা অবশ্য সত্য নয়—মেজকাকা খেয়ালবশত পড়াশুনা ছাড়িয়াছিলেন। সে যাই হোক, খানিক চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর পুনরায় মেজকাকা চাহিলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর বলেন—অশিক্ষিত পুরুষ এবং বিধবা নারী সমান দুর্ভাগা। দুজনেরই জীবনের সম্ভাবনা ছিল অনেক, কিন্তু হ'ল না কিছুই। এ যেন প্রদীপে তেল-সলতে সবই রয়েছে, কেবল শিখাটি কেউ জ্বালিয়ে দিলে না। নাঃ, ওসব কাজের কথা নয়, ভন্টুকে পড়তে হবে। ভন্টু, কালই তুমি কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

ভন্টু সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রুধির?

ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? সে দায়িত্ব আমাদের। কি বল শঙ্কর?

শঙ্কর সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

তাহার পর বলিল, আপনি কি তা হ'লে আবার চাকরি নেবেন?

দেখি, তাই বোধ হয় নিতে হবে শেষ পর্যন্ত। কর্মের বন্ধন ইচ্ছে করলেই তো আর ছিন্ন করা যায় না। বিষ্টুর অসুখ হয়েই মুশকিল হয়ে পড়েছে। অসুখ হবে না? ব্রহ্মচর্যই হ'ল স্বাস্থ্যের ভিত্তি। বউমাই অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেললেন বিষ্টুকে।—বলিয়া মেজকাকা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং চক্ষু বুজিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজির মধ্যে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ও ভন্টু নীরব হইয়া রহিল। ভন্টু পিছনের দিকে বসিয়া ছিল, সে একবার ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া মেজকাকাকে ভ্যাঙাইল।

কিছুক্ষণ পরে মেজকাকা চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন এবং বলিলেন, নাঃ, ভন্টুর জন্যেই আমাকে শেষকালে চাকরি নিতে হবে। ওর পড়া বন্ধ হতে দিতে পারি না আমি। আবার তিনি চক্ষু বুজিলেন ও দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিল, আমি আজ বোস সায়েবের বাড়ি গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আপনার চাকরির কথা উঠল, বোস সায়েব

বললেন—কিছুদিন পরে কয়েকজনকে নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্যে একটা কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে হবে। সে কি সুবিধে হবে আপনার ?

ভনুটু সহাস্যে বলিল, শুনলেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা ? ও [illegible]নাকে পরীক্ষার ভয় দেখাতে চায়।

মেজকাকা কিছু না বলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, পরীক্ষার জন্যে ভাবি না, পরীক্ষা অনেক দিয়েছি, আরও দিতে হবে। সমস্ত জীবনটাই পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল ঠাকুরের হাতে। না, আমি পরীক্ষার জন্যে ভাবছি না, আমি ভাবছি ঠাকুরের কথা। চাকরি যদি নিতে হয়, তা হ'লে ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিতে হবে। তিনি এখন অনুমতি দেবেন কি না— সেইটে হ'ল সমস্যা। এমনিই তো তাঁর বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি— থাকবার কথা আমার কাশীতে।

শঙ্কর বলিল, চিঠি লিখুন না একটা তাঁকে, কোথায় আছেন তিনি আজকাল ?

ভনুটু বলিল, শুনছেন মেজকাকা, শঙ্করের কথা ? ঠাকুরকে চিঠি লিখে অনুমতি নিতে বলছে! ষাঁড়ের গোবর কি গাছে ফলে! ঠাকুর কি আপিসের বড়বাবু নাকি যে, করেস্‌পণ্ডেন্স্‌ করলে জবাব পাওয়া যাবে! কি সুডোল গাড়োল রে তুই !

মেজকাকা একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিলেন, আহা, সে শঙ্কর জানবে কি ক'রে ?

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না ভাই, চিঠিপত্র লিখলে কাজ হবে না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবেন কাগজ দোয়াত কলম—তাঁর কাছে নিজেই যেতে হবে। কিন্তু তাঁকে ধরাই শক্ত। চল না সবাই মিলে যাই একদিন—আলাপও হয়ে যাবে। ভনুটুও ঠাকুরকে দেখে নি এখনও। ভনুটুকে দেখলে আর ভনুটুর কথা শুনলে ঠিক অনুমতি দেবেন উনি।

ভনুটু বলিল, আসছে শনিবার চলুন তা হ'লে, সোমবারও ছুটি আছে। কোথায় আছেন তিনি ?

মেজকাকা উত্তর দিলেন, ভাগলপুরে।

ভন্‌টু বলিল, শঙ্কর, যাবি? চল্‌ না, ঘুরে আসি।

এমন সময় হঠাৎ কে বাহির হইতে কপাটে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। কপাট খুলিয়া দিতেই একজন ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিয়া মেজকাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একবার আসুন তো, মৃন্ময়বাবু মূর্ছা গেছেন হঠাৎ কীর্তন শুনতে শুনতে।

ভন্‌টু বলিয়া উঠিল, কে, মোমবাতি? সে কি কেত্তন শুনছিল নাকি এখানে ব'সে?

মেজকাকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, সে তো সন্ধ্যে থেকেই এসে বসেছে।

সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ভন্‌টু দেখিল, মোমবাতিই মূর্ছা গিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দৃঢ়নিবদ্ধ অধর দুইটিও মাঝে মাঝে কাঁপিতেছে। চক্ষু দুইটি মুদিত।

মেজকাকা বলিলেন, ও কিছু নয়, ভাব লেগে গেছে, মুখে চোখে জল দিলেই এখনই ঠিক হয়ে যাবে।

তাহাই করা হইতে লাগিল।

একটু পরে শঙ্কর বলিল, আমাকে এইবার ফিরতে হবে, আটটা বেজে গেছে।

প্রোটোটাইপের ওখানে যাবি না?

না ভাই, আজ আর সময় নেই।

আমাকে কিন্তু যেতে হবে, তার আগে মোমবাতিটার একটা হিল্লে করতে হবে আবার। রাস্‌কেল্‌টার কাণ্ড দেখেছিস, আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে কেত্তন শুনছিল! চল্‌, তোকে একটু এগিয়ে দিই।

পথে বাহির হইয়া ভন্‌টু আবার বলিল, বাবাজীকে আর ঠাকুরের কাছে যেতে দেওয়া নয়, দেখা হ'লেই আবার ডুব মারবে। ক্ষেপেছিস তুই! অনুমতি-টনুমতি বাজে ওজর।

শঙ্কর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, আমি চলি ভাই এখন।

আচ্ছা, যা।

যদিও হস্টেলে ফিরিবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল যে, এখন তাহার হস্টেলে ফেরা চলিবে না। তাহাকে একবার শৈলর সহিত দেখা করিতেই হইবে। সকালে অমন করিয়া চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। সে দ্রুতবেগে বোস সাহেবের বাড়ির দিকে চলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর বোস সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই অসময়েও সে গিয়া শৈলকে প্রথমেই এক কাপ চা করিতে ফরমাশ করিবে। দোকানের চা-টা তেমন সুবিধার হয় নাই। তাহা ছাড়া শৈলকে খুশি করিবার সহজ উপায়ই হইতেছে এই—তাহাকে নানা ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা। শৈল গনগন করিবে, উপদেশ দিবে, নানা অসুবিধার উল্লেখ করিবে; কিন্তু চা-টুকু শেষ পর্যন্ত করিয়া দিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিবে। ইহাই তাহার স্বভাব। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, শুধু চা নয়, শৈলকে দিয়া প্রস্তুত করাইয়া কিছু খাবারও খাইতে হইবে। ছেলেবেলার কথা তাহার মনে পড়িল। মিত্তির-বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারাগাছ ছিল। মিত্তির-বাড়িতে শৈলর যতটা অবাধ গতিবিধি ছিল, অপর কাহারও ততটা ছিল না। শৈলর মধ্যস্থতায় অনেকেই সেই পেয়ারা ভক্ষণ করিত। শৈলকে মিত্তির-বাড়ির পেয়ারা আনিয়া দিতে বলিলে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মনে মনে খুশি হইত এবং নানা কৌশলে পেয়ারা চুরি করিয়া আনিয়া দিত। শৈলর সেই স্বভাব আজও বদলায় নাই। তাহাকে গিয়াই চা ও মোহনভোগের ফরমাশ করিতে হইবে।

হঠাৎ একটা মোটর-হর্নের চিৎকারে শঙ্কর সচকিত হইয়া উঠিল। দেখিল, বোস সাহেবেরই মোটর। মোটরখানা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, বোস সাহেব নিজেই ড্রাইভ করিতেছেন, পাশে সুসজ্জিতা শৈল বসিয়া আছে। শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হস্টেলে ফিরিয়া শঙ্কর তিনখানি পত্র পাইল।

একখানি বাবার—মায়ের পাগলামি অত্যন্ত বাড়িয়াছে। একখানি মিষ্টিদিদির—আবার নিমন্ত্রণ। আর একখানি সুরমা বম্বে হইতে লিখিয়াছে—রহস্যময় পত্র।

৯

শিয়ালদহ অঞ্চলে গলির মধ্যে ছোট একটি বাসা। সেই বাসার ক্ষুদ্র একটি ঘরে মৃন্ময় মুখোপাধ্যায় ওরফে মোমবাতি নিবিষ্ট চিত্তে একখানি পত্র লিখিতেছিল। ঘরটিতে আসবাবপত্রের মধ্যে ছোট একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটি দেওয়াল-ঘড়ি, একখানি চেয়ার এবং কাছেই একটি রিভল্‌ভিং বুক-শেল্‌ফ রহিয়াছে। টেবিলের ওপর একটি ইলেক্‌ট্রিক্ আলো। আলোর ডোমটি গাঢ় রক্তবর্ণ, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড রক্তজবা বাঁকা বৃন্তের উপর বিদ্যুতায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রঙিন চিঠির কাগজে গভীর মনোনিবেশসহকারে মৃন্ময় যে পত্রখানি লিখিতেছিল, তাহা এই—

প্রিয়তমাসু,

কাল নানা গোলমালের মধ্যে ছিলাম বলিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করিও না। কাল এক জায়গায় কীর্তন শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিতে শুনিতে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি মূর্ছা যাই। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন বিরহ-কাহিনীর মধ্যে আমি তোমারই গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, যেন কীর্তনীয়ার কণ্ঠে রাধার জবানিতে তোমারই অন্তরের আকুলতা তুমি নিবেদন করিতেছ। সে নিবেদন এত করুণ, এত মর্মস্পর্শী যে, আমি নিজেকে ঠিক রাখিতে পারি নাই, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ভন্টু আমাকে শুশ্রূষা করিতেছে। সে-ই আমাকে গভীর রাত্রে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেইজন্য কাল আর আমি তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সেই কীর্তন শুনিবার পর হইতে অহরহ তুমি

আমার মন জুড়িয়া বসিয়া আছ। তোমার অশ্রুছলছল ডাগর চক্ষু দুইটি আমার মনের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কোথায় তুমি? বিশ্বাস কর, আমি তন্নতন্ন করিয়া তোমাকে খুঁজিয়াছি। এখনও খুঁজিতেছি এবং চিরকাল খুঁজিব। তোমাকে খোঁজাই আমার জীবনের ব্রত। সেইজন্যই পুলিস-অফিসারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুলিসে চাকুরি লইয়াছি—তোমাকে খুঁজিয়া আমি বাহির করিবই। ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য, পুলিসে চাকুরি করা অথবা পুনরায় বিবাহ করা উপলক্ষ্য মাত্র। এই কথাটি আমি প্রতিদিন লিখি, আজও আবার লিখিলাম। কারণ ইহাই আমার জীবনের মন্ত্র। মন্ত্রকে জাগ্রত রাখিতে হইলে প্রতিদিন তাহা জপ করিতে হয়। হাসিকে বিবাহ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি তাহা সত্য, কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই আমাদের দেশে আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। পুলিসে চাকুরি লইলে ভাল করিয়া তোমার সন্ধান করিতে পারিব। কিন্তু পুলিস-অফিসারের জামাই হওয়া ছাড়া এ লাইনে ঢুকিবার অন্য কোন প্রকার উপায় বা যোগ্যতা আমার ছিল না। হাসি নির্দোষ তাহা জানি, কিন্তু উপায় নাই। দেবীপূজায় চিরকাল নিরীহ জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে—ইহা সনাতন নিয়ম। ইহা পরিবর্তন করিবার সাধ্য আমার ছিল না। হাসিকে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরে স্থান দিতে পারি নাই। কারণ সেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ। এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর তুমি ত্যাগ কর নাই। হাসিকে স্থান দিব কোথায়? পাশের ঘরেই সে আমার অপেক্ষায় শুইয়া আছে। একটু পরেই আমি তাহার পাশে গিয়া শয়ন করিব। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু ঘুচিবে না। আমার এবং হাসির মধ্যে তুমি তোমার সমস্ত সত্তা লইয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমাকে অতিক্রম করে, এমন সাধ্য হাসির নাই।

কিন্তু তুমি কোথায় আছ? এস, আমার স্বপ্নের মধ্যে আজ। রোজই তো তোমায় স্বপ্নে দেখা দিতে বলি, কই, আস না তো? আমার জাগ্রতলোকের প্রতি মুহূর্তটি তুমি অধিকার করিয়া থাক, স্বপ্নলোকে তোমায়

তেমনভাবে পাই না কেন? ঘুমের ঘোরে তোমাকে যেন হারাইয়া ফেলি। তাই মনে হয়, জাগিয়া বসিয়া থাকি, জাগিয়া বসিয়া তোমার কথা চিন্তা করি। আমার মনের আকুলতা লিখিয়া বোঝানো অসম্ভব। তবু রোজ লিখি, না লিখিয়া পারি না। আজ স্বপ্নে নিশ্চয় দেখা দিও। তোমার জন্য তৃষিত হইয়া আছি। কবে তুমি আসিবে? ইতি—

তোমারই

মৃন্ময়

পত্রখানি শেষ হইলে মৃন্ময় একটি রঙিন খাম বাহির করিয়া পত্রখানি তাহার মধ্যে পুরিল এবং সেটি সীল করিয়া তাহার উপর লিখিল—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী। তাহার পর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি চন্দনকাঠের বাক্স বাহির করিল এবং সেই বাক্সের মধ্যে পত্রখানি রাখিয়া দিল। বাক্সে অনুরূপ আরও অনেক পত্র ছিল। চন্দনের বাক্সটি দেরাজে পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। মৃন্ময় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার ঘড়িটার পানে চাহিল ও তৎপরে টেবিল-ল্যাম্পটি নিবাইয়া দিয়া ধীরপদসঞ্চারে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাসি ঘুমাইতেছে। নিরীহ কিশোরী-মূর্তি। বয়স বড় জোর চৌদ্দ কি পনরো। পরনে একখানি রাঙা ডুরে শাড়ি। সুডোল হাতে সোনার চুড়ি। পাড়-বসানো গোলাপী রঙের একখানি র‍্যাপার গায়ের উপর পড়িয়া আছে। নির্নিমেষ নেত্রে মৃন্ময় কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, হাসি, ওঠ, চল, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক।

হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ও চক্ষু দুইটি কচলাইতে কচলাইতে বলিল, ওই দেখ, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া বলিল, চল, নেচি কেটেই রেখেছি, সেঁকে দিতে আর কতক্ষণ যাবে? গরম গরম সেঁকে দিইগে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে, নয়? কি করছিলে এতক্ষণ ব'সে?

মৃন্ময় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, আপিসের কাজকর্ম করছিলাম।

হাসি হাসিয়া বলিল, আর আমি শুয়ে কেমন ঘুমুচ্ছিলুম! সত্যি, ভারি স্বার্থপর আমরা। তোমরা মুখে রক্ত উঠিয়ে রোজগার ক'রে আনবে, আর আমরা দিব্যি মজা ক'রে তা খরচ করব। তুমি বেচারী ও-ঘরে খেটে মরছ, আর আমি কেমন আরাম ক'রে ঘুমুচ্ছি! মুখে আগুন আমাদের।

ম্লান হাসি হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, উপায় কি?

হাসি গা ভাঙিয়া সহাস্যমুখে বলিল, সত্যি, আমারও না ঘুমিয়ে উপায় নেই। বাপ-মা বাংলা লেখাপড়াটা পর্যন্ত শেখায় নি যে, বই-টই প'ড়ে সময় কাটাই। নিজের বাপ-মা-ই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় বড়, আমার এ তো পাতানো বাপ-মা।—বলিয়া হাসি কাপড়টাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, উঃ, শীত করছে। র‍্যাপার জড়িয়ে রান্না-বান্না করা যে কি মুশকিল, তোমাকে তো ব'লে ব'লে হার মানলাম, সোয়েটার একটা তুমি কিনে দিলে না। চল, উনুন-ধারে যাই, বড্ড শীত করছে।

রোজই ভুলে যাই, কাল কিনে আনব ঠিক।

নিজের বাপ-মা থাকলে শীতের তত্ত্ব করত, পাতানো বাপ-মা কিনা, তাই ওসব বাজে খরচের দিকে যেতে চায় না।

হাসি বড় পুলিস-অফিসারের কন্যা বটে, কিন্তু পালিতা কন্যা। আসলে ভদ্রলোক হাসির দূরসম্পর্কের পিসামহাশয়। অসহায়া পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে মানুষ করিয়াছিলেন এবং চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

মৃন্ময়ের পূর্বপত্নী যে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু হাসিকে সে কথা ঘুণাক্ষরে জানান নাই। মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, চিনু খেয়েছে?

কোন্ সকালে খেয়ে নিয়েছে ঠাকুরপো, নটা বাজতে না বাজতেই। কলেজে সমস্ত দিন থাকে, ছেলেমানুষ তো, খিদে পেয়ে যায়। চল, উনুনও বোধ হয় এতক্ষণ নিবে ধুস হয়েছে।

মৃন্ময়ের ভাই চিন্ময় মফস্বল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিয়া এই বছর কলেজে ভরতি হইয়াছে। উপরের ঘরখানায় সে থাকে। সেইটেই তাহার পড়িবার ও শুইবার ঘর।

হাসি ও মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সামান্য একফালি উঠানের পরই রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢুকিয়াই হাসি বলিল, যা ভেবেছি তাই, এতক্ষণ কি আর আঁচ থাকে? আঁচের আর অপরাধ কি? স্টোভটা জ্বালি, থাম।

হাসি স্টোভ বাহির করিয়া জ্বালিতে বসিল এবং স্পিরিট ঢালিতে ঢালিতে বলিল, স্টোভে আবার রুটি ভাল হয় না।

মৃন্ময় নিকটস্থ একটি বালতি হইতে জল লইয়া হাত-মুখ ধুইতে লাগিল, এ মন্তব্যের কোনও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। তাহার পর হাসি জ্বলন্ত স্পিরিটের দিকে চাহিয়া মৃন্ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হ্যাঁ গা, একটা কথা রাখবে আমার?

কি কথা?

পরেশবাবুদের বাড়ি এমন সুন্দর সুন্দর বেড়ালছানা হয়েছে! তুমি যদি বল—নিয়ে আসি একটা চেয়ে।

বেশ তো। এনো।

একটা ধবধবে সাদা বাচ্চা—এমন মিষ্টি দেখতে যে কি বলব!

তাই নাকি?

স্টোভটায় পাম্প্ করিতে করিতে মহা উৎসাহে হাসি বলিল, দেখবে? নিয়ে আসব এখন? এই তো পাশের বাড়ি, ওরা ঠিক জেগে আছে এখনও।

এখন থাক্, কাল এনো।

মায়ের ল্যাজে ছোট্ট ছোট্ট থাবা মেরে মেরে এমন সুন্দর খেলা করছিল আজ দুপুরে, সে যদি দেখতে! কি দুষ্টু দুষ্টু চোখ!

হঠাৎ দুয়ারে কড়া নড়িল। এত রাত্রে কে আবার আসিল?

কে?

মৃন্ময় বাহির হইয়া গেল। কপাট খুলিতেই বড় বড় চুল-গোঁফ-দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক সহাস্য মুখে বলিলেন, মৃন্ময় নাকি? ভাল আছ তো সব?

কে? মুকুন্দমশাই? আসুন আসুন—এত রাতে কোথা থেকে?

মুশকিলে প'ড়ে এসেছি। চল ভেতরে, সব বলছি।

মৃন্ময়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

হাসি একমুখ হাসি লইয়া বলিল, ওমা, আপনি!

তাড়াতাড়ি আসিয়া সে মুকুজ্জেমশাইয়ের পদধূলি লইল। তাহার দেখাদেখি মৃন্ময়ও প্রণাম করিল। মুকুজ্জেমশাই উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া হাস্যস্নিগ্ধ মুখে হাসির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ভাল আছিস তো পাগলী?

ভুলেও তো খোঁজ নেন না একবার। আজ যে কি ভাগ্যি এলেন?

হাসি অভিমান ভরে ঠোঁট দুইটি ফুলাইল। মুকুজ্জেমশাই একটু হাসিয়া বলিলেন, স্বামীর কাছে আছিস—এখন আর খোঁজ নেবার দরকার নেই তো।

দরকার না থাকলে বুঝি আসতে নেই?

মুকুজ্জেমশাই সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মুকুজ্জেমশাইকে দেখিলেই আপনার জন বলিয়া মনে হয়। যদিও মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, মাথায় তৈলবিহীন চুল—কিন্তু এমন একটি স্নিগ্ধ হাস্য-শ্রী তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলকে ও আয়ত রক্তাভ চক্ষু দুইটিকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিবামাত্রই ভিতরকার স্নেহময় মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না।

হাসি বলিল, কোথায় এসে উঠেছেন আপনি? আজ আপনাকে ছাড়ছি না, এখানে খেয়ে যেতে হবে।

মৃন্ময়ও বলিল, আপনি কলকাতায় কবে এসেছেন? কিচ্ছু জানি না তো?

হাসি বলিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মুকুজ্জেমশাই আর একটু হাসিয়া বলিলেন, এসেছি তিন-চার দিন হ'ল। শিরীষের ছেলের অসুখের খবর পেয়ে এসেছিলাম। ছেলেটি এই কিছুক্ষণ হ'ল মারা গেছে। শিরীষ বেচারা পড়েছে মুশকিলে। তাকে তো এখানে এখনও বিশেষ কেউ চেনে না, সে এই অল্প কদিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। সৎকার করবার লোক জুটছে না, তাই আমাকে বেরুতে হ'ল। তোমাদের দু ভায়ের মধ্যে একজনকে যেতে হয়। একজন বাড়িতে থাক,

পাগলীটা আবার না হ'লে ভয় পাবে। চিনি তো ওকে, ভয়ানক ভীতু।—বলিয়া মুকুজ্জেমশাই হাসির দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

হাসি এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনিতেছিল। হঠাৎ ভীতু-অপবাদে মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল এবং বলিল, এক্ষুনি যেতে হবে? তা হ'লে রুটি কটা তাড়াতাড়ি তৈরি ক'রে দিই।

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি এখনও?

ঠাকুরপোর খাওয়া হয়ে গেছে, উনি এতক্ষণ কাজ করছিলেন।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চিনুই চলুক, একজন হ'লেই হবে, তিন জন পেয়েছি, তা ছাড়া আমি আছি, পাড়া থেকেও দু-একজন হয়তো জুটতে পারে।

মৃন্ময় বলিল, আপনি যাবেন? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় আপনার?

মৃন্ময়ের চিন্তার কারণ ছিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের অঙ্গে একটি সুতির বোম্বাই চাদর ভিন্ন আর কোন আবরণ ছিল না, খালি পা। চিরকালই তাঁহার এই বেশ। মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার? আমার কিচ্ছু হবে না।

হাসি পাকা গিন্নীর মত পুনরায় মন্তব্য করিল, ওঁর ওই রকমই কাণ্ড।

মৃন্ময় বলিল, তার চেয়ে বরং আপনি হাসিকে আগলান, ঠিকানাটা ব'লে দিন, আমি আর চিনু যাই।

না না, সেটা ঠিক হয় না। চিনুকে ডাক তুমি, আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

অগত্যা চিনুকে ডাকিতে হইল। ডাকাডাকিতে চিনু ঘর হইতে নামিয়া আসিল। ঘুম-ভাঙা চোখে মিটিমিটি মুকুজ্জেমশাইয়ের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিবামাত্র সহাস্যমুখে আসিয়া পদধূলি লইল। এই বাড়িতে হাসি ছাড়া চিনুও মুকুজ্জেমশাইয়ের অতিশয় প্রিয়। চিন্ময়ের চেহারা মৃন্ময়ের অনুরূপ, কেবল তাহার বয়স কম ও মাথার চুল কটা নয়—কালো। সমস্ত শুনিয়া চিন্ময় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মুকুজ্জেমশাইয়ের সাহচর্যে এই

শীতের রাত্রে মড়া পোড়াইতে যাইতে হইবে! সে যেন স্বর্গ পাইয়া গেল তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া নিজের র‍্যাপারখানা লইয়া আসিল।

চিন্ময়কে লইয়া মুকুজ্জেমশাই চলিয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে হাসি মৃন্ময়কে বলিল, ওগো, তুমি আর একটু স'রে এস, আমার ভারি ভয় করছে।

মৃন্ময় চোখ তুলিয়া একটু হাসিল।

না, তুমি স'রে এস, লক্ষ্মীটি, মড়ার কথা শুনলে আমার বড্ড ভয় করে।

আর একটু হাসিয়া মৃন্ময় হাসির নিকটে গিয়া বসিল। হাসি রুটি সেঁকিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

১০

নির্জন দ্বিপ্রহর।

নিজের শয়নকক্ষে ঘন নীলরঙের একটি সুন্দর আলোয়ানে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি গদি-আঁটা আরাম-চেয়ারে বসিয়া মিষ্টিদিদি একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বাড়িতে কেহ নাই। সোনা তাহার এক বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে। মিষ্টিদিদি তন্ময়চিত্তে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছিলেন—গ্রাস করিতেছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পিছনের জানালা দিয়া একফালি রোদ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ও বাম গণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছে। বাম কর্ণের সোনার দুলটা রৌদ্রকিরণে চকমক করিতেছে। মিষ্টিদিদির চক্ষু দুইটিও চকমক করিতেছে, অধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত। উপন্যাসে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, যাহা মুখরোচক এবং উত্তেজনাপূর্ণ। মিষ্টিদিদির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মিষ্টিদিদি ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিলেন। বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, ছাদের ও-ধারে আলিসার উপর একজোড়া পারাবত আসিয়া বসিয়াছে। পুরুষ পারাবতটি গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্‌বকম্‌-ধ্বনিতে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাহার স্ফীয়মান কণ্ঠদেশে

সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া ময়ূরকণ্ঠের শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রতি গ্রীবাভঙ্গীতে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মিষ্টিদিদি আবার পুস্তকে মন দিলেন।

এমন সময় নীচে ফোন বাজিয়া উঠিল। 'বয়' আসিয়া খবর দিল যে, সাহেব তাঁহাকে ফোনে ডাকিতেছেন। মিষ্টিদিদি নামিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন। মিত্র সাহেব ফোনে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ফিরিতে অনেক রাত হইবে। বৈকালেও তিনি আসিতে পারিবেন না, কলেজে একটা মীটিং আছে এবং তৎপরে তাঁহাকে এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার খাইতে যাইতে হইবে। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন, পারাবত-দম্পতি উড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘরের কোণে তেপায়ায় রক্ষিত ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটি সবল নগ্ন পুরুষ একটা বিকটকায় অজগরকে বিধ্বস্ত করিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত পেশী শক্তির উন্মাদনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদি কিছুক্ষণ প্রতিমূর্তিটির পানে তাকাইয়া উঠিয়া বিছানায় গেলেন ও সবলে পাশ-বালিশটাকে আঁকড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

১১

শঙ্কর সুরমার পত্রখানি আবার পড়িতেছিল। এখানি সুরমার দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া আর একখানি পত্র লিখিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে জিনিসটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত এ রকম হয় না। কিন্তু অসাধারণ ব্যাপারও পৃথিবীতে অসম্ভব নহে। সুরমাও সাধারণ শ্রেণীভুক্তা নহে। সুতরাং সুরমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন একটু-আধটু খটকাজনক ঘটনা ঘটিবেই। সাহিত্য-প্রীতিরূপ দুষ্টবায়ু যাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে, তাঁহার চাল-চলন আচার-ব্যবহার সাধারণ আইন-কানুন মানিয়া চলিবে না, ইহাই স্বাভাবিক—তা তিনি নারীই হউন আর পুরুষই হউন।

শঙ্করের দ্বিপ্রহরে দুই পিরিয়ড ছুটি আছে, কলেজ-স্কোয়ারের নির্জন

কোণটুকুও তার সুন্দর লাগতেছে। সুরমার পত্রখান হাতপূর্বে সে বহুবার পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে। সুরমা যাহা লিখিয়াছে, তাহার অর্থবোধ করা খুব কঠিন নহে। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছে, পত্রখানিতে অর্থাতীত এমন কিছু আছে, যাহা একবার দুইবার পড়িয়াই নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায় না, বারম্বার পড়িতে হয়। এক স্থানে সুরমা লিখিয়াছে—

"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত অল্প, অথচ আপনার চিঠি না পেয়ে এত খারাপ লাগছে! এর থেকে কি প্রমাণ হয় বলুন তো? হয়তো কিছুই প্রমাণ হয় না, কিংবা হয়তো এর থেকেই কোন নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদ্ বড় কিছু একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারেন। সে যাই হোক, এ কথা কিন্তু অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, আপনার চিঠি না পেয়ে ভারি খারাপ লাগছে। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবশ্য তত ঘনিষ্ঠ নয় যে, অভিমান আবদার করা চলে; তাই আপনাকে শুধু অনুরোধ করছি, চিঠির উত্তর দেবেন এবার নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য স্বল্প। কিন্তু স্বল্প পরিচয়েই আপনার বিশিষ্ট রূপটি দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে যেন। আজকালকার দিনে বেশ তাজা জীবন্ত মানুষ কমই চোখে পড়ে। জীবন্ত মানুষ মানে—বাঘ-ভালুকের মত বন্য পশু নয়, জীবন্ত মানুষ মানে—যে মানুষ সভ্যতার অতিবর্ষণে গলিত হয়ে যায় নি, সভ্যতার রসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশংসা করছি ব'লে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠবেন না। আপনার সম্বন্ধে সত্যি যা মনে হয়েছে, তাই লিখলাম। আপনাকে আর একটা কথা বলব? রাখবেন কথাটা? আপনার যে কবিতাগুলো দেখিয়েছিলেন, সেগুলো ছাপিয়ে ফেলুন। সত্যিই ওগুলো ছাপাবার যোগ্য। আমাকে দিন বরং, আমি ছাপিয়ে দিই। এমন সুন্দর ক'রে ছাপিয়ে দেব, দেখবেন তখন। আর নতুন কিছু লিখেছেন নাকি? লিখলে আমাকে পাঠাতে হবে কিন্তু। আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? কবিতা লিখে আগে আমাকে দেখাতে হবে। আমাকে প্রথমে দেখিয়ে তবে অপরকে দেখাতে পারবেন। আমি হতে চাই আপনার কবিতার প্রথম পাঠিকা। কাল এখানে সমুদ্রের ধারে ব'সে ব'সে আপনার "কলকল্লোল" কবিতাটার লাইনগুলো মনে

পড়ছিল। কবিতাটা টুকে পাঠিয়ে দেবেন? সত্যি বলছি, ভারি সুন্দর কবিতাটি।”

এই কথাগুলি বারম্বার পড়িয়াও শঙ্করের তৃপ্তি হইতেছিল না। কয়েকবার পড়িয়া শঙ্কর পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিল ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গতকল্য যে চিঠিখানা সে সুরমাকে লিখিয়াছে, তাহাতে ও-কথাটা সে না লিখিলেই পারিত। নানা কাজের ভিড়ে সুরমার কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেইজন্য পত্র দিতে পারে নাই, এই সত্যভাষণটুকু সে না করিলেই পারিত। আর তা ছাড়া, সত্যই তো সে বিস্মৃত হয় নাই। সে সুরমাকে পত্র লেখে নাই সঙ্কোচভরে, পাছে কেহ কিছু মনে করে। সহজ সত্য কথাটা লিখিলেই চুকিয়া যাইত। অনর্থক একজন ভদ্রমহিলার মনে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কি করিয়া পরবর্তী পত্রে এই গ্লানিটুকু মুছিয়া ফেলা যায়, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল, ও-ধারের গেট দিয়া রিনি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গে আর একটি তরুণী। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই শঙ্কর নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশ্ন করিল, কোথায় চলেছেন?

রিনি সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দিল, পুরনো বইয়ের দোকানগুলো ঘুরব একটু।

চলুন, আমিও যাই, আমারও বই কেনার দরকার আছে কয়েকটা।

ইহা শুনিয়া অপর মহিলাটি বলিলেন, তবে আমাকে এইবার ছুটি দে রিনি, সঙ্গী তো একজন পেয়েই গেলি, তা ছাড়া অপূর্ববাবুও তো আসবেনই—বোধ হয় এসেছেন এতক্ষণ।

রিনি তথাপি বলিল, না, তবু তুমি চল বেলাদি।

নামটা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যে তাহাকে নমস্কার করিল এবং বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম অপূর্ববাবুর কাছে, আজ দেখাটা হয়ে গেল।

বেলাদিদি একবার চকিতে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্করকে প্রতি-নমস্কার করিলেন ও বলিলেন, আপনার পরিচয়টি দিন তা হ'লে।

রিনি বলিল, উনি শঙ্করবাবু, সেই যে মিষ্টিদিদি সেদিন তোমায় বলছিলেন। উৎপলবাবুর বন্ধু উনি।

ও আপনিই শঙ্করবাবু? বেলাদিদি স্মিতমুখে শঙ্করের পানে চাহিলেন ও দন্ত দ্বারা অধরোষ্ঠ ঈষৎ দংশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, আপনি নাকি খুব বড় কবি? অপূর্ববাবু বলছিলেন।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, লিখি বটে মাঝে মাঝে, তবে সে এমন কিছু নয়।

তিনজনে গল্প করিতে করিতে কলেজ স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার রিনিকে প্রশ্ন করিল, পুরনো বইয়ের দোকানে কি বই কিনবেন আপনি?

বেলাদিদি অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া বঙ্কিম চাহনিতে রিনির পানে একবার চাহিলেন ও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

রিনি সঙ্কুচিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, কিছু ঠিক করি নি এখনও। পুরনো বই আমার খুব ভাল লাগে। নতুন বই কেনার চেয়ে পুরনো বই কিনতে আমার বেশি ইচ্ছে করে।

বেলাদিদি এই উক্তিতে সহাস্য ওষ্ঠভঙ্গী করিলেন ও বলিলেন, সবাই কবি।

শঙ্কর বলিল, আপনিও নন কি?

আমি?—বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে প্রশ্ন করিলেন।

নিশ্চয়। কবি না হ'লে ব্লাউজের রঙের সঙ্গে শাড়ির রঙের এমন সামঞ্জস্য করতে পারতেন? অমন সুন্দর নাগরা জোড়া, অমন সুন্দর দুল দুটি পছন্দ করা আপনার পক্ষে সম্ভবই হ'ত না—যদি আপনি কবি না হতেন। কবি সবাই—কেউ কবিতা লেখে, কেউ লেখে না।

মোটেই না—ওসব বাজে কথা।

বেলাদিদি হাসিতে হাসিতে সজোরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

বেলাদিদি আবার অধর দংশন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, আপনি শুধু কবিই নন দেখছি, আরও অনেক গুণ আছে আপনার।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়। আমি নির্গুণ ব্রহ্ম নই—এ কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটি ছদ্ম কোপে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

তাঁহারা কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুরাতন পুস্তকের দোকানগুলির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বেলাদিদি ও শঙ্করই এতক্ষণ কথাবার্তা বলিতেছিল। রিনি চুপ করিয়া ছিল, সে এবার কথা কহিল, অপূর্ববাবু এসেছেন দেখছি—ভোলেন নি।

ভুলবে? বলিস কি?—বলিয়া বেলাদিদি চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শঙ্কর তাঁহার সে চাহনি দেখিতে পাইল না, কারণ সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপূর্ববাবুকেই দেখিতেছিল। দিবালোকে লোকটাকে আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। নাকের কাছে খানিকটা পাউডার লাগিয়া রহিয়াছে, লম্বা কোঁচাটা খর্বাকৃতির সহিত মোটেই খাপ খায় নাই, পাঞ্জাবিটাও হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবির রঙও অদ্ভুত। এ রকম অদ্ভুত পাঞ্জাবি পরে নাকি পুরুষমানুষে! আশ্চর্য মেয়েলী রুচি লোকটার! লাজুক চক্ষু দুইটি তুলিয়া বিনয়-নম্র মিহি কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনি এলেন কোথা থেকে?

প্রতিনমস্কার করিয়া শঙ্কর বলিল, কলেজে পড়ি, সুতরাং কলেজ স্ট্রীটে আমার আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়; কিন্তু আপনি তো ক্লাইভ স্ট্রীটের লোক, আপনাকেই কলেজ স্ট্রীটে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অত্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, তা বটে, মিস মিত্রের সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা ছিল, তাই, মানে, ঘণ্টাখানেক ছুটি নিয়ে—আমাদের বড়বাবুরও আবার, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু কথা আর শেষ করিতে পারিলেন না, নতচক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একটি এসেন্স-সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে চকিত দৃষ্টিতে একবার বেলাদিদির পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনিও এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আপনাকেও এ সময় এ স্থানে দেখব প্রত্যাশা করি নি।

অপ্রত্যাশিত জিনিস তো অহরহই ঘটবে—কি বলেন শঙ্করবাবু?

বেলাদিদি শঙ্করের দিকে চাহিতেই শঙ্কর বলিল, নিশ্চয়।

মোড়ের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, তা হ'লে চলুন, বইগুলো দেখা যাক। আসুন।

একটা দোকানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িল।

অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর শেলির কাব্যগ্রন্থাবলী এক খণ্ড রিনির পছন্দ হইল—বেশ সুন্দর দামী সংস্করণ। অপূর্ববাবু তাহার দাম দিলেন ও পুস্তকটি হস্তে লইয়া তিনি বলিলেন, পরশু ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি। কিছু লিখে দিতে চাই, অর্থাৎ—। বলিয়া একটু অপ্রস্তুত মুখে থামিয়া গেলেন।

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বেলাদিদির পানে চাহিতেই তিনি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন, পরশু রিনির জন্মদিন। অপূর্ববাবু রিনিকে একটা উপহার দেবেন। সাধারণত লোকে নিজেই কিনে নিয়ে যায় ওসব জিনিস, কিন্তু অপূর্ববাবুর সব বিষয়েই একটু বিশেষত্ব আছে তো—উনি রিনিকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে তবে কিনবেন।—বলিয়া বেলাদিদি তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধর দংশন করিয়া অপূর্ববাবুর প্রতি একটা ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ওমা, ঠিক এই এডিশনের একটা কীট্‌স্‌ও রয়েছে যে!

রিনি একটা বুক-শেল্‌ফের কোণ হইতে কীট্‌স্‌কে টানিয়া বাহির করিল। শুধু বাহির করিল নয়, লুব্ধভাবে তাহার পাতাগুলি উলটাইতে লাগিল। অপূর্ববাবু একটা ঢোক গিলিয়া শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গম্ভীরভাবে বেলাদিদি বলিলেন, ওটাও নেওয়া উচিত। ওটাও কিনে নিন অপূর্ববাবু।

বেশ তো, বেশ তো।

অপূর্ববাবু কিন্তু মনে মনে ঘামিতে লাগিলেন। তাঁহার কাছে আর পয়সা ছিল না।

এটাও নিই তা হ'লে?—ঘাড় ফিরাইয়া রিনি স্মিতহাস্যে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল।

বেশ তো, বেশ তো। আমি নিয়ে যাব ওটা পাঁচটার পর এসে, মানে,

এখন আমার কাছে দামটা ঠিক নেই—মানে দশ টাকার নোট আনতে ভুলে একটা পাঁচ টাকার নোট—মানে, তাড়াতাড়িতে—

অপূর্ববাবু অকারণে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া সেই দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কাছে টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটা দশ টাকার নোট বাহির করিল ও অপূর্ববাবুকে বলিল, এই যে, নিন না, আমার কাছে আছে।

বেলাদিদির চক্ষু দুইটিতে দুষ্টামির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রিনি একটু কুণ্ঠিত সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন, থাক্, আর দরকার নেই তা হ'লে।

আমার দরকার আছে।

শঙ্কর বইখানি কিনিয়া লইল। অপূর্ববাবুর মুখ-চোখের ভাব এমন করুণ হইয়া উঠিল, যেন কেহ তাঁহার গালে চড় মারিয়া তাঁহার মুখের গ্রাসটি কাড়িয়া লইয়াছে।

বেলাদিদি হাসিয়া বলিলেন, এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না শঙ্করবাবু, অপূর্ববাবুকে ওটা কিনতে দেওয়া উচিত আপনার।

হাঁা, অপূর্ববাবুর জন্যেই তো কিনলাম ওটা। এখন টাকা নেই ওঁর কাছে—বইটা যদি বিক্রি হয়ে যায় আবার! এই নিন।—শঙ্কর বইখানি অপূর্ববাবুকেই দিল।

ধন্যবাদ। দামটা, নিতে হবে কিন্তু।

বেশ, দেবেন।

শঙ্কর নূতন পুস্তকের খোঁজে একটা শেল্‌ফের পিছনের দিকে গেল। দেখিল যে, পিছনের দিকে একই সংস্করণের বায়রন ও বার্ন্‌স্‌ও রহিয়াছে। সে দুইটিও কিনিয়া লইল। তাহার পর একটু ভাবিয়া পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া অপর সকলের অগোচরে বহি দুইখানিতে কি যেন লিখিল। তাহার পর বই দুইটি বগল-দাবা করিয়া সে বলিল, এইবার যাওয়া যাক তা হ'লে? মিস মিত্র কি কলেজে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ।

আর আপনি?—বেলাদিদিকে সে প্রশ্ন করিল।

আমিও ওই দিকেই যাব। অপূর্ববাবু তো আপিসে যাবেন?

হ্যাঁ, আমাকে আপিসে ফিরতে হবে।

চারিজনে বাহির হইয়া ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন।

অপূর্ববাবুর ট্রাম আসিতে তিনি সবিনয় নমস্কারাদি শেষ করিয়া ট্রাম ধরিয়া আপিসে চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, চলুন না, হাঁটাই যাক একটু।

তিনজনে হাঁটিতে শুরু করিল।

বেলাদিদি বলিলেন, আপনি কি বই কিনলেন, দেখি!

দেখাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

অনুরোধটা সামান্যও বলতে পারেন, অসামান্যও বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে আজ আমার প্রথম আলাপ, আজই আপনাকে একটা কিছু উপহার দেওয়া স্পর্ধার মত দেখাবে; কিন্তু আজকের এই প্রথম আলাপটাকে স্মরণীয় ক'রে রাখতে ইচ্ছে করছে। রাগ করবেন?

না, রাগ করব কেন?

তা হ'লে এইটে নিন।

বায়রনের কাব্য-গ্রন্থাবলীটি শঙ্কর তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিল।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া মলাটটি খুলিয়া পড়িলেন, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—Please accept Byron—Shankar. তাহার পর চক্ষু তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, I accept. Thanks.

তারপর রিনির হাতে বান্‌সখানি দিয়া শঙ্কর বলিল, আপনার জন্মদিনের নেমন্তন্ন আমিও পেয়েছি মিস মিত্র। যাব ঠিক, কিন্তু একটা উপহার বগলে ক'রে যেতে আমার লজ্জা করবে। ও-জিনিসটা ভারি ভাল্‌গার ঠেকে আমার কাছে; তাই ব্যাপারটা এখনই সেরে দিলাম। আপনি যে এত কবিতা ভালবাসেন, তা তো জানা ছিল না আমার। আমার ধারণা ছিল, সোনাদিদিই বুঝি কবিতা-পাগল।

এই শুনিয়া বেলাদিদি বলিলেন, সোনাদি কবি দেখলে কবিতা-পাগল হন, শিল্পী দেখলে ছবি-পাগল হন, বৈজ্ঞানিক দেখলে বিজ্ঞান-পাগল হন।

রিনি কিছু বলিল না। লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বেলাদিদি রিনির হাত হইতে বার্ন্‌স্‌খানি লইয়া বলিলেন, দেখি, তোর বইটাতে কি কবিত্ব করলেন উনি!

তার আগে, দাঁড়ান, আমি যাই।—বলিয়া শঙ্কর আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

বেলাদি খুলিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—It Burns—Shankar.

রিনিও দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, মাটির সহিত মিলাইয়া যাইতে।

বেলাদিদি অধর দংশন করিয়া ধাবমান ট্রামটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

১২

করালীচরণ বক্‌সি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া কোষ্ঠী-গণনা করিতেছিলেন। সম্মুখে প্রসারিত একটি কাগজের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন। কাগজটিতে রাশিচক্রের ছক টোকা। তাহার পাশেই শালপাতার ঠোঙায় কিছু তেলে-ভাজা ফুলুরি পড়িয়া রহিয়াছে। বক্‌সি মহাশয়ের কিন্তু ফুলুরির দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি রাশিচক্রটির দিকেই নিবদ্ধদৃষ্টি। বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত সিগারেট রহিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনেকটা পূর্ববৎ—মদের বোতল এবং ফাটা গেলাস ঠিকই আছে, বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতিও জ্বলিতেছে, আলমারির কপাট দুইটি তেমনই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে আলমারির অধিকাংশ বইই তক্তাপোশের উপর স্তূপীকৃত। ঘরটাতে পুরাতন পুস্তকের গন্ধে, ধুলার গন্ধে, সিগারেটের গন্ধে ও মদের গন্ধে একটা গন্ধ-বৈচিত্র্য হইয়াছে। নূতন আসবাবের মধ্যে একটা নূতন সচিত্র ক্যালেণ্ডার টেবিলের সম্মুখে ঝুলিতেছে। ছবিটি সুন্দর। একটি নয়-দশ বৎসরের সুন্দরী বালিকা

কয়েকটি ধপধপে সাদা খরগোশকে কপিপাতা খাওয়াইতেছে। এমন সুন্দর ছবিখানি কিন্তু সুন্দরভাবে টাঙানো নাই, বাঁকাভাবে কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। একটি সুদীর্ঘ টান মারিয়া বক্‌সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন এবং একটি পঞ্জিকা খুলিয়া তাহা হইতে কি সব টুকিয়া লইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বক্‌সি মহাশয় যে ঘরটিতে বসিয়া ছিলেন, সেই ঘর হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। দ্বারটি আলমারির পাশে কোণের দিকে বলিয়া সহসা চোখে পড়ে না। সেই দ্বারপ্রান্তে স্বল্পালোকে একটি ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিল।

করালীচরণ কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়াই বলিলেন, মোস্তাক, তুমি উঠে এলে কেন?

ছায়ামূর্তি ইহার কোন উত্তর দিল না, বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র। অগ্রসর হইয়া আসাতে তাহার গায়ে আলো পড়িল: আলোকপাত হইলে দেখা গেল, মোস্তাক লোকটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু উলঙ্গ। গায়ে বহুরকম তালি দেওয়া শতছিন্ন একটি কোট রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। মুখময় গোঁফ-দাড়ি, ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি আরক্ত। একটু ঝুঁকিয়া সে হস্তস্থিত একটি অর্ধদগ্ধ বিড়িকে লক্ষ্য করিয়াই আপন মনে কি যেন বকিয়া চলিয়াছিল।

বাই নারায়ণ, মোস্তাক্, তুমি উঠে এলে কেন?

করালীচরণের এক চক্ষু মোস্তাকের মুখে নিবদ্ধ হইবামাত্র মোস্তাক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল ও তৎক্ষণাৎ মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইয়া স্যালিউট করিল। তাহার পর বিড়িটি দেখাইয়া বলিল, জুত পাচ্ছি না।

করালীচরণ বলিলেন, জুত পাবে কি ক'রে, ও যে নিবে গেছে। স'রে এস, ধরিয়ে দিই।

মোস্তাক আবার মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল এবং বিড়িটা মুখে দিয়া মুণ্ডটা আগাইয়া আনিল। বিড়িটি গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে দেখিয়া বক্‌সি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ও ধরাতে গেলে গোঁফ-

দাড়িতে আগুন লেগে যাবে। ওটা ফেলে দাও, এই নাও, একটা সিগারেট নাও। মোস্তাক অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল।

বাই নারায়ণ, দাও তা হ'লে। ভোগালে দেখছি!

বিড়িটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই-কাঠিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াও বক্সি মহাশয় যখন দেখিলেন, সেটি ধরিতেছে না, তখন তিনি মোস্তাককে বলিলেন, দেখছ তো?

মোস্তাক অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেখিতেছিল।

বলিল, খাসা আগুন।

আগুন তো খাসা, বিড়ি ধরছে কই?

মোস্তাকও সঙ্গে সঙ্গে একমত হইয়া কহিল, জুত হচ্ছে না।

মোস্তাকের হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বক্সি মহাশয় তখন এঁটো বিড়িটাই মুখে লইয়া টান দিয়া ধরাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এই নাও, এইবার শোওগে যাও। কম্বলটা কোথায়?

মোস্তাক জ্বলন্ত বিড়িটা লইয়া স্যালিউট করিয়া আলমারির পাশের সেই দরজাটা দিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। কম্বল সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর দিল না।

বাই নারায়ণ!

বক্সি মহাশয় আবার একটি সিগারেট ধরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোষ্ঠী-গণনায় মনোনিবেশ করিলেন। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি রাশিচক্রসমন্বিত কাগজখানা হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

তাহার পর সিগারেটটা ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন। মদ্যপান করিতে করিতে সহসা করালীচরণ নিজের দক্ষিণ হস্তটি আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন তাঁহার হস্তরেখাগুলির উপর সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া উঠিল। চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল।

আসতে পারি দাদা ?

করালীচরণ চমকাইয়া উঠিলেন, প্রসারিত হাতটা উলটাইয়া এমন ভাবে বদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিলেন, যেন দ্বারে কোন শত্রু হানা দিয়াছে। এক নিশ্বাসে মদটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কে ?

আমি প্যান্ট্রো খুজ্ বুজ্।

ও, ভন্টুবাবু! আপনি ? আসুন আসুন।

বক্সি মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ভন্টুর সহিত প্রোটোটাইপও আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আসিয়াই ভক্তিভরে বক্সি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। ভন্টুর আগে হইতেই শেখানো ছিল।

বক্সি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, ইনি কে ?

ভন্টু বলিল, ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মণবাবু, সেই যাঁর ছক সেদিন—

বুঝেছি। বসুন আপনারা।

বক্সি মহাশয় সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন ও বোতল হইতে পুনরায় গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু অতিশয় ভয়ে ভয়ে এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে উপবেশন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন কোন রহস্যময় মন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভন্টুও লক্ষ্মণবাবুর পাশে বসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন একটা ইশারা করিল, ভাবটা—লক্ষ্মণবাবু যেন ব্যস্ত হইয়া কোন কথা এখন না বলে। এ ইশারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লক্ষ্মণবাবু এমনিই নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

করালীচরণ নিঃশেষিতপ্রায় মোমবাতিটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। ভন্টু একবার সশব্দে গলা-খাঁকারি দিল। এই শব্দে বক্সি মহাশয় ভন্টুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, সর্দি হয়েছে নাকি ? এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছেনও তো!

ভন্টু বলিল, লক্ষ্মণবাবু নাছোড়; তা ছাড়া আপনার এখানে আসার কোন উপলক্ষ্যই তো আমি ছাড়ি না, জানেন।

করালীচরণ মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ওঁদের দুজনেরই রাশিচক্র মিলিয়ে দেখলাম, মিল হয় নি—অসম্ভব।

লক্ষ্মণবাবুর মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভন্টু বলিল, গভীর গাড্ডায় ফেললেন দেখছি।

করালীচরণ আর একটি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, গাড্ডা আবার কি? মনের মিল যখন হয়েছে, তখন সেইটেই আসল মিল। লাগান আপনি, কুষ্ঠির মিল নাই বা হ'ল।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বক্সি মহাশয় হাসিতে লাগিলেন।

লাগিয়ে দিন।

ভন্টু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, পারবেন?

লক্ষ্মণবাবু বিমর্ষভাবে একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না।

ভন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, গভীর গাড্ডা, বুঝেছি।

করালীচরণ আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, আলো কিন্তু আর বেশিক্ষণ টিকবে না। ভন্টুবাবু, ওই বইগুলোর ওদিকে আর একটা মোমবাতি আছে, দেখুন তো, এটা তো গেল।

ভন্টু মোমবাতির সন্ধান করিতে করিতে বলিল, এত বই সব বার করেছেন কেন?

নানারকমে বেয়ে-চেয়ে দেখছিলাম—কুষ্ঠি দুখানা যদি মেলাতে পারি, দেখলাম—ও অসম্ভব।

ভন্টু মোমবাতি লইয়া নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিতে ধরাইয়া সেটি যথাস্থানে স্থাপন করিল। লক্ষ্মণবাবু নীরবে বসিয়া ছিল। তাহার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে চাহিয়া করালীচরণ বলিলেন, দেখুন, জ্যোতিষ চর্চা করি বটে, কিন্তু এটা আমি আপনাকে বলছি, মনের মিলই হ'ল শ্রেষ্ঠ মিল। সেদিকে যদি আপনার কোন গলদ না থাকে, লাগিয়ে দিন দুর্গা ব'লে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল। লক্ষ্মণবাবু উঠিয়া পড়িল।

অনেক রাত হয়ে গেল, এবার আমি উঠি। ভন্টুবাবু, আপনি যদি বসতে চান তো-বসুন, আমার জানেন তো—

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ, আপনি যান, কাল আপনার ওখানে যাব। আপনি ঘাবড়ে যাবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বক্সি মহাশয়ের পদধূলি লইয়া লক্ষ্মণবাবু বিদায় হইল।

লক্ষ্মণবাবু চলিয়া গেলে ভন্টু জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম বুঝলেন?

বোঝাবুঝি আর কি আছে এতে? ও-মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহ জ্যোতিষ-মতে অসিদ্ধ। তা ছাড়া ও-মেয়ের কপালে দুঃখ আছে—মানে, একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসতে হবে ওকে। শুধু আসতে হবে নয়, অনেক দুঃখভোগও করতে হবে। একাধিক পুরুষের সংস্রবে এলে তাকে দুঃখভোগ করতে হবে বইকি।

ভন্টু একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভীমজাল তা হ'লে বলুন! প্রোটোটাইপ অতি নিরীহ লোক। মেয়েটি দেখতে ভাল, গান-টান গায় শুনেছি, লেখাপড়াও কিছু জানে। গোবেচারী প্রোটোটাইপ একেবারে লদ্‌কে গেছে।

করালীচরণ কর্কশকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর বলিলেন, শুক্রের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

ভন্টু বলিল, এ যে সঙিন শুক্র দেখছি! বেচারী প্রোটোটাইপের মুণ্ডুটি একেবারে হাড়কাঠে গলিয়ে দিয়েছে।

করালীচরণ শালপাতার ঠোঙা হইতে একটা ফুলুরি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বিয়ের কথাবার্তা কি অগ্রসর হয়েছে?

পাগল! বাপ অরিজিনাল ব'সে আছে—খুন ক'রে ফেলবে তা হ'লে। ছোকরা গোপনে প্রেমে পড়েছে। ওর নিজের কুষ্ঠিতে খুব বিশ্বাস, মেয়েটিরও নাকি খুব বিশ্বাস। মেয়েটিই নাকি নিজের কুষ্ঠির ছক প্রোটোটাইপকে দিয়েছে। বলেছে যে, কুষ্ঠীর মিল যদি হয়, তা হ'লে সে তার দাদাকে বলবে, যেন ওরিজিনালের কাছে কথাটা পাড়ে।

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, প্রণয়-ব্যাপারে এমন হিসেব ক'রে চলার কথা আগে কখনও শুনি নি।

ভন্টু বলিল, প্রোটোটাইপের কাণ্ডকারখানাই ক্রগিশ।

করালীচরণ সহসা কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর আবার একটা ফুলুরি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভন্টুবাবু, শ পাঁচেক টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করতে পারি বলুন তো?

কেন, এত টাকার কি দরকার এখন?

দ্রাবিড় যাব।

দ্রাবিড়?

হঁ্যা?

কেন?

শুনেছি, দ্রাবিড়ে একজন জ্যোতিষী আছেন, তিনি হস্তরেখা দেখে জন্ম-সময় নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁর কাছে গিয়ে এ বিদ্যেটা আমি আয়ত্ত করতে চাই। যেমন ক'রে হোক—

হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন?

বাই নারায়ণ, খেয়াল বলছেন একে? তুনিয়ার লোকের কুষ্ঠি গুনছি, ভবিষ্যৎ বলছি, অথচ নিজের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার নিজের জন্ম-সময়, এমন কি জন্ম-তারিখটা পর্যন্ত আমার জানা নেই। হস্তরেখা থেকে যদি জন্ম-সময়ের নির্ণয় করতে পারি, তা হ'লে নিজের কুষ্ঠিটা একবার দেখি ভাল ক'রে।

আর একটি ফুলুরি তিনি মুখের মধ্যে দিলেন।

ভন্টু নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আপনি নিজে যা রোজকার করেন, তার থেকেই তো অনায়াসে পাঁচ শো টাকা জ'মে যেতে পারে, অবশ্য যদি একটু বুঝে-সুঝে খরচপত্র করেন।

করালীচরণ ভন্টুর তুইটি হাত ধরিয়া সাগ্রহে বলিলেন, দিন না আপনি জমিয়ে। আমার যা কিছু উপার্জন সব আমি আপনার হাতে দেব, আপনি যা আমাকে খরচের জন্যে দেবেন, তাতেই আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকলে আমি খরচ না ক'রে পারব না। নেবেন ভার?

এক চক্ষু ভন্টুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ একদৃষ্টে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

ভন্টু কহিল, এ আর অসম্ভব কি? আপনি যা দেবেন, একটা পাস-বুক ক'রে পোস্ট-আপিসে রেখে দিলেই ঢুকে যায়।

কিন্তু আপনার নামে। আমি নিজেকে একটুও বিশ্বাস করি না, বাই ন্যারায়ণ!

ভন্টু হাসিয়া বলিল, বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি?

তা হ'লে আসুন, আজ থেকেই শুরু করুন।

করালীচরণ একটা পাঁজির ভিতর হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন ও বলিলেন, এই এখন আমার যথাসর্বস্ব। কিছু মাল আর সিগারেট কিনে দিয়ে বাকিটা আপনি নিয়ে যান।

বেশ, কাল নিয়ে যাব এসে।

না না না—এখুনি নিয়ে যান আপনি, নিয়ে পালান।

করালীচরণের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বেশ, দিন।

ভন্টু নোট দুইটি লইয়া পকেটে পুরিল।

আলমারির কোণের দ্বারপ্রান্তে আবার সেই ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল ও বিড়বিড় করিয়া বকিতে শুরু করিল।

ভন্টু চমকাইয়া উঠিল।

আর কেউ ঘরে আছে নাকি?

করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, ও মোস্তাক।

মোস্তাক! মোস্তাক কে?

ও আমার একজন বন্ধু, মাঝে মাঝে আসে। মোস্তাক, এদিকে এস।

মোস্তাক অগ্রসর হইয়া আসিল ও আসিয়াই মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। এই উলঙ্গ মূর্তি দেখিয়া ভন্টু তো বিস্ময়ে নির্বাক।

বক্সি মহাশয় বলিলেন, উঠে এলে কেন মোস্তাক, বিড়ি আবার নিবে গেছে নাকি?

ভুত হচ্ছে না।

দাও, আবার ধরিয়ে দিই। কই বিড়ি?

মোস্তাক কিছুক্ষণ বক্সি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, হোথা চ'লে গেছে।

তা হ'লে একটা সিগারেট নাও।

সিগারেট খাইতে মোস্তাকের ঘোর আপত্তি, সে ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। তাহার পর বলিল, ছবি দেখতে এলাম।

ছবি? ও, তুমি একটা ছবি এনেছ বটে—ভুলেই গেছি। এই নাও, দেখ।

বক্সি মহাশয় উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিলেন। মোস্তাক টেবিলের উপর ছবিখানি প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটিতে শিশুসুলভ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চাহিয়া থাকিয়া মোস্তাক বালিকাটির মুখের উপর ময়লা আঙুলটা রাখিয়া বলিল, এ কে?

ও খুকী।

এগুলো কি?

খরগোশ।

এগুলো কি?

কপিপাতা, খরগোশরা খাচ্ছে।

খুকী—খরগোশ—খাচ্ছে—সব 'খ'।

মোস্তাক এমন একটা মুখভাব করিয়া করালীচরণের দিকে তাকাইল, যেন সে ছবির মধ্যে 'খ'-এর প্রাধান্য আবিষ্কার করিয়া একটা মস্ত কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে।

করালীচরণ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বাঃ, ঠিক বলেছ! যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—যাও। ছবিটা নিয়েই যাও।

সুন্দর ছবিখানা মুড়িয়া মোস্তাক সেটাকে বগল-দাবা করিল, আবার স্যালিউট করিল এবং ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর গিয়া

সে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্যালিউট করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

বাই নারায়ণ, কি কেন?

খুকী আর খরগোশ একসঙ্গে কেন?

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, প্রাক্‌টিস করছে। খুকী যখন বড় হবে, খরগোশগুলোও বড় হবে। বড় হ'লে খরগোশগুলোর চেহারা কিন্তু মানুষের মত হয়ে যাবে। মানুষ-খরগোশকে যাতে তখন ভাল ক'রে পোষ মানাতে পারে, তারই রিহার্সাল দিচ্ছে আর কি!

এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্যালিউট করিয়া মোস্তাক চলিয়া গেল। করালীচরণ হাসিয়া বলিলেন, কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় ও!

ভন্‌টু বলিল, এ কে বক্‌সি মশায়?

বললাম তো, আমার একজন বন্ধু। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিল ও, তার পর মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে চ'লে যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, কলকাতার রাস্তায় এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম, পাগল হয়ে যাওয়াতে ওর চাকরি যায়। আত্মীয়স্বজনরা কে কোথায় আছেন, আছেন কি না, ভগবান জানেন। আমি রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে আসি, মাঝে মাঝে নিজেও আসে ও। আজ বিকেলে হঠাৎ ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানা নিয়ে এসে হাজির। বদ্ধ পাগল।

বক্‌সি মহাশয় আবার খানিকটা মদ গ্লাসে ঢালিলেন ও বোতলটা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ভন্‌টুবাবু, রাত হয়ে গেলে মাল পাবেন না, আমার এদিকে ফুরিয়েছে।

ভন্‌টু পশ্চাৎ হইতে ওষ্ঠভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও তৎপরে সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলিল, এই যে যাই।

ভন্‌টু বাহির হইয়া বাইকে সওয়ার হইল।

লক্ষ্মণবাবু বাইকটি নিখুঁতভাবে সারাইয়া দিয়াছিল।

শঙ্কর একমনে আপনার ঘরে বসিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছিল। এত একাগ্রচিত্তে সে তাহার নিজের পাঠ্য-পুস্তকও কোনদিন পাঠ করে নাই। সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, মডার্ন ইয়োরোপ তাহার পাঠ্যতালিকা-অন্তর্ভুক্ত নহে। আগামী কল্য ফিজিক্স্ প্র্যাক্টিকাল ক্লাস আরম্ভ হইবে, অধ্যাপক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনাও করিয়া আসিতে বলিয়াছেন। শঙ্করের সেদিকে কিন্তু খেয়াল নাই। মডার্ন ইয়োরোপের এই বইখানা সম্ভব হইলে আজ রাত্রের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিতে হইবে। জ্ঞানপিপাসা নয়, রিনিকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে। রিনিকে দেখাইতে হইবে যে, অপূর্বকৃষ্ণ পালিতই যে কেবল ইতিহাসে কৃতবিদ্য তাহা নয়, শঙ্করও ইতিহাসের কিছু কিছু জানে—যদিও সে বিজ্ঞানের ছাত্র। গতকল্য রিনির জন্মতিথি-উৎসবে সে গিয়াছিল। মিষ্টিদিদি ও সোনাদিদি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, রিনির পড়াশোনায় সাহায্য করিতে পারে এমন একটি ভাল ছেলে যদি শঙ্কর যোগাড় করিয়া দেয়, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। প্রফেসার মিত্র নিজের পড়াশোনা লইয়া এত তন্ময় থাকেন যে, এসব দিকে—বস্তুত সংসারের কোন দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নাই।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আর কারও সঙ্গে তো আমার তেমন আলাপ নেই, আমাকে দিয়ে যদি চলে, বলুন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত মিষ্টিদিদি বলিয়াছিলেন, ও মা, তা হ'লে তো সবচেয়ে ভাল হয়। পারবেন আপনি?

পারতে পারি।

সোনাদিদি সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে ও একবার মিষ্টিদিদির দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, একেই বলে—ভাল ছেলে। সায়েন্স্ কোর্সের স্টুডেন্ট্ আর্ট কোর্সের মেয়েকে পড়াবার ভার নিতে চায়! উঃ, আপনাদের মাথার ভেতরটাতে কি আছে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি বলছি।

উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছিল, চেষ্টা করলে সব জিনিসই সবাই করতে পারে।

আপনি কিংবা মিষ্টিদিদি যদি চেষ্টা করেন, মিস মিত্রকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। মিষ্টিদিদি তো পারেনই—বি. এ. পাস করেছেন উনি।

মিষ্টিদিদি হাস্যতরল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, রক্ষে করুন, আবার ওই সব! ওসব আপনাদের মত ভাল ছেলেদেরই পোষায়। সেদিন রিনি কি একটা আমাকে জিনিস জিজ্ঞেস করেছিল রোমান হিস্ট্রির, কিছুতে মনে এল না ছাই! ভাগ্যে অপূর্ববাবু ছিলেন, তিনি শেষকালে আমায় উদ্ধার করেন।

অপূর্ববাবু আসেন নাকি রোজ?

এ প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উত্তরে সোনাদিদি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। মিষ্টিদিদিও রহস্যময় হাস্য করিয়া বলিয়াছেন, হ্যাঁ, অপূর্ববাবু আসেন প্রায়ই। তাঁকে বললে তিনি অবশ্য রিনিকে পড়াতে রাজী হয়ে যাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়। তিনি বেলাকে সন্ধ্যেবেলা গান শেখান, আরও এক জায়গায় কোথাও পড়ান নাকি।

গম্ভীর মুখ করিয়া সোনাদিদি বলিয়াছেন, না, সেটা ঠিক হয় না।

শঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে, সে রিনিকে পড়াইবে। সেই দিনই রিনিদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া শঙ্কর প্রফেসার গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সাহিত্যরসিক বলিয়া প্রফেসার গুপ্ত শঙ্করের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেজ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শঙ্করের লেখা 'ট্র্যাজেডি ও কমেডি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি নিজেই আসিয়া প্রবন্ধের লেখক শঙ্করসেবক রায়ের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই আলাপের পর হইতে শঙ্করও দুই-একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছে। প্রফেসার গুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া সুখ হয়। লোকটি মার্জিতরুচি ও বিদ্বান। শুধু বিলাত নয়, ইয়োরোপের অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি; কিন্তু আলাপ করিলে মনে হয়, ঠিক যেন সমবয়সী। শঙ্করের সহিত বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। শঙ্কর রিনিদের বাড়ি হইতে সোজা প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়া ইতিহাসের এই বইখানি আউট-বুক হিসাবে পড়িবে বলিয়া চাহিয়া

আনিয়াছে এবং তাহাই এখন তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। বি. এ. কোর্সের ইতিহাসের বইগুলি তাহাকে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইংরেজীটা তাহার মোটামুটি জানাই আছে। সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, কিন্তু তাহার জন্ত তাহাকে বেশি পরিশ্রম করিতে হইবে না। সংস্কৃতে সে খুব ভাল ছেলে ছিল। ফিলজফি? ফিলজফিতে রিনিকে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে না। যদিই বা হয়, তাহা আয়ত্ত করাও শঙ্করের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পড়িতেছে। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অবনতমুখী রিনি বসিয়া রহিয়াছে। সেই লাজনম্রা স্বল্পভাষিণী শ্রীমণ্ডিতা তন্বীকে শুনাইয়া শুনাইয়া তন্ময় শঙ্কর পড়িয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কঠিন নাম ও তারিখগুলা সঙ্গীতের মত মনে হইতেছে।

হঠাৎ শঙ্করের তপোভঙ্গ হইল।

নীচে কে তাহাকে ডাকিতেছে!

চাকরটা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল যে, ভন্টুবাবু তাহার সহিত দেখা করিতে চান, নীচে কমন-রুমে বসিয়া আছেন।

শঙ্কর নামিয়া গেল। কমন-রুমে আর কেহ ছিল না, ভন্টু একাই বসিয়া ছিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি রে, এমন সময় হঠাৎ?

ভীমরুল এবং গভীর গাড্ডা টু দি পাওয়ার থ্রী। মেজকাকা আবার সরেছে, বউদিদির খুব জ্বর, ট্যাক গড়ের মাঠ।

শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শঙ্করের বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া ওষ্ঠ-বিকৃতি করিয়া ভন্টু বলিল, অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন গাড়োল? যা হবার হবে। এক কাপ চা খাওয়া তো আগে।

শঙ্কর চাকরকে ডাকিয়া দোকান হইতে চা আনাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে ভন্টু বলিল, কানা করালীর কাছে যাবি?

কানা করালী কে?

সেই জ্যোতিষী, সেই যে তোর কুষ্ঠি দেখেছিল একদিন, এত ভুলিস তুই!

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।

চল্ না, যাই সেখানে। তোর কুষ্ঠিটা গোনাবি বলেছিলি তো একদিন।

শঙ্করের তখন যাহা মনের অবস্থা, তাহাতে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে হিস্ট্রির পড়া করিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, এখন যাওয়া অসম্ভব।

ভন্টু চাটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, আজ কনসেশন ডে ছিল, সস্তায় হ'ত। আজ বুধবার তো?

কনসেশন ডে মানে?

মানে বুধবার দিন তার হাফ ফী। অন্য দিন দশ টাকা নেয়, আজ পাঁচ টাকা।

তাই নাকি? বেশ তো পাঁচটা টাকা দিচ্ছি তোকে, তুই গুনিয়ে নিয়ে আয়—সব ঠিক ঠিক ব'লে দেবে তো?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভন্টু বলিল, ব'লে দেবে মানে? এ রকম নির্ভুল গণনা আর কোথাও পাবি না। করালী একেবারে চাম ল—দ্।

তুই তা হ'লে গুনিয়ে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি তোকে।

শঙ্কর উপরে চলিয়া গেল ও পাঁচটা টাকা আনিয়া ভন্টুকে দিল। টাকা আনিল অবশ্য সে ধার করিয়া। তাহার নিজের কাছে কিছুই ছিল না। রিনির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনখানা দামী বই কিনিয়া তাহার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ হইয়াছে। টাকা দিয়া সে ভন্টুকে বলিল, নটা তো বাজে; এত রাত্রে তুই বাড়ি না গিয়ে জ্যোতিষীর ওখানে যাবি? বউদির জ্বর বলছিলি!

ভন্টু টাকা কয়টি ভিতর দিককার পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, জ্বর তো বটেই—আমি আর বাড়ি ব'সে থেকে তার কি করব? যা করবার তা তো ক'রেই এসেছি। করালীর সঙ্গে একটু লদ্কালদ্কি ক'রে আবার ফিরব এখুনি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, মেজকাকা সরেছে কবে?

কাল সন্ধ্যে থেকে না-পাত্তা।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ভন্টু বলিল, একটা দেশলাই আন্ দেখি, বাইকের আলোটা জ্বালতে হবে।

শঙ্কর পাশের ঘর হইতে দিয়াশলাই আনিয়া দিল ও ভন্টুকে আগাইয়া দিবার জন্য তাহার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিল। ভন্টুর বাইকটি গেটের কাছেই ঠেসানো ছিল। ভন্টু পকেট হইতে একটি সরু মোমবাতি ও একটি কাগজের ঠোঙা বাহির করিল, তাহার পর বাতিটি জ্বালাইয়া ঠোঙার ভিতর স্থাপন করিয়া শঙ্করকে বলিল, ধর্ দিকি, আমি বাইকে চড়ি, তার পর আমার হাতে দিস।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, তোর ল্যাম্প কি হ'ল ?

ভন্টু হাস্যদীপ্ত চক্ষে উত্তর দিল, খুজ্‌বুজ্‌।

খুজ্‌বুজ্‌ মানে ?

মানে—বিক্রমপুর, এবং তস্য মানে—বেচে ফেলেছি। সংসার চালাতে হবে তো!

ভন্টু বাইকে সওয়ার হইল।

ভন্টুকে বিদায় দিয়া শঙ্কর আবার আসিয়া পড়িতে বসিল।

রাত্রি অনেক।

হস্টেলের সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়াছে। ষোল নম্বর ঘরের রামকিশোরবাবু খড়ম খটখট করিতে করিতে বাথ-রুমের দিকে চলিয়াছেন। শঙ্কর নিজের ঘরে বসিয়া তাঁহার গলার-সাঁকি-বাহির-করা মূর্তি কল্পনা-নেত্রে দেখিতেছিল। হাত-কাটা ফতুয়া পরা, কানে পৈতা জড়ানো। রামকিশোরবাবু তিনবার বি. এ. ফেল করিয়া চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রামকিশোরবাবুর খড়মের শব্দ পাইয়া শঙ্কর বুঝিল, এখনই আলো নিবিয়া যাইবে, কারণ আলো নিবিবার ঠিক দশ মিনিট পূর্বে রামকিশোরবাবু খড়ম পরিয়া বাথ-রুম অভিমুখে যান ও ফিরিয়া আসিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করেন—ইহা তাঁহার বাঁধা নিয়ম। রামকিশোরবাবু ফিরিয়া আসিলেন ও

বিধিমত হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলেন। তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে নিজের ঘর হইতে বাহির হইল ও এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কপাটে তালা লাগাইতে লাগিল। ভন্টুর সহিত দেখা হইবার পর কিছুক্ষণ সে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল এবং পুস্তকটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়াও ফেলিয়াছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আর সে পড়িতে পারিল না। যে কারণে সে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই তাহাকে এখন ইতিহাস পড়া স্থগিত রাখিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল, ভন্টু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া গণনা ও ফলাফল তাহাকে জানাইয়া যাইবে। কিন্তু ভন্টু তো কই আসিল না! এগারোটা প্রায় বাজে। ভন্টু তাহার সম্বন্ধে কি তথ্য আবিষ্কার করিল জানিবার জন্য তাহার মনটা ছটফট করিতেছিল; ইতিহাস পড়ায় মন বসিতেছিল না। এতক্ষণ সে রামকিশোরবাবুর শয়নের প্রতীক্ষায় ছিল। রামকিশোরবাবু এই ব্লকের প্রবীণতম ছাত্র এবং 'মনিটার'। অনেক যোগাড়যন্ত্র করিয়া শঙ্কর একটি সিংগ্‌ল্‌-সিটেড রুম লইয়াছে, সুতরাং বাহিরে যাইতে হইলে তালা লাগাইয়া যাইতে হইবে। এ সময় শঙ্করের ঘরে তালা লাগানো থাকিলে তাহা রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি এড়াইবে না। এ সকল বিষয়ে রামকিশোরবাবুর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি এবং তাঁহার এই শ্যেনদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া নববিবাহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় (জনশ্রুতি, তিনি রামকিশোর-বাবুর সহপাঠী ছিলেন) যখন তখন কলিকাতাস্থ শ্বশুরালয়ে রাত্রি যাপন করিবার সুবিধা পান এবং রামকিশোরবাবুর রিপোর্টকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রামকিশোরকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

ঘরে তালা লাগাইতে লাগাইতেই আলো নিবিয়া গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। নীচে গিয়া দারোয়ানকে চুপিচুপি কি বলিল। দরোয়ান প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়া অবশেষে শঙ্করের পীড়াপীড়িতে রাজী হইল এবং গেট খুলিয়া দিতে দিতে নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, শঙ্করবাবুর কথা অমান্য করিতে পারে না বলিয়া এই অন্যায় কার্যটি সে করিতেছে; কিন্তু এ 'বাত' প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার 'নোক্‌রি' থাকিবে না। শঙ্কর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ভন্টুর সহিত আজ রাত্রে তাহার দেখা করিতেই হইবে। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং হাঁটিয়াই সে চলিল। একা অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে শঙ্কর কখন যে একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। যদিও অন্যমনস্কভাবে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ভুল গলিতে সে ঢোকে নাই। এই গলিটা দিয়া গেলেই সোজা সে বেলেঘাটার মোড়ে গিয়া হাজির হইতে পারিবে। অন্যমনস্কভাবে সে চলিতেছিল, সজ্ঞানভাবে পথের সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তাহার সমস্ত অন্তর একাগ্রভাবে যাহার দিকে উন্মুখ হইয়া ছিল, সে রিনি। লজ্জিতা রিনি, কুণ্ঠিতা রিনি, স্বল্পভাষিণী রিনি, কাব্যানুরাগিণী রিনি, আয়তনয়না রিনি, ঈষৎ-হাস্য-স্নিগ্ধা রিনি, বিরক্ত রিনি, বিপন্ন রিনি—রিনির নানা মূর্তি তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। আনাগোনার আর বিরাম নাই। অপলকদৃষ্টিতে শঙ্কর রিনির সঞ্চরমাণ নানা মূর্তির দিকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার দেখারও আর বিরাম নাই, সে আর কিছু দেখিতেছে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে রিনিকেই দেখিতেছে, ভাবিতেছে, মনে মনে স্পর্শ করিতেছে। তাহারই জন্য ইতিহাস অধ্যয়ন, তাহারই জন্য সমস্ত সত্তা উন্মুখ, তাহারই জন্য সে টাকা ধার করিয়া ভন্টুকে দিয়াছে এবং তাহার মনের গোপন বাসনাটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কোষ্ঠীগণনায় কিছুমাত্র আভাসিত হইয়াছে কি না—তাহাই অবিলম্বে জানিবার জন্য এত রাত্রে হাঁটিয়া সে চলিয়াছে। অথচ এই কয়েক দিন পূর্বেও সে রিনির কথা একবার ভাবে নাই। দেখা হইলে সহজ শিষ্টতাসঙ্গত আলাপ-পরিচয় করিয়াছে, নমস্কারের পরিবর্তে প্রতিনমস্কার করিয়াছে। সহসা এ কি হইয়া গেল? অকারণে সহসা যেমন আকাশের একটা কালো মেঘ সূর্যকিরণ-রঞ্জিত হইয়া মহিমময় হইয়া উঠে, বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সহসা যেমন বিরাট অগ্নিকাণ্ডের গরিমায় শিখায়িত হইয়া উঠে, শঙ্কর তেমনই সহসা রিনির প্রেমে পড়িয়া আশা-আশঙ্কা তীব্র-মধুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া পথ চলিতেছিল।

সহসা তাহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

একটা খামের চিঠি সজোরে আসিয়া তাহার গায়ে লাগিল। রঙিন

খামের চিঠি। গলির স্বল্পালোকে সে পড়িয়া দেখিল, উপরে লেখা রহিয়াছে—স্বর্ণলতা দেবী। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল, একটি খোলা জানালা। জানালার ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেদিনকার সেই লোকটি অর্থাৎ ভনুটু যাহাকে মোমবাতি বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিল, সে এবং একটি কিশোরী কথাবার্তা বলিতেছে। টেবিলে রক্তজবার মত একটা আলো। শঙ্কর সবিস্ময়ে পত্রখানা লইয়া ভাবিতেছিল, কি করা উচিত, পত্রখানা সে মৃন্ময়বাবুকে দিয়া যাইবে কি না! ওই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথেই যে পত্রখানা আসিয়াছিল, তাহাতে শঙ্করের সন্দেহ ছিল না। কে এই স্বর্ণলতা!

হঠাৎ শঙ্করের কানে গেল, সেই কিশোরীটি বলিতেছে, ওটা কি ফেলে দিলে?

মৃন্ময় বলিল, ও একখানা বাজে কাগজ। তোমার রান্না হয়ে গেছে?

ওমা, রান্না তো ভারি! সব শেষ হয়ে গেছে কখন! তোমার রুটির নেচিগুলো করা আছে, এখনও বেলা সেঁকা হয় নি। ঠাকুরপো কখন খেয়ে নিয়েছে।

শঙ্করের মনে হইল, মৃন্ময় একটু যেন রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ ঘরে এলে কেন?

ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, একটা মজার জিনিস দেখাতে এলুম, চুপিচুপি এস এ ঘরে। বেড়াল-ছানাটা গোল হয়ে ফুলে তোমার বিছানার এক ধারে কেমন চোখটি বুজে ব'সে আছে, বেচারীর শীত করছে বোধ হয়। তোমার মলিদার গলাবন্ধটা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। ছুষ্টু ছুষ্টু মুখটি বেরিয়ে আছে খালি। দেখবে এস না, কেমন মজার দেখতে হয়েছে!

শঙ্কর আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পত্রখানি পকেটে পুরিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল। নিজের তাগিদ ছিলই, তাহা ছাড়া এমনভাবে লুকাইয়া আড়ি-পাতাটা তাহার ভদ্র অন্তঃকরণে ভাল লাগিতেছিল না। পরে চিঠিখানা মৃন্ময়বাবুকে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। নানা কথা ভাবিতে

ভাবিতে শঙ্কর ভন্টুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতা শহর ক্রমশ নীরব হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রিক্শর টুং টুং শব্দ, দুই-একটা ইতস্তত-অপেক্ষমাণ ফেটিন-গাড়ির গাড়োয়ানের আহ্বান অথবা ধাবমান মোটরের আকস্মিক আবির্ভাব ছাড়া চতুর্দিক ঘুমন্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটা পানের দোকানে কদাচিৎ দুই-একজন পুরুষ অথবা নারী দেখা যাইতেছে। কোন বৃহৎ অট্টালিকার গাড়িবারান্দার নীচের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। এই শীতে রাস্তার ফুটপাথের উপর ঘুমন্ত দরিদ্র নর-নারী স্থানে স্থানে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় নানা জিনিস দেখিতে দেখিতে শঙ্কর অবশেষে ভন্টুর বাসায় পৌঁছিল। পৌঁছিয়া দেখিল, গভীর নীরবতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। ওদিককার একটা ঘরে যেন একটি আলো জ্বলিতেছে।

ভন্টু, ভন্টু!—শঙ্কর ডাকিতে লাগিল।

অনেক ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শন্টু—ভন্টুর ভাইপো—মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি শঙ্কর। ভন্টু কোথায়?

কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি।

ইহার পর শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শন্টুই আবার বলিল, এখুনি ফিরবেন বোধ হয়। আপনি একটু বসবেন?

বেশ, চল।

বসিবার মত বাহিরে কোন পৃথক ঘর ছিল না। শঙ্করকে একেবারে অন্তঃপুরেই যাইতে হইল। গিয়াই তাহার বউদিদির সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি শঙ্করের সাড়া পাইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছেন। জ্বর হওয়াতে মুখখানি থমথম করিতেছে। কিন্তু তাঁহার ঢলঢলে কালো মুখখানি শঙ্করকে দেখিয়া হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেঘলা দিনে যেন সহসা এক ঝলক রৌদ্র দেখা দিল। তাম্বুলরঞ্জিত শুষ্ক অধর দুইটি সহসা যেন সজীবতা প্রাপ্ত হইল। শঙ্কর দেখিল, বউদিদির কালো ডাগর চক্ষু দুইটি জ্বরের উত্তাপে আরও যেন আবেশময় হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর একদৃষ্টে তাঁহার

দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া গায়ের ছিন্ন র‍্যাপারটি সর্বাঙ্গে জড়াইতে জড়াইতে বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, দেখছ কি শঙ্কর-ঠাকুরপো? এত রাত্রে হঠাৎ এলে যে?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শঙ্কর বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ।

ভন্‌টু এখনও ফেরে নি?

ওষুধ আনছি ব'লে সেই যে সন্ধ্যে থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। চেনই তো তাকে, একবার কোথাও বসলে আর ওঠবার নামটি করবে না।

শঙ্কর মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ভন্‌টু তো তাহারই জন্য জ্যোতিষীর বাড়ি গিয়াছে। কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, আপনার ওষুধ-বিষুধের কোন ব্যবস্থা না ক'রেই বেরিয়েছে সে? আশ্চর্য তো!

বউদিদি বলিলেন, সন্ধ্যের সময় পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। একটু হাসিয়া বলিলেন, খুব ভাব করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনিই এসে একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিয়েছেন, তাই আনতেই তো বেরুল। কোথাও আটকে গেছে বোধ হয়। কিংবা, কি জানি—

বউদিদির মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়াপাত হইল।

মা, খিদে পেয়েছে।

শন্‌টুর ভাই নন্‌টু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। দিগম্বর মূর্তি, বয়স বছর পাঁচেক হইবে। সে শঙ্করকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এই স্বল্পপরিচিত লোকটির সমক্ষে ক্ষুধার জন্য মাকে বিব্রত করা যে অশোভন হইবে, তাহা সে যেন অনুভব করিল। মায়ের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বাঁ হাতে চোখ কচলাইতে কচলাইতে আড়চোখে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে সে চাহিতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, তুমি একটু ব'স শঙ্কর-ঠাকুরপো, আমি এটাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। চল্, খাবি চল্।

শিশুকে লইয়া বউদিদি ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন।

শঙ্কর শুনিতে পাইল, শিশু বলিতেছে—সাবু খাব না।

লক্ষ্মী সোনা আমার, কাল সকালে কেমন বেগুনভাজা দিয়ে ভাত ক'রে দেব, কেমন? এখন এইটুকু খেয়ে শুয়ে পড় তো ধন,—নন্টুবাবু ভারি লক্ষ্মীছেলে, খেয়ে ফেলো তো বাবা চোঁ-চোঁ ক'রে।

এত মিনতি সত্ত্বেও কিন্তু সাবু খাইতে সে সহসা রাজী হইল না। বায়না করিতে লাগিল। বউদিদিরও ধৈর্য অসীম, অনেক কষ্টে তাহাকে ভুলাইয়া সাবুটুকু খাওয়াইলেন ও বিছানায় শোয়াইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে শঙ্করের সহিত গল্প করিতে বসিলেন, এমন সময় ফন্তি উঠিয়া আসিল ও মায়ের কানে ফিসফিস করিয়া বলিল যে, তাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। শঙ্করকাকার সম্মুখে ক্ষুধার কথাটা চেঁচাইয়া বলিতে তাহার লজ্জা হইল। হাজার হোক, সে একটু বড় হইয়াছে তো!

বউদিদি বলিলেন, ওই যে কড়াতে ঢাকা দেওয়া আছে, একটু ঢেলে নিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়্ না মা, আমি শঙ্করকাকার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ফন্তি ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল, একটু দুধ মিশিয়ে নেব মা?

দুধ আবার কেন ফন্তু! একটুখানি দুধ আছে, বাবা আবার এখুনি হয়তো চা চাইবেন।

ভিতর হইতে আর কোন উত্তর আসিল না।

শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না—এদের সবারই জ্বর নাকি, সব সাবু খেতে দিচ্ছেন যে?

বউদিদির মুখে যেন মেঘ নামিয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। সহাস্যমুখে তিনি বলিলেন, জ্বর না হ'লেও গা-ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে সবগুলোরই; তা ছাড়া নিজে জ্বরে মরছি, এদের জন্যে আর ভাতের হাঙ্গাম করি নি রাত্তিরে। বাবাকে অবশ্য খানকতক লুচি ক'রে দিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। আমাদের জন্যে আর কিছু করি নি এ বেলা।—বলিয়া বউদিদি হাসিয়া গায়ের কাপড়টা আর একটু জড়াইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিলেন।

* * *

শীত করছে বউদি? আমার গায়ের কাপড়টা নেবেন?

না না, থাক্—এতেই আমার বেশ গরম হচ্ছে।

পাশের ঘরে খুটখাট করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

বউদিদি বলিলেন, বাবা উঠেছেন।

পর-মুহূর্তেই দরাজকণ্ঠে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, বউমা, ভন্‌টু এসেছে নাকি?

বউদিদি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। একটু পরেই সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ বলিতেছেন, কে—শঙ্কর এসেছে নাকি? এত রাত্তিরে হঠাৎ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো? জিজ্ঞেস কর সেটা। এখানেই ডেকে আন না, এই শীতে বাইরে কেন?

বউদিদি বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই শঙ্কর ভিতরে গেল। গিয়া দেখিল, ভন্‌টুর বাবা কলিকায় ফুঁ দিতেছেন। গায়ে একটি দামী সাদা সোয়েটার। কলিকার আগুনের আভায় তাঁহার গৌরবর্ণ মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শঙ্কর প্রবেশ করিতেই বলিলেন, এস এস, এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? বাইরেই বা ব'সে কেন, যা ঠাণ্ডাটা পড়েছে!

ভন্‌টুর কাছে দরকার ছিল একটু।—বলিয়া শঙ্কর নিকটস্থ টুলটিতে বসিল। বউদিদি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া শঙ্করের উক্তি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। ভন্‌টুর বাবা কালা। খুব চিৎকার করিয়া কথা না বলিলে তিনি শুনিতেই পান না। কানের খুব কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলে অবশ্য শুনিতে পান। সাধারণত ভন্‌টুর বউদিদিই সকলের কথা তাঁহাকে এইভাবে শুনাইয়া থাকেন।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, ভন্‌টু এখনও ফেরে নি বুঝি? কটা বাজে?—এই বলিয়া বৃদ্ধ বালিশের নীচে হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন ও দেওয়ালের ব্র্যাকেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, রাত তো খুব বেশি হয় নি, দশটা বাজে মোটে, এইবার ফেরবার সময় হয়েছে ভন্‌টুর।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। সে-ই তো হস্টেল হইতে বাহির হইয়াছে এগারটার পর। সে বলিতে যাইতেছিল যে, ঘড়িটা বোধ হয় স্লো আছে—বউদিদি চোখ টিপিয়া নিষেধ করিলেন।

বৃদ্ধ কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তো ? না এসে থাক তো বউমা খানকয়েক লুচি ভেজে দিক।

আমি খেয়ে এসেছি।

বউদিদির মারফৎ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, চা একটু হোক তা হ'লে। চায়ের তো আর সময়-অসময় নেই, কি বল বউমা ? আমাকেও একটু দিও।

পুরু লেন্সের চশমায় আলো বিকীরণ করিয়া তিনি বউমার দিকে চাহিতেই বউদিদি বলিলেন, হ্যাঁ, দিচ্ছি ক'রে।

বউদিদি একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শঙ্কর বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, ইহাদের সংসারে নানাবিধ অভাব সত্ত্বেও বৃদ্ধের কোনরূপ অসচ্ছলতা নাই। তাঁহার পরিষ্কার বিছানাপত্র, নেটের ফরসা মশারি, সারি সারি কলিকা, দামী গড়গড়া, দামী চটিজুতা, আলনায় পরিষ্কার কাপড়-জামা, চকচকে গাড়ুর উপর পাট-করা লাল গামছাখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন ধনী বৃদ্ধ দুই-চারি দিনের জন্য আসিয়া এই দরিদ্র পরিবারে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার ঘরের বাহিরেই যে দৈন্য নানা মূর্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছে, তাহার লেশমাত্র আভাসটুকুও এ ঘরের মধ্যে নাই।

বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া শঙ্করকে বলিলেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, নানা দিক থেকে চিঠিপত্র লিখে উত্যক্ত ক'রে তুলেছে আমাকে।—বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু বুজিয়া আবার তাম্রকূটে মন দিলেন। একটু পরেই আবার চোখ খুলিয়া বলিলেন, ভন্টুর বিয়ের কথা গো। তোমরা দেখে শুনে একটা ঠিক ক'রে ফেল। বয়সও তো হয়েছে। আজকালই সব ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বিয়ে হয়, আমাদের কালে—। বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিয়া পুনরায় বলিলেন, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ষোল বছর আর ভন্টুর গর্ভধারিণীর বয়স তখন আট কি নয়। আমার পিতার বিবাহ হয় আরও সকাল সকাল—বারো বছর বয়সে।। পুনরায় তামাকে মন দিলেন।

বাহিরে ভন্টুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

বউদি! বউদি! শন্টু!

শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে যাইবার জন্য দাঁড়াইতেই ভন্টুর বাবা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, যাচ্ছ কোথা, ব'স। এইখানেই বউমা চা আনবে এখন।

শঙ্কর বলিল, ভন্টু এসেছে।

অ্যাঁ, কি বললে?

শঙ্কর তখন তাঁহার কাছে গিয়া একটু চিৎকার করিয়াই তাহার কথার পুনরুক্তি করিল এবং বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই শুনিতে পাইল, বউদিদি বলিতেছেন—ছি ছি, এত রাত্তির করে মানুষে! তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ছেলেমেয়েগুলো ঘুমিয়ে পড়ল, উনুনের আঁচ গেল। শঙ্কর-ঠাকুরপো এসেছে, ব'সে আছে বাবার ঘরে। এই যে—

শঙ্কর ও ভন্টু মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইল ও নিমেষের জন্য নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। নিমেষের জন্য।

তাহার পর ভন্টু বলিল, কি রে, তুই হঠাৎ?

জানতে এলাম।

জানতে এলি? আচ্ছা উন্মাদ তো তুই! আয়, বাইকটা ধ'রে তুলি দুজনে।

বউদিদি বলিলেন, তা হ'লে তোমরা এস তাড়াতাড়ি, চায়ের জল হয়ে গেছে।

শঙ্কর বলিল, স্টোভের আওয়াজ পেলাম না, চায়ের জল করলেন কি ক'রে?

বউদিদি বলিলেন, উনুনে আঁচ ছিল।

বউদিদি এই বলিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন। ভন্টু ও বউদিদির ভাষাময় একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়াছিল। বলিল, ব্যাপার কি?

ওসব মেয়েলী ব্যাপারে তোর ঢোকবার দরকার কি? আয়, বাইকটা তুলি।

শঙ্কর ও ভন্‌টু বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া শঙ্কর দেখিল, বাইকটি বারান্দার নীচে ঠেসানো রহিয়াছে। অন্ধকারেই শঙ্কর দেখিতে পাইল যে, বাইকের পশ্চাতে ও সম্মুখে নানারূপ জিনিস বাঁধা ও ঝুলানো রহিয়াছে।

থাম্‌, মোমবাতিটা জ্বালি।

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই শঙ্করের চোখে পড়িল, সেই কাগজের ঠোঙাটা বারান্দায় নামানো রহিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে ক্ষুদ্র মোমবাতিটি বাহির করিতে করিতে ভন্‌টু বলিল, উঃ, রাস্তায় এতগুলো জিনিস নিয়ে যেন সার্কাস করতে করতে এসেছি!

জিনিসপত্র সমেত বাইকটা দুইজনে ধরিয়া উপরে তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ভন্‌টু বাইকটাকে ঠেলিয়া ভিতরে আনিতে আনিতে নিম্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিল, সব হদিস পেয়েছি তোর।

কি হদিস?

পরে সব বলব। এখানে সে সব কথা বলার সুবিধে হবে না।

দুই পেয়ালা চা লইয়া বউদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন ও ভন্‌টুর কথার শেষার্ধ শুনিয়া বলিলেন, কি সুবিধে হবে না? নাও, চা নাও। কি সুবিধে হবে না?

ভন্‌টু গম্ভীর মুখে বলিল, শঙ্করের সব ক্রগিশ অ্যাফেয়ার, ঢুকো না ওতে।

বউদিদি হাস্যদীপ্ত চক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন ও আর এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ভন্‌টু প্রশ্ন করিল, আবার কার চা?

বাবার।

চা লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

ভন্‌টু মুখ সূচালো করিয়া তাহার স্থূল শরীরের উপরার্ধ নাচাইতে নাচাইতে বলিতে লাগিল, বা কুর কুর কুর কুর—

শঙ্করের চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। ভন্‌টু তাহার কি হদিস পাইয়া

আসিয়াছে, না শোনা পর্যন্ত তাহার আর স্বস্তি ছিল না। ভন্‌টুকে সে বলিল, চল্‌, বাইরে যাই।

থাম্‌, জিনিসপত্রগুলো বিড্‌ডিকারের জিম্মায় দিয়ে দিই আগে। বিড্‌ডিকার মানে বউদিদি। চা দিয়া বউদিদি বাহির হইয়া আসিলেন। ভন্‌টু উঠিয়া বাইক হইতে খুলিয়া খুলিয়া জিনিসগুলি তাঁহাকে দিতে লাগিল। ভন্‌টু জিনিস আনিয়াছিল কম নয়—চাল, ডাল, মসলা, শিশিতে করিয়া তেল, কিছু কমলালেবু, এক শিশি ঔষধ ও সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি টুকিটাকি নানারকম জিনিস। সব নামাইয়া দিয়া ভন্‌টু বলিল, তুমি এবার শুয়ে পড় বউদি। এই নাও, তোমার জন্যে কমলালেবু এনেছি, শুয়ে শুয়ে ধ্বংস করগে যাও। চারটি ভাতে-ভাত আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি।

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, ও বাহাদুরি আর ক'রে কাজ নেই। হাত-পা পুড়িয়ে সে বারের মত শেষে এক কাণ্ড ক'রে ব'স আর কি!

ভন্‌টু মুখ-বিকৃতি করিয়া তাঁহাকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বউদিদি হাসিতে হাসিতে জিনিসপত্র তুলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, বউদি, আপনার জ্বর এখন কত?

আছে বোধ হয় একটু—সামান্যই হবে।

ভন্‌টু ভিতরে গিয়া একটা থার্মোমিটার লইয়া আসিয়া বলিল, এটা বাগিয়েছি আজ ধীরেনবাবুর কাছে। লাগাও তো দেখি।

বউদিদি প্রথমে রাজী হইলেন না, অনেক বলা-কহার পর হইলেন। থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর ১০২ ডিগ্রী। শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল। এত জ্বর লইয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে রহিয়াছেন তো! বলিল, আপনি শুয়ে পড়ুন।

ভন্‌টু গম্ভীরভাবে বলিল, কেন ইউস্‌লেস অ্যাফেয়ারে ঢুকছিস? চল্‌, বাইরে যাই। বিড্‌ডিকার is as obstinate as a mule.

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েছ তোমরা! অত জ্বর আমার নেই, ও-থার্মোমিটার তোমাদের ভুল। ভাঙা থার্মোমিটার ব'লেই ধীরেন ডাক্তার দিয়ে দিয়েছে।

এতদুত্তরে ভন্‌টু মুখ বিকৃত করিয়া একবার তাঁহাকে ভ্যাঙাইল ও শঙ্করকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে ভয়ানক শীত। শঙ্কর প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কি হ'ল কুষ্ঠির ?

অনেক প্যাঁচ তোর ; করালী বললে—একদিনে হবে না।

প্যাঁচ ? কি প্যাঁচ ?

সঙিন প্যাঁচ এবং রঙিন প্যাঁচ। এর বেশি করালী আর কিছু বললে না। সব খুলে বলবে বলেছে আর একদিন। তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব সেদিন।

শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্‌টুর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর কিছু বললে না ?

না। উঃ, কি শীত রে ! চল্, ভেতরে চল্।

আসিতে আসিতে শঙ্কর বলিল, কোনও খবর পেলি মেজকাকার ?

কিচ্ছু না। ঘড়েল বাবাজী কোনও খবর রেখে যায় নি।

শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, করালী লোকটা রিলায়েব্‌ল্ তো ?

ভন্‌টু দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বিস্তার করিয়া সংক্ষেপে বলিল, গোদা চাম।

ভন্‌টু গমনোদ্যত হইলে শঙ্কর বলিল, দাঁড়া, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুই এত রাত্রে বাজার ক'রে নিয়ে এলি মানে ? ছেলেগুলো সব সাবু খাচ্ছে—

ভন্‌টু দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিয়া বলিল, নো মানি। দাদা টাকার অভাবে প'ড়ে পুরী থেকে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তাঁকে টি. এম. ও. করতে গিয়ে অন্ন-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ-গোছ হয়ে দাঁড়াল। কি করব বল্ ? উপায় কি ? অনেক কষ্টে ধারধোর ক'রে যোগাড় করলাম কিছু টাকা। সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, মায় চাল পর্যন্ত। চল্, ভেতরে চল্, বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

ভিতরে আসিলেই বউদিদি ভন্‌টুকে বলিলেন, আর একটু হ'লেই শঙ্কর-ঠাকুরপো সব মাটি করেছিল। বাকুর ঘড়ি যে তুমি যাবার সময় দম নেবার নাম ক'রে দু ঘণ্টা স্লো ক'রে দিয়েছিলে, আর একটু হ'লেই সব ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

ভন্‌টু বলিল, সর্বনাশ। বাকুর ঘড়ি দরকারমত স্লো-ফাস্ট আমরা করতাম

করছি। খবরদার, ও-বিষয়ে কক্ষনও কিছু বলিস না! বরং এমন ভাব করবি যে, ওইটেই বেস্ট্ ঘড়ি ইন ক্যাল্‌কাটা।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

ভন্‌টু বলিতে লাগিল, মেজকাকা যে মরেছে, তাই বাকু জানে না এখনও। বাকু জানে, মেজকাকা প্রাণপণে চাকরির চেষ্টা করছে, সেইজন্যেই বাইরে যেতে হয়েছে। খবরদার বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলিস নি কোনদিন!

শঙ্কর একটু হাসিল। তারপর বলিল, আমি একবার যাই ভাই, রাত হয়েছে। এতটা আবার হাঁটতে হবে তো!

থেকে যা না আজ রাত্তিরে, লদ্‌কালদ্‌কি করা যাক।

না, তা হয় না। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছি তো, ফিরে না গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। যা রামকিশোরবাবু আছে, সেই তোর বক।

ভন্‌টু বলিল, ও, মিস্টার ক্রেন?

হ্যাঁ।

তা হ'লে যা। কাল আবার দেখা করব।

হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। যাই তা হ'লে বউদি।

এস।

হ্যারিসন রোড দিয়া শঙ্কর একা হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

নানারূপ এলোমেলো চিন্তার আলোছায়ায় সমস্ত মনখানা তাহার বিচিত্র। মৃন্ময় ও তাহার চিঠির কথাটা সে এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া রাস্তার আলোকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! কে এই স্বর্ণলতা! হঠাৎ পিছন দিক হইতে একখানা মোটরকার আসিয়া তাহার পাশে থামিল।

শঙ্করবাবু যে, এখানে কি করছেন এত রাত্রে?

শঙ্কর চমকাইয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটস্থ করিল। ফিরিয়া দেখিল, অচিনবাবু। সেদিন প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে রিনির জন্মতিথি-উৎসবের

দিন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অচিনবাবু মোটরকারের দালাল। দালালি করার মত সঙ্গতি আছে, দক্ষতাও আছে। শ্যামবর্ণ নাতিস্থূল বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথায় সুবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। ভাসা-ভাসা চোখে দামী সোনার চশমা। কালো রঙে সোনার চশমা মানাইয়াছিল ভাল। মোটরখানিও দামী।

এখানে কি করছেন?

একটি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম, ফিরছি।

আসুন তা হ'লে, লিফ্‌ট্ দিয়ে দিই।

চলুন।

মৃন্ময়ের বাড়িতে ফিরিয়া তাহার জানালা গলাইয়া পত্রটি তাহার বাহিরের ঘরটিতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে—এই উদীয়মান ইচ্ছাটি আর পূর্ণ হইল না। শঙ্কর অচিনবাবুর গাড়িতে চাপিয়া বসিল। গাড়িতে উঠিয়াই একটা তীব্র এসেন্সের গন্ধ সে পাইল। হাসিয়া বলিল, খুব গন্ধের ছড়াছড়ি দেখছি আপনার গাড়িতে!

গাড়িটা স্টার্ট করিয়া খুব গম্ভীরভাবে অচিনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, এইমাত্র একজন সুরভিত প্রাণীকে নাবিয়ে দিয়ে এলাম।

জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কে তিনি?

জিজ্ঞেস আপনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই।

স্টিয়ারিং ধরিয়া গম্ভীর মুখে অচিনবাবু সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। দ্রুত নিঃশব্দ বেগে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, আর প্রয়োজনও নেই, উত্তর পেয়ে গেছি।

অচিনবাবু তথাপি নীরব।

শঙ্করের মনে হইল, যেন তাঁহার চোখের কোণে একটা অতি চাপা মৃদুহাস্য উঁকি দিতেছে। মুখ কিন্তু গম্ভীর। একটা রিক্‌শওয়ালা গলি হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাহির হইল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া অচিনবাবু আপন মনেই যেন বলিলেন, মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী। এইটেই বোধ হয় মানুষের বিশেষত্ব।

শঙ্কর কিছু বলিল না। একটু পরেই গাড়ি আসিয়া শঙ্করের হস্টেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর নামিয়া পড়িল। অচিনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবেন না যেন শঙ্করবাবু। যাঁর গন্ধ এতক্ষণ উপভোগ করতে করতে এলেন, তিনি নারী নন—পুরুষ।

এটা তা হ'লে কার?

শঙ্কর একটা সোনার মাথার কাঁটা অচিনবাবুর হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল, গাড়ির সীটে ছিল।

অচিনবাবুর গাম্ভীর্য এতটকু বিচলিত হইল না।

ও, ওটা আর একজনের। দিন। অনেক ধন্যবাদ। চলি তবে—গুড নাইট।

মোটর চলিয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৪

মুকুজ্জেমশাই যখন মৃন্ময়ের বাসায় আসিয়া পৌছিলেন, তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আসন্ন অপরাহ্ণের ম্লান রৌদ্রালোকে ক্ষুদ্র গলিটি তন্দ্রাতুর। চারিদিকে কোন জীবনের লক্ষণ নাই। একেবারে যে নাই তাহা নহে, একটা ডাস্ট্‌বিনের উপর উঠিয়া একটা লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুর লুব্ধ আগ্রহে কি যেন খাইতেছে, কিছু দূরে একটা গলিতে ঢং ঢং শব্দ করিয়া একটা বাসনবিক্রেতা বাসন ফেরি করিতেছে। ইহা ছাড়া চতুর্দিকে আর বিশেষ কোন চাঞ্চল্য নাই। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া ডাকিতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল এবং তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুকুজ্জেমশাই নামক ব্যক্তিটির সহিত অনেকেই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার আসল পরিচয় কেহই বোধ হয় জানে না। পরিচিত-মহলে তিনি 'মুকুজ্জেমশাই' নামেই খ্যাত, নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন—ভবতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহার বেশি নিজের আর কোন পরিচয় তিনি কাহাকেও দেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বেশি কৌতূহল প্রকাশ করিলে বলেন, পৃথিবীর অনেক জিনিসই তো জান

না, এটাও না হয় না জানলে! বলেন আর হাসেন। তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন মুখের হাসিতে অসামান্য একটি মাধুর্য আছে। আয়ত আরক্ত চক্ষু দুইটি সরল স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে সর্বদাই যেন ঝলমল করিতেছে। মুকুজ্জেমশাইয়ের নিজের কাজ বলিয়া কিছু নাই, কারণ তাঁহার নিজস্ব সাংসারিক কোন বন্ধনই নাই। কিন্তু মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই বিব্রত ও ব্যস্ত, নানা কাজের চাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পান না। পরের জন্য চাকরি যোগাড় করা, কে আপিসের টাকা ভাঙিয়া জেলে গিয়াছে তাহার সংসারের তত্ত্বাবধান করা ও জেল হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার নানাপ্রকার তদ্বির করা, কোথায় কোন্ রোগী আছে তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা, ভিড়ের দিনে অল্প পয়সায় মধ্যে থিয়েটারের জন্য টিকিট সংগ্রহ করা ইত্যাদি বহু বিচিত্র কর্মভারে মুকুজ্জেমশাই সর্বদাই নিপীড়িত। আজ তিনি কলিকাতায় আছেন, কাল রাজমহলে এবং তৎপরদিন দিনাজপুরে চলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন শিরীষবাবুর পুত্রের অসুখের সম্পর্কে। পুত্রটি তো মারা গিয়াছে, এখন কন্যাটির বিবাহ-ব্যাপারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। মৃন্ময়ের সহিত মুকুজ্জেমশাইয়ের আলাপ বেশি দিনের নয়। হাসির বাবার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং হাসির স্বামী হিসাবেই তিনি মৃন্ময়ের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। যে বড় পুলিস-অফিসারটি হাসিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিও মুকুজ্জেমশাইয়ের একজন ভক্ত এবং মুকুজ্জেমশাইয়ের সুপারিশেই তিনি একদা হাসির ভার লইয়াছিলেন। সুতরাং মৃন্ময়ের অপেক্ষা হাসিই মুকুজ্জেমশাইয়ের বেশি আত্মীয়। মুকুজ্জেমশাই বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিলেন, হাসি ছাড়া বাড়িতে কেহ নাই। হাসি মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া বলিল, আপনি এলেন, তবু বাঁচলুম।

এরা সব কোথা?

ঠাকুরপো এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। আর জানেন, উনি আজ দু দিন বাড়ি নেই! কি বিচ্ছিরি বলুন তো?

কোথা গেছে মৃন্ময়?

কি জানি! আপিসের কাজে কোথায় গেছে।

সি. আই. ডি.-র কর্মে মৃন্ময়কে প্রায়ই বাহিরে যাইতে হয়। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কবে ফিরবে কিছু ব'লে গেছে?

ঠোঁট ও হাত উল্‌টাইয়া হাসি বলিল, কিছু না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা ক'রে পর্যন্ত যায় নি। আপিস থেকে বাইরে বাইরে চ'লে গেছে। একটা কন্‌স্টেব্‌লের হাতে ঠাকুরপোকে একটাচিঠি লিখে দিয়ে গেছে যে, ফিরতে দু-চার দিন দেরি হতে পারে, আমরা যেন না ভাবি। দেখুন একবার আক্কেল!

মুকুজ্জেমশাই সান্ত্বনা দিয়ে বলিলেন, কি করবে বেচারী, ও-চাকরিই হ'ল ওই রকম।

মুখে আগুন অমন চাকরির।—এই বলিয়া হাসি একটি কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিল।

কম্বলে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কই, তোর বেরালছানাটা কোথায়?

হাসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

কাল সকালে সেটা ম'রে গেছে।

ম'রে গেছে! আহা! কি ক'রে?

ঠাকুরপোর জন্যে। সদর-দরজাটি কখন খুলে রেখেছিল, আর ও অমনই ফুট ক'রে কখন বেরিয়ে গেছে রাস্তায়। বাস্, ওদের বাড়ির কুকুরটা এসে খ্যাঁক ক'রে কামড়ে দিলে।

তখখুনি ম'রে গেল?

না, বেঁচে ছিল খানিকক্ষণ।

সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, আহা!

ঠাকুরপোটা এমন পাষণ্ড—কি বললে, শুনবেন? বললে—বাঁচা গেছে, আপদ গেছে।

ইহার উত্তরে মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না দেখিয়া অধিকতর উষ্মাভরে

হাসি বলিল, আপনি আশকারা দিয়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ইহার উত্তরেও মুকুজ্জেমশাই কিছু বলিলেন না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। বিড়ালের শোকে হাসি খুব বেশি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে নাই, তাহার কারণ সে পর-মুহূর্তেই বলিল, আচ্ছা, আপনার চুলের দশা কি হয়েছে?

উত্তরে মুকুজ্জেমশাই হাস্যদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

হাসি আবার বলিল, আঁচড়ে দেব?

দে।

হাসি ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় চিরুনি আনিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কারে লাগিয়া গেল। মুকুজ্জেমশাইয়ের কেশ-সংস্কার খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একমাথা বড় বড় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল আয়ত্তে আনা শক্ত। হাসি মরিয়া হইয়া চিরুনি চালাইতে লাগিল। মুকুজ্জেমশাই ধৈর্যসহকারে চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে হাসির হুঁশ হইল।

লাগছে আপনার?

পাগল! একটুও না।

এক কাজ করি বরং, আগে একটু তেল দিয়ে নিই, বেশ ভাল তেল আছে আমার।

মুকুজ্জেমশাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসি পুনরায় ঘরের ভিতর গেল এবং তৈল লইয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই আপত্তি করিলেন না। তৈল-সহযোগে ক্রমাগত আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া হাসি যখন মুকুজ্জেমশাইয়ের চুলের শ্রী অনেকটা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন চিন্ময় কলেজ হইতে ফিরিল। ঢুকিতে ঢুকিতেই সে বলিল, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে বউদি, শিগগির খাবার দাও।

তাহার পর মুকুজ্জেমশাইকে দেখিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ও পর-মুহূর্তে প্রণাম করিয়া বলিল, কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

হাসি বলিল, মাথা যেন কাগের বাসা হয়েছিল, তবু অনেকটা পরিষ্কার হ'ল।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, এইবার ছাড়্, চিনুর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে কয়েকটা। চিনু, আমার কাজের কতদূর হ'ল? আঃ, ছাড়্ আমাকে পাগলী।

দাঁড়ান না, সিঁথেটা ঠিক ক'রে দিই।

চিনু বলিল, লিস্ট্ আমি তৈরি করেছি, অনেক হয়েছে।

কই, দেখি?

থামুন, বইগুলো রেখে আসি আগে।

চিনু বই রাখিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের প্রসাধন শেষ করিয়া বলিল, কেমন হ'ল বলুন দেখি? মাথাটা বেশ ঝরঝরে লাগছে না?

খুব।

যাই ঠাকুরপোকে খাবার দিই গে। আপনি কিছু খাবেন?

না। আমাকে খেতে দেখেছিস কখনও বিকেলে?

হাসি চিনুর জলখাবার আনিতে রান্নাঘরের দিকে গেল।

চিনু আসিয়া বলিল, সবশুদ্ধ পনরো জন ছেলের নাম যোগাড় করেছি, দেখুন।

একটি ছোট খাতায় অনেকগুলি নাম টোকা ছিল। খাতাখানি সে মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে দিয়া বলিল, যার যতটা পরিচয় পেয়েছি সব টুকে নিয়েছি, ঠিকানাও আছে ওতে অনেকের।

চিনুর কার্যনিপুণতায় মুকুজ্জেমশাই খুশি হইলেন। বলিলেন, বাঃ!

চিনু বলিল, এদের মধ্যে শঙ্করসেবক রায় ব'লে ছেলেটি খুব ভাল। কলেজে ভাল ছেলে ব'লে খুব নাম। বাড়ির অবস্থাও ভাল শুনেছি।

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, ঠিকানাটা টোকা আছে তো? কই?

হস্টেলে থাকে, এই যে ঠিকানা।

মুকুজ্জেমশাই ঠিকানাটা দেখিয়া লইলেন ও তাহার পর খাতাটা চিনুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এটা এখন থাক্ তোমার কাছে। মেডিকেল কলেজ আর ল কলেজের দুজন ছেলেকেও দিয়েছি দুখানা খাতা। একদিন

সব মিলিয়ে দেখি, তার পর বেরুনো যাবে। এখন তুমি চট্‌ ক'রে খেয়ে নাও, এক দান বাঘ-বকরি খেলা যাক, এস। সেদিন তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে আমায়, তার শোধ না তুলে ছাড়ছি না।

চিনু হাসিয়া বলিল, আজও জিততে দেব না।

হাসি খাবার লইয়া আসিয়াছিল।

সে বলিল, সাবধানে খেলবেন দাদামশাই, ভয়ানক চোর ও। মরা বকরিগুলো চুরি ক'রে ঢুকিয়ে দেয়।

চিনু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, মিথ্যুক কোথাকার! নিজে খেলতে পারেন না, আবার আমার নামে দোষ দেওয়া হচ্ছে!

মুকুজ্জেমশাই হাসিতে লাগিলেন।

বলিলেন, আমার কাছে সে সব চালাকি চলবে না। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

চিনু কোনক্রমে পরোটা কয়খানা গলাধঃকরণ করিয়া মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত খেলিতে বসিয়া গেল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া, চিনু কখন কি ভাবে চুরি করে তাহা ধরিয়া ফেলিবার জন্ম ওত পাতিয়া রহিল।

১৫

মিস বেলা মল্লিক দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটিকে চাপিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে একখানি পত্র পড়িতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের এই আধুনিকতম সমস্যাটির সমাধান করিবেন। এই জাতীয় সমস্যা তাঁহার জীবনে নূতন অথবা আকস্মিক নহে। রূপ এবং যৌবন থাকিলে স্ত্রীলোকমাত্রেরই জীবনে এরূপ সমস্যার আবির্ভাব স্বাভাবিক। বেলা মল্লিক ইহাতে কোনরূপ অভিনবত্ব অনুভব করিতেছিলেন না, তিনি ভাবিতেছিলেন, কি উপায়ে সমস্যাটির সুচারু সমাধান করিয়া ফেলা যায়। তাঁহার মনোভাব অনেকটা দাবা-খেলোয়াড়ের মনোভাবের অনুরূপ। এরূপ প্রেমিক তাঁহার জীবনে একাধিকবার আসিয়াছে এবং প্রতিবারেই তিনি সু-কৌশলে আত্মরক্ষা

করিয়াছেন। সম্ভবপর হইয়াছে, কারণ নিজে তিনি কখনও কাহারও প্রেমে পড়েন নাই। নিজের রূপ গুণ ও যৎসামান্ত কাল্‌চারের প্রভাবে তিনি বহু পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মনোযোগ কেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি দুইটি প্রণয়ী আলোকলুব্ধ পতঙ্গের মত অহরহ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ইহাঁদের একজনের সম্বন্ধে বেলা দেবী নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁহার ভাবনা উদ্রিক্ত করিয়াছে। এই দ্বিতীয় লোকটির উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটি আত্মসমর্পণের ভঙ্গী রহিয়াছে, যাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ঠিক নারীদেহ-লুব্ধ পুরুষের লালসাময় প্রলাপ নহে—এ আকুলতার মধ্যে মর্মস্পর্শী আন্তরিকতা রহিয়াছে, ঠিক সুরটি যেন বাজিতেছে। প্রথমোক্ত প্রণয়ীটির মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব আছে তাহা নয়, কিন্তু সে আন্তরিকতা মনকে নাড়া দেয় না। নারীর মনকে নাড়া দিবার ক্ষমতা অপূর্ববাবুর নাই। শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ পালিত নারীস্তাবক, নারীসঙ্গ-লিপ্সু। নারীর বন্ধু হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার হয়তো আছে, কিন্তু প্রেমিক হইবার মত বলিষ্ঠতা তাঁহার নাই। প্রলুব্ধ ভ্রমরের মত প্রতি কুসুমের দ্বারে দ্বারে তিনি গুঞ্জন করিতেই পটু, আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চাটুকার ভ্রমরকে দিয়া কুসুম তাহার নানা অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লয়, কিন্তু কখনও ভ্রমরের কণ্ঠলগ্ন হয় না। কুসুম উপভোগ্য হয় সেই বলিষ্ঠ নিষ্ঠুরের, যে তাহাকে নির্মম হস্তে বৃন্তচ্যুত করে, নির্দয় সূচিকা-আঘাতে মর্মস্থল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথে। ইহা হয়তো বর্বরতা, কিন্তু এই বর্বরতার জন্যই বহু নারী-হৃদয় সমুৎসুক। অতি-সভ্য অতি-শৌখিন, অতি-মৃদু, অতি নমনীয় পুরুষ নারীর কাম্য নহে—অন্তত বেলার নহে। সুতরাং অপূর্বকৃষ্ণ পালিত সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি গান শিখাইবার অছিলায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেই আসেন, তাহা বেলা দেবী জানেন এবং সহ্য করেন। সহ্য করিবার হেতু আছে। এত সস্তায় এরূপ গানের শিক্ষক পাওয়া শক্ত। অপূর্ববাবুর নিজের গলা যদিও খুব ভাল নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক ও ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যই অভিজ্ঞ। শিক্ষক হিসাবেও

তিনি ভাল। তা ছাড়া, আবেগের আতিশয্যে নানা রকম উপহারও তিনি আনিয়া দিতেছেন। সেদিন একটা ভাল এস্রাজ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন, নানা স্থান হইতে গানের স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন। বেলা মল্লিকের মত সঙ্গতি-বিহীনার পক্ষে এ সব অবহেলা করিবার নয়। সঙ্গীতবিদ্যায় বেলার অনুরাগ আছে, গলাও ভাল। এই সুযোগে, অর্থাৎ অপূর্বকৃষ্ণের দুর্বলতার সুযোগে যদি এই বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি? মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় অপূর্বকৃষ্ণবাবুর মত একজন শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। মাত্র সঙ্গসুখ দান করিয়া এত অল্প বেতনে যদি অপূর্ববাবুর মত লোক পাওয়া যায়, বেলা তাহাতে আপত্তি করিবেন কেন? অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে সামান্যতম মোহও বেলার মনে নাই। অপূর্ববাবুর মোহের সুযোগ লইয়া তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইতেছেন মাত্র এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই তাঁহাকে একটা বেতন দিতেছেন। কারণ, এটা তিনি বেশ জানেন যে, বেতন না দিলেও অপূর্ববাবু তাঁহাকে গান শিখাইতে আসিবেন। তথাপি বেলা দেবী তাঁহাকে বেতন দেন এইজন্য যে, কৃতজ্ঞতার বন্ধনেও তাঁহাকে যেন অপূর্ববাবুর কাছে বাঁধা পড়িতে না হয়, ইচ্ছা করিলে যে কোন দিনই যেন সম্পর্কটা চুকাইয়া দেওয়া চলে। সুতরাং অপূর্ববাবুকে লইয়া বেলার দুর্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে এত সহজে এড়ানো যাইবে না। এড়ানো শক্ত প্রথমত এই কারণে যে, সে প্রতিবেশী, সদা-সর্বদা তাহার সহিত দেখা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, সে স্বজাতি পালটি ঘর। সামাজিকভাবেও তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে এবং সে চাহিতেছেও তাহাই। কিছুদিন পূর্বে সে বেলার দাদা প্রিয়বাবুর নিকট খোলাখুলিভাবেই এই প্রস্তাব করিয়াছিল। বেলার দাদাই বেলার একমাত্র অভিভাবক ও আত্মীয়। এই প্রস্তাবে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। এই বাজারে বোনটার যদি এমন একটা সদগতি হইয়া যায়, মন্দ কি? বেলা কিন্তু বিবাহ করিতে রাজী নহেন এবং সে কথা দাদাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। ভগ্নীর বয়স হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, তাহার নিজের একটা মতামত হইয়াছে। প্রিয় মল্লিক সোজাসুজি

ভগ্নীর মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাঁকা পথ ধরিলেন। বেলাকে একদিন বলিলেন, আলাপ ক'রে দেখ্ না একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে। খাসা লোক, অবস্থাও বেশ সচ্ছল, আমার তো বেশ লাগল লোকটিকে।

সুতরাং বেলার সহিত লক্ষ্মণবাবুর একদিন আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল, এবং তাহার পর হইতে লক্ষ্মণবাবু সুযোগ পাইলেই আসিয়া হাজির হইতেছে। এতদিন দূর হইতেই বেলাকে দেখিয়া ও বেলার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল, এখন প্রিয়বাবু সে দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভাবটা— যদি বেলার ছেলেটিকে ভাল লাগিয়া যায়। প্রিয়বাবু লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোক—ব্যাচিলার মানুষ, এক শত টাকা বেতনের চাকুরি করেন, ভগ্নীটিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া আছেন। ভগ্নীটি স্কন্ধ হইতে নামিলে তিনি এই আয়ে আরও একটু আরামে থাকিতে পারেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগ্নী কিছুতেই নামিতে চায় না। প্রিয়বাবু যত পাত্র আনিয়া জুটাইতেছেন, একটা-না-একটা অজুহাতে সে তাহাদের নাকচ করিয়া দিতেছে। মেয়েটা প্রেমেও পড়ে না! ওই গানের মাস্টারটা হন্তে কুকুরের মত রোজ যাওয়া-আসা করিতেছে, একবার 'তু' করিয়া ডাকিলেই পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে; কিন্তু সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। যে আশায় প্রিয়বাবু মাসে মাসে নগদ পাঁচ টাকা করিয়া খরচ করিতে রাজী হইয়াছিলেন, সে আশায় বহুকাল পূর্বেই ছাই পড়িয়াছে। এখন টাকাটা অনর্থক খরচ হইতেছে বুঝিয়াও প্রিয়বাবু তাহা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলাকে তিনি ভয় করেন।

দেখা যাক, এ ছোকরা যদি কিছু ক'রে উঠতে পারে—এই মনোভাব লইয়া তিনি লক্ষ্মণবাবুকে আনিয়া একদিন বেলার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছেন।

বেলার মনোজগতে কোনও বিপ্লব হয় নাই।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবাবুর সহিত আলাপ করিয়া বেলা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহাকে লইয়া মুশকিলে পড়িতে হইবে। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই অতিশয় ভাবপ্রবণ, কাছে আসিয়া আলাপ করিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে

পাইয়াছে। এই বিপদ হইতে কি কৌশলে ভদ্রভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বেলার মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। কোষ্ঠীখানাকে কাজে লাগানো যাক। বেলা লক্ষ্মণবাবুকে বলিয়া বসিলেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস, বিবাহ-ব্যাপারে লক্ষ্মণবাবু যদি সত্যই অগ্রসর হইতে চান, তাহা হইলে উভয়ের কোষ্ঠী দুইটা সর্বাগ্রে মিলাইয়া দেখা প্রয়োজন। নিজের কোষ্ঠীর সম্বন্ধে বেলা দেবীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোষ্ঠীখানি এমন যে, কোন জ্যোতিষীই সজ্ঞানে সেটিকে ভাল বলিতে পরিবেন না। বেলার বাবা যখন বাঁচিয়া ছিলেন এবং বেলার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এই কোষ্ঠীই বিবাহের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষটা বেলার বাবা ঠিক করিয়াছিলেন যে, এবার কেহ কোষ্ঠী চাহিলে একটা মিথ্যা কোষ্ঠী দিতে হইবে। সে প্রয়োজন অবশ্য আর হয় নাই। কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান, এবং বেলা নিজেই নিজের বিবাহের কর্ত্রী হইয়া পড়েন। মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বেলার দাদা প্রিয়বাবু লোকচক্ষে যদিও বেলার অভিভাবক, কিন্তু বেলার ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারে বেলার মতই গ্রাহ্য, এবং সে মত এতই সুস্পষ্ট যে, প্রিয়বাবু ভগ্নীর বিবাহের আশা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন যে, বেলার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা থাকিলে এতদিন কোন্ কালে বিবাহ হইয়া যাইত। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই বিগলিত হইয়া পড়িতে হইবে—এ মনোভাব বেলার তো নাইই, বরং উল্টা। পুরুষের সংস্পর্শে আসিলে তিনি যেন আরও কঠিন হইয়া পড়েন। প্রিয়বাবু ভগ্নীর অদ্ভুত মনোবৃত্তির কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া শেষটা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্মণবাবুর হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বেলা দেবী নিজের সাংঘাতিক কোষ্ঠীখানি কাজে লাগাইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে লক্ষ্মণবাবু তাঁহার কোষ্ঠীখানি লইয়া গিয়াছেন। আজ অকস্মাৎ এই পত্রখানি আসিয়াছে—

বেলা,

এ কয়দিন আমি ক্রমাগত চিন্তা করিয়াছি। কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাই নাই। অবশেষে তোমার কাছেই আসিয়াছি, তুমিই ইহার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও। তুমি কুষ্ঠিতে বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু বিধাতার এমনই নির্বন্ধ যে, কুষ্ঠি দুইটির কিছুতেই মিল হইতেছে না। আমি দুইজন জ্যোতিষীকে দেখাইয়াছি। দুইজনেই এ বিষয়ে একমত। একজন জ্যোতিষী কিন্তু বলিলেন যে মনের মিলই শ্রেষ্ঠ মিল। আমার মন তাঁহার কথায় সায় দিয়াছে। জানি না, তোমার মনের কথা কি? তোমাকে বিবাহ করিলে সত্যই যদি কোন বিপদ ঘটে, আমার তাহাতে ভয় নাই। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি এবং আজীবন থাকিব। যদি অনুমতি দাও, আবার তোমার নিকট যাইব। আমার মনের ভিতর যে কি হইতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দোকানের ঠিকানায় উত্তর দিও। ইতি—

লক্ষ্মণ

বেলা কিছুক্ষণ পত্রখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তর লিখিতে শুরু করিলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর—

লক্ষ্মণবাবু,

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। একদিন সময় করিয়া নিশ্চয় আসিবেন। আসিবেন না কেন? কুষ্ঠির বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় হয়। দেখি, দাদা কি বলেন। নমস্কার। ইতি—

শ্রীবেলা মল্লিক

পত্রখানা খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া বেলা দেবী টেবিলের উপর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

কলিকাতার বাহিরে একটি রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে বসিয়া মৃন্ময় তাহার ডায়েরি লিখিতেছিল। সি. আই. ডি.-তে কিছুকাল কাজ করিয়া এবং তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়া (কিছুটা শ্বশুর মহাশয়ের তদ্বিরের ফলেও) মৃন্ময় সম্প্রতি আই. বি.-তে ঢুকিয়াছে। আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছোকরার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। উপরওয়ালার নির্দেশমত সে ছেলেটির গতিবিধির ইতিহাস, নাম-ধাম, এমন কি একটি ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে। এমন তো সে কিছুই এ ছোকরার মধ্যে দেখিতে পাইল না যাহা ভীতকর, বরং ছোকরাকে দেখিলে অতিশয় নিরীহ বলিয়াই মনে হয়। ইহার উপর কর্তাদের এত নজর কেন? যে জন্যই হউক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা অথবা অবসর মৃন্ময়ের নাই। সে মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছে, ওইখানেই তাহার কর্তব্যের শেষ হইয়াছে। কর্তব্যের জের টানিয়া আনিয়া ব্যক্তিগত নিভৃত জীবনকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা মৃন্ময়ের স্বভাব নয়। সুতরাং ডায়েরি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া সে তাহার চাকুরি-জীবনের উপর তখনকার মত যবনিকা টানিয়া দিল এবং আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া চক্ষু বুজিল।

একটু পরেই তাহার মনে স্বর্ণলতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সোনার মত গায়ের রঙ, লতার মত তন্বী—সত্যিই সে স্বর্ণলতা ছিল। সহসা কোথায় চলিয়া গেল? এমন করিয়া চলিয়া যাইবার হেতুই বা কি, মৃন্ময় আজও তাহা বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণলতার অন্তর্ধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

স্বর্ণলতা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিল এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পর তাহার সহিত মৃন্ময়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সামান্য একটি অস্থায়ী চাকুরি পাইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতা শহরে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। মৃন্ময়ের সামান্য আয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিলেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে না। স্বর্ণলতার মনে নানারূপ শখ। মৃন্ময়ের স্বল্প আয়ে সেসব শখ মিটিত না। একদিন স্বর্ণলতা

মৃন্ময়কে বলিল যে, দুইজনে মিলিয়া উপার্জন করিলে কেমন হয়—সে-ও চাকুরি করিবে। একটি কাগজে নাকি সে বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে যে, একটি বালিকাকে পড়াইবার জন্ম ম্যাট্রিকুলেশন-পাস একজন শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা বাড়িতে গিয়া পড়াইয়া আসিতে হইবে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি অতদূরে গিয়ে রোজ পড়িয়ে আসতে পারবে?

কেন পারব না? নিশ্চয় পারব।

ইহার দুই দিন পরে মৃন্ময় একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখে, স্বর্ণলতা নাই। পাড়ায় খোঁজ করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যে ঠিকানা হইতে শিক্ষয়িত্রীর জন্ম বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল সেখানে গিয়া খোঁজ করিল, সেখানেও স্বর্ণলতা যায় নাই। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বর্ণলতা নামে কোন শিক্ষয়িত্রী আসেন নাই। দুই দিন পরে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, সে বাড়িতে কেহ নাই। বাড়ি খালি পড়িয়া আছে—'টু লেট' ঝুলিতেছে। স্বর্ণলতার বাপের বাড়িতে খবর দিতে তাঁহারা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, স্বর্ণ সেখানেও যায় নাই তো! কোথায় গেল সে? পুলিসে খবর দেওয়া হইল, হাসপাতালগুলিতে সন্ধান লওয়া হইল—কোনও খবরই পাওয়া গেল না। এমন ভাবে চলিয়া যাইবার অর্থ কি? অস্থায়ী চাকুরির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিল—চাকুরিবিহীন উদ্‌ভ্রান্ত মৃন্ময় সম্ভব অসম্ভব নানা স্থানে স্বর্ণলতার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আজও ফিরিতেছে।

আরাম-কেদারায় শুইয়া মৃন্ময় স্বর্ণলতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রশ্ন বহুবার সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই প্রশ্নটি আবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। স্বর্ণলতা কি তাহার দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছে? সে কি তাহাকে ভালবাসিত না? নিশ্চয় বাসিত। তবে সে এমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন? তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক। তাহাতে কোন

কসুর নাই। তবে চলিয়া গেল কেন? এ 'কেন'র উত্তর মৃন্ময় আজও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মৃন্ময় স্বর্ণলতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল কি? মাত্র এক বৎসর তো বিবাহ হইয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল, সে হয়তো স্বর্ণলতাকে মোটেই চিনিতে পারে নাই। তাহার মানসপটে স্বর্ণলতার যে মুখখানি আঁকা রহিয়াছে, তাহাতে অদ্ভুত মৃদু হাসি! ওই সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিটুকুর কোন সদর্থই তো মৃন্ময় আজ পর্যন্ত করিতে পারিল না। উহা কি ব্যঙ্গের হাসি? অনুরাগের হাসি? অর্থহীন হাসি? মৃন্ময় ঠিক বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা মৃন্ময় নিঃসংশয়ে জানে যে, সে নিজে স্বর্ণলতাকে আজও ভালবাসে এবং একদিন না একদিন সে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

ক্লিক!

শব্দটা শুনিয়া মৃন্ময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল। শ্যামবর্ণ নাতি-স্থূল সুদর্শন একটি ভদ্রলোক আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃন্ময়কে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া একটি ছোট ক্যামেরা তিনি পকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিলেন। মৃন্ময় ব্যাপারটা ভাল বুঝিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কতদূর যাবেন আপনি?

কলকাতা।

ও।

মোটরের দালাল অচিনবাবু আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই একটি কুলি-সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। কুলির মাথা হইতে একটি সুট্‌কেস ও হোল্ড্‌-অল নামাইয়া লইতে লইতে পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, একটু অসুবিধে করলাম আপনার, মাপ করবেন। বেশ একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন, না?

না, আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি এলেন কোথা থেকে? এখন তো কোনও ট্রেন নেই।

আমি মোটরে এলাম। আমিও কলকাতা যাব।

তাই নাকি? তা হ'লে তো ভালই হ'ল। একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অচিনবাবুর ড্রাইভার আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

অচিনবাবু তাহাকে বলিলেন, তুমি ফিরে যাও, রাজাসায়েবকে ব'লে দিও, আমার কাজ হয়ে গেছে। কলকাতায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।

সেলাম করিয়া ড্রাইভার চলিয়া গেল।

অচিনবাবু ওয়েটিং-রুমের দ্বিতীয় ঈজি-চেয়ারটি দখল করিলেন। চক্ষু হইতে চশমাটি খুলিয়া রুমাল দিয়া চশমার কাচ দুইটি পরিপাটীরূপে পরিষ্কার করিয়া চশমাটি পুনরায় পরিধান করিলেন। তাহার পর হোল্ড্-অলের ভিতর হইতে একটি খবরের কাগজ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন।

মৃন্ময় নির্বাক হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কে? কাহার ফোটো তুলিল? মৃন্ময়ের? কেন?—এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মৃন্ময়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। অচিনবাবু কিন্তু আর মৃন্ময়ের প্রতি মনোযোগ দিলেন না। তিনি প্রকাণ্ড খবরের কাগজখানা মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মৃন্ময় তাঁহার মুখটাও আর ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মৃন্ময়ের কৌতূহল ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, দুই-একটি কুলি ছাড়া প্ল্যাট্‌ফর্মে আর কেহ নাই। তখন ধীরে ধীরে সে স্টেশনের বাহিরে গিয়া পিছন দিক হইতে ওয়েটিং-রুমের বাহির দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা দিয়া সে দেখিল, অচিনবাবুর মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মুখে হাসি নাই, চক্ষু দুইটি হইতে কিন্তু হাসি উপচাইয়া পড়িতেছে। মৃন্ময়ের কাছেও ছোট একটি ক্যামেরা ছিল। তাহার ডিটেকটিভ মন এ সুযোগ ত্যাগ করিতে চাহিল না। ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে ক্যামেরাটি বাহির করিয়া অচিনবাবুর একখানা ফোটো সে তুলিয়া লইল।

অচিনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

শৈল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

শঙ্করকে আজ সে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে; কিন্তু কই, শঙ্কর এখনও পর্যন্ত আসিল না তো? ভুলিয়া গেল নাকি? না, শৈলর নিমন্ত্রণ শঙ্কর ভুলিয়া যাইবে—এ কথা শৈলর মন মানিতে প্রস্তুত নয়। যদি সে না আসিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কোন কারণ ঘটিয়াছে। শৈল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল, পৌনে আটটা বাজিয়াছে। রাত তো বেশি হয় নাই, অথচ শৈলর মনে হইতেছে, সে যেন যুগযুগান্ত বসিয়া রহিয়াছে। শঙ্করদার এত দেরি করিবারই বা কারণ কি? আজ একটু বকিয়া দিতে হইবে—এত আড্ডা দেওয়া ভাল নয়। চিরকাল শঙ্করদার এই স্বভাব, একপাল ছেলে জুটাইয়া দঙ্গল পাকানো।...আজ উনি বাড়ি নাই, কোথায় দুই দণ্ড বসিয়া গল্পসল্প করা যাইবে—তা নয়, কোথায় আড্ডা দিয়া বেড়াইতেছে! রাত-দুপুরে হয়তো হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া খাইয়া চলিয়া যাইবে। আক্কেলকে বলিহারি যাই—খাওয়ার নিমন্ত্রণ শুধু কি খাওয়ার জন্যই।...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ শৈল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দ্বারের পানে চাহিল। শঙ্কর আসিল না, আসিল বাড়ির ঝি-টা।

সে বলিল, বেয়ারা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিতেছে, আম-সন্দেশ পাওয়া গেল না, এ তল্লাটের সব দোকানে সে খুঁজিয়াছে।

শৈল আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, তাকে বল, যেখান থেকে পারে খুঁজে নিয়ে আসুক। এ তল্লাটে না পাওয়া যায়, অন্য তল্লাটে গেলেই হ'ত; তল্লাটের তো অভাব নেই কলকাতা শহরে! গাড়িটা নিয়েই যেতে বল না হয়। শঙ্করদা আম-সন্দেশ খেতে ভালবাসে।

ঝি চলিয়া গেল, শৈল আবার বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শঙ্করদা কি এখনও কবিতা লেখে? স্কুলে যখন পড়িত, তখন ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দিনরাত কবিতা লিখিত। ইহার জন্য জ্যেঠামশাইয়ের কাছে বকুনিও কি কম খাইয়াছে! শৈলকে ডাকিয়া কত কবিতাই যে শুনাইত লুকাইয়া

লুকাইয়া! এই তো সেদিনের কথা—দেখিতে দেখিতে কয়েকটা বছর চলিয়া গিয়াছে মনেই হয় না। অত শক্ত শক্ত কথাওয়ালা কবিতা শৈল বুঝিতেই পারিত না,—কথার মানে বুঝিত না বটে, কিন্তু আসল অর্থটা তাহার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। সে কথা স্বীকার করিতেও এখন লজ্জা করে। ছি ছি, যত সব ছেলেমানুষি! কিন্তু—

শঙ্কর আসিয়া পড়িল।

কি রে শৈল, ব্যাপার কি, হঠাৎ নেমন্তন্ন?

কেন, নেমন্তন্ন করতে নেই নাকি? ভুলেও তো খোঁজ নাও না একবার। বাধ্য হয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'ল।

শঙ্কর খাটের উপর বসিয়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তা বেশ করেছিস।

বেশ করেছি মানে?

আচ্ছা, বেশ করিস নি।—শঙ্কর হাসি ঢাকিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

রাগিও না আমায় বলছি শঙ্করদা, নিজে আসবে না একবারও ভুলে, নেমন্তন্ন করেছি ব'লে আবার খোঁটা দেওয়া হচ্ছে!

আলুর চপ করেছিস?

ভারি ব'য়ে গেছে আমার, সমস্ত সন্ধ্যেটা বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে এখন এসে রাত নটার সময় আলুর চপের ফরমাশ হচ্ছে!

সত্যি করিস নি?

করেছি গো করেছি। আচ্ছা পেটুক লোক বাপু তুমি, এসে থেকে আর কোন কথা নেই, কেবল খাওয়ার কথা!

বোস সায়েব কোথা? ক্লাবে বুঝি?

না, তিনি এখানে নেই, দিল্লী গেছেন।

দিল্লী? হঠাৎ দিল্লী কেন? লাড্ডুর চেষ্টায়?

শৈল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, লাড্ডুর চেষ্টাতেই বটে, কে এক সায়েব আছে নাকি সেখানে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই সায়েব যদি ইচ্ছে করে, ওঁকে নাকি আরও একটা ভাল পোস্ট্ দিতে পারে।

শঙ্কর বলিল, ভালই তো।

ভাল, না, ছাই! চাকরির তদ্বির করতে করতেই নাকাল, বিয়ে হয়ে থেকে তো দেখছি, কেবল ছুটোছুটি আর ছুটোছুটি!

শঙ্কর কিছু বলিল না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে লাগিল। শঙ্করের মুখে সিগারেট দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে শৈল বলিল, এ কি শঙ্করদা, তুমি সিগারেট ধরেছ নাকি?

ধোঁয়া ছাড়িয়া সহাস্যমুখে শঙ্কর বলিল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর লাগে। খাবি? খেয়ে দেখ্ না একটা বেশ লাগবে।

আস্পর্ধা তোমার তো কম নয়!

শঙ্কর হাসিতে লাগিল।

ক্ষণপরেই কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া শৈল বলিল, সিগারেট খাওয়া ভারি খারাপ শুনেছি, ওতে নাকি বুক খারাপ হয়ে যায়?

আমার বুক কি অত অপলকা ভেবেছিস যে, সিগারেটের ধোঁয়ায় খারাপ হয়ে যাবে? ছেলেবেলায় কত এক্সারসাইজ করতাম, মনে নেই—তোদের বাড়ির পেছন দিকের সেই মাঠটায়?

বাহাদুরি আর করতে হবে না, কখন যে কার কি হয় বলা যায় কিছু? মেজদার কথা মনে নেই? কত গায়ে জোর ছিল তার, দুদিনের জ্বরেই সব শেষ হয়ে গেল।

উৎপলের ভাই পঙ্কজের কথা শঙ্করের মনে পড়িল। মৃত পঙ্কজের স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উভয়ের মনে ছায়াপাত করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, আচ্ছা, দাদার কোন চিঠিপত্তর পাও তুমি শঙ্করদা? আমাকে সেই যা গিয়ে একখানি চিঠি লিখেছিল, আর লেখে নি।

উৎপলের চিঠি শঙ্করও অনেক দিন পায় নাই।

বলিল, কই, আমাকেও তো লেখে না বড় একটা।

শৈল মুচকি হাসিয়া বলিল, বউদিকে খুব লিখছে নিশ্চয়।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ওই ভয়েই তো বিয়ে করব না। তোরা সব রাক্ষসী—

তবু তো রাক্ষসীদের মায়া এড়াতে পার না।

মানে?

আজকাল আর আস না কেন, বল তো?

পড়াশোনা নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়।

পড়াশোনা নিয়ে? তাহা মিছে কথাটা আর ব'লো না তুমি। ও মিছে কথাও বলতে পার!

মিছে কথা মানে?

আমি সব জানি গো, সব জানি? তোমার সোনাদিদির সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে।

তুই আবার পার্টিতে যাস নাকি? লায়েক হয়ে উঠেছিস তা হ'লে বল্!

শৈল হাসিল। বলিল, সত্যি, ভাল লাগে না আমার ওসব পার্টি-ফার্টিতে যেতে। কেবল ওঁর জেদে প'ড়ে যেতে হয়।

কোথায় চায়ের পার্টি ছিল, কিসের জন্যে পার্টি?

উনিই পার্টি দিয়েছিলেন একটা ওঁদের ক্লাবে। সোনাদিদির স্বামীও তো রেলেতে চাকরি করেন দিল্লীতে, সেইজন্য সোনাদিকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন উনি।

সোনাদিদির সঙ্গে আলাপ ছিল নাকি তোর?

ছিল বইকি, দাদার সঙ্গে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আমিও যে গেছি দু-এক বার। মিষ্টিদিদি রিনি—সবাইকে চিনি আমি।

শৈল শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া বলিল, রিনি মেয়েটি বেশ, নয় শঙ্করদা?

শঙ্কর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল।

গম্ভীরভাবেই বলিল, ও-রকম মেয়ে আমি আর দেখি নি।

শৈল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, যাই, আমি একবার দেখি, কতদূর কি হ'ল, তুমি একটু ব'স।

অনাবশ্যক দ্রুতবেগে শৈল বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শৈলর কথা নয়—রিনির কথা।

আজ তাহার সহিত ক্লাউড্‌স কবিতাটি পড়িবার কথা ছিল। শৈলর নিমন্ত্রণের ধাক্কায় সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাজে নিমন্ত্রণ ও লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া জীবনের কত পরম লগ্ন যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা তো কেহ বোঝে না। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে লোকে অভিমান করে। বিশেষত শৈলর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা তো অসম্ভব। অথচ আজ সুন্দর সন্ধ্যাটা কতকগুলা দুষ্প্রাপ্য আহার গলাধঃকরণে কাটিয়া যাইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয়। রিনি বেচারী আমার অপেক্ষায় হয়তো বসিয়া থাকিবে। তাহাকে খবর দিয়া আসিবার সময়ও ছিল না।

শৈল ফিরিয়া আসিল।

ক্ষিদে পেয়েছে শঙ্করদা? রান্না তৈরি।

মোটেই না।

তা হ'লে এস, একটু গল্প করা যাক। জান শঙ্করদা, মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা ওরা কেটে ফেলেছে।

শঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল।

কোন্‌ ফলসাগাছটা?

মিত্তিরদের বাড়ির সেই ফলসাগাছটা, এর মধ্যে ভুলে গেলে সব? কি ভাবছ তুমি?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, কিছু না। বুঝেছি, কেটে ফেলেছে গাছটা। ভারি অন্যায় তো। কে কাটলে, চণ্ডী বুঝি? তা না হ'লে অমন বুদ্ধি আর কার হবে?

শঙ্কর আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। সহসা শৈল বলিল, আমি কেমন সোয়েটার বুনতে শিখেছি, দেখবে শঙ্করদা?

কই, দেখি।

শৈল একটি অর্ধসমাপ্ত সোয়েটার বাহির করিয়া পরম আগ্রহে শঙ্করকে দেখাইতে লাগিল।

এই নীল রঙটার সঙ্গে কি রঙ মানাবে, বল তো?

কোনও লাইট রঙ। কমলা কিংবা সাদা—সাদাই সে না, বেশ হবে দেখতে।

শঙ্কর আহারাদি শেষ করিয়া চলিয়া গেল। শৈল একা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নূতন কৃতিত্ব সোয়েটার-বোনা, পটলের দোরমা কিছুই যেন শঙ্করদাকে তেমন মুগ্ধ করিতে পারিল না।···অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শৈল সহসা উঠিয়া পড়িল এবং স্বামীকে অকারণে পত্র লিখিতে বসিল। কালই লিখিয়াছে, আজ আর লিখিবার দরকার ছিল না। বার বার একটা কথাই নানাভাবে লিখিল—আমার একা একা একটুও ভাল লাগিতেছে না, তুমি শীঘ্র চলিয়া এস। দেরি করিও না—একা ভারি ভয় করে আমার।

১৮

শঙ্কর হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, তাহার অপেক্ষায় একটি মোটা খাম মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে, কপাট খুলিতেই চোখে পড়িল। কলেজ হইতে শঙ্কর হস্টেলে ফিরিতে পারে নাই, প্রফেসার গুপ্তের বাড়ি গিয়াছিল। বয়সের এবং বিদ্যার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রফেসার গুপ্তের সহিত শঙ্করের হৃদ্যতা জন্মিতেছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে কোথায় একটা মিল ছিল, হয়তো তাহা সাহিত্যপ্রীতি, হয়তো সৌন্দর্যলিপ্সা—ঠিক বলা শক্ত। উভয়ের মন কিন্তু বয়স এবং বিদ্যার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। রিনির অধ্যাপনা করিবার জন্য অধ্যাপক গুপ্তের সাহায্য লওয়া শঙ্করের প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায়ই কলেজ হইতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসায় গিয়া হাজির হয়। আজও সে সেখানে গিয়াছিল এবং সেইখানেই তাহার সহসা মনে পড়িয়া যায় যে, শৈলর ওখানে তাহার নিমন্ত্রণ আছে।

শঙ্কর খামখানা তুলিয়া দেখিল, সুরমার চিঠি। সুরমা ছোট চিঠি লেখে না—দীর্ঘ পত্র। শঙ্কর কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাল করিয়া বিছানায় বসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে এ পত্রের অমর্যাদা করা হইবে।

সুরমা লিখিতেছে—

শঙ্করবাবু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, কিন্তু আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত আবহাওয়া মনের মধ্যে ছিল না ব'লে উত্তর দিতে দেরি হ'ল। এখনও যে আবহাওয়াটা খুব মনোরম হয়ে উঠেছে তা নয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের উৎপাতটা কমেছে মাত্র। মনের যে সাম্য থাকলে সুন্দর চিঠি লেখা যায়, তা এখন আমার নেই। তবু আপনাকে চিঠি লিখছি এইজন্যে যে, চিঠির উত্তর না পেলে আপনি হয়তো অকারণে অনেক কিছু ভেবে বসবেন। অকারণে একটা কিছু ভেবে বসা আপনাদের স্বভাব, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওইটেই আপনাদের বিশেষত্ব। আপনারা ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু ক'রে বসেন—অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই। আপনাকে চিঠি লেখার দ্বিতীয় কারণ, চিঠি লেখার অজুহাতে আপনাকে সামনে বসিয়ে (অবশ্য কল্পনায়) কলমের মুখে খানিকটা বকবক করব, মনের ভার তাতে হয়তো অনেকটা কমবে। এত লোক থাকতে এবং এত স্বল্প পরিচয় সত্ত্বেও আপনাকেই হঠাৎ কেন এসব কথা বলতে যাচ্ছি, তা ঠিক বুঝতে পারছি না; হয়তো আপনি আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লে, কিংবা হয়তো আর কিছু—ঠিক জানি না। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যা অঘটন মনে হয়, যার আকস্মিকতা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাঁধা ফরম্যুলার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু ঘটনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। যা প্রত্যক্ষ তা অবশ্য-স্বীকার্য, হেতুটা পরে আবিষ্কার করতে হয়।

যাক, যে কথাটা অতি প্রবলভাবে এখন মনে জাগছে এবং যার তাড়ায় আজ কাগজ কলম নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে এই আবোল-তাবোল প্রলাপগুলো লিপিবদ্ধ করছি, সেইটেই ব'লে ফেলা যাক। সেটা হচ্ছে এই, কথাটা অতি পুরাতন—আমরা নারীরা বড় অসহায়। বিধাতা কিন্তু অসহায় ক'রে আমাদের পৃথিবীতে পাঠান নি, তিনি এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দিয়েছেন, যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবীর বড় বড় বীরপুরুষরাও কাবু হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের—অর্থাৎ সভ্যশ্রেণীর

নারীদের মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধিদত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা মানুষ-মনিবদের মুখ চেয়ে আছি। তাঁদের হুকুম এবং সমর্থন না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না। তাঁরা ব'লে দেবেন, কোন্‌খানে কখন এবং কতক্ষণ আমরা রণ-কৌশল দেখাতে পাব। কেউ কেউ হয়তো আজীবন সে অনুমতি পায় না। শুধু পায় না তাই নয়, বেচারীকে সমস্ত বাণ তূণে পুরে রেখে আজীবন অহিংসার গুণ গাইতে হয়। আর যেসব সৌভাগ্যশালিনী কোন এক বিশেষ ব্যক্তিকে তাগ করবার অনুমতি পেলেন, তাঁরাও যে সব সময়ে চরিতার্থ হয়ে গেলেন তা মনে করবেন না। প্রায়ই দেখা যায়, যে লোকটিকে সম্মোহিত করবার সামাজিক সমর্থন পাওয়া গেল, তিনি এ সম্মানের অনুপযুক্ত। অর্থাৎ হয় তিনি ইতিপূর্বেই আর কারোর দ্বারা জখম হয়েছেন, নয় তিনি এতই নিরীহ অথবা এতই হীন যে, অস্ত্রশস্ত্রের কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর জন্যে। এদের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয় নিরর্থক, না হয় অপমানিত। বিধাতা যাকে বিজয়িনী হবার সাজসরঞ্জাম দিয়ে সৃষ্টি করলেন, মানুষ-বিধাতার পাকে-চক্রে তার সমস্ত কলা-কৌশল এমন একটা পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল যে, তার জন্যে সে সর্বদাই শঙ্কিত। সত্যিই, আমাদের বড় মুশকিল। ইচ্ছে করলেই আমরা আমাদের আয়ুধ সম্বরণ ক'রে রাখতে পারি না, কখন যে তা কাকে গিয়ে অতর্কিতে আঘাত ক'রে বসে, তা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না। আহত ব্যক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন, কখনও করেন না। যখন করেন, তখন দেখা যায়, সামাজিক বিধি-নিয়ম অনুসারে লজ্জা পাবারই কারণ ঘটেছে, অহঙ্কৃত হবার নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য বিধাতা যে বশীকরণবিদ্যা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেটাকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কা-অস্বস্তির সীমা নেই। বস্তুত এই বশীকরণশক্তি যার মধ্যে যত প্রকট, সমাজে সে তত নিন্দিত, বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে। অথচ ভেবে দেখুন, সে বেচারীর দোষ কি? তার মাধুর্য সে অবলুপ্ত করবে কি ক'রে? ফুল রূপ-রস-গন্ধের ঐশ্বর্যে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই তো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু তার সুষমার জন্য তাকেই লজ্জিত করে যে অদ্ভুত

বিধানের জবরদস্তি, আমরা তারই চাপে আজ ম্রিয়মাণ। কি করব বলুন, যে সমাজে বাস করি, সে সমাজের নিয়ম মেনে না চললেও শান্তি নেই, মেনে চলতেই হয় এবং নিয়মানুবর্তিতার দিকে সভ্য মহিলাদের একটু বেশি রকম প্রবণতাও আছে। এই প্রবণতার কথা চিন্তা করলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। মেয়েদের নিয়মনিষ্ঠা সমাজকে অর্থাৎ পুরুষকে খুশি করবার জন্যে ছাড়া আর কি? হায় রে, যার বিজয়িনী হওয়ার কথা, সেই হয়েছে আজ চাটুকার! আর সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার—সে যে চাটুকার, তা বোঝে না, জানে না, বুঝিয়ে দিলে রাগ করে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা জানেন? মেয়েরাই। সম্ভবত হিংসার তাড়নায় একজন আর একজনের শত্রুতা করে। পুরুষেরা মেয়েদের এই হিংসা-প্রবৃত্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতির মোহিনী অস্ত্রগুলোকে মেয়েরা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না করে, সে তার ব্যবস্থা করেছে; এবং সে ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, তা দেখবার ভার পড়েছে মেয়েদের ওপর। মা, দিদি, পিসী, জেঠীর দলই পাহারার কাজে সবচেয়ে দক্ষ।

আজ অকস্মাৎ আপনাকে এত কথা লেখবার কি কারণ ঘটল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ সবিস্ময়ে সে কথা ভাবছেন। কারণ একটা আছে বইকি। কিছুদিন পরে আপনিও হয়তো তা জানতে পারবেন। আমি বলতে পারলাম না। সেসব কথা বলতে আমার আত্মসম্মানে বাধে, যে কোন মেয়েরই বাধে, সেজন্যে সেগুলো আমার কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠিত। সুতরাং ও-প্রসঙ্গের ওপর আপাতত যবনিকাপাত করা যাক।

আপনার খবর কি, বলুন! মিষ্টিদিদির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। শুনলাম, রিনির পড়াশুনার তদারক ক'রে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে উঠেছেন। নিজেরও তদারক করবেন, একটু। কবিতা লেখা একেবারে বন্ধ ক'রে দিলেন নাকি? ও-দেশের সব কাগজ এ দেশে এসে পৌঁছোয় না। কোনও কাগজে যদি আপনার লেখা বেরোয়, সেটা আমার পাওয়া চাই কিন্তু। বোম্বেতে চাকচিক্যশালী ব্যক্তি আছেন অনেক, কিন্তু তাঁদের চাকচিক্য প্রায়ই লক্ষ্মীর প্রসাদে। ভারতীর বীণার খবর

বড় একটা মেলে না। মনের দিক থেকে একরকম নিঃসঙ্গ কারাবাস চলছে। মাঝে মাঝে এই নিস্তব্ধতা যদি ভঙ্গ করেন, কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বন্ধুর কোন চিঠি পেয়েছেন কি? অনেকক্ষণ বকবক ক'রে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি হয়তো নষ্ট করলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বকবক শুরু করেছিলাম, তা সফল হ'ল না দেখছি। মনের মেঘ একটুও কাটল না। সময় ক'রে উত্তর দেবেন তো? সময় যদি কম থাকে, ছোট উত্তর হ'লেও চলবে, কিন্তু একেবারে যেন নিরুত্তর হবেন না। ইতি—

সুরমা

পত্রপাঠ শেষ করিয়া শঙ্কর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে ধীরে ধীরে সুরমার মুখখানি সজীব হইয়া দেখা দিল, হাওড়া স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সুরমা বলিতেছে, চিঠি লিখবেন, ভুলবেন না কিন্তু। দুয়ারে টোকা পড়িতেই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। কপাট খুলিয়া দেখিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ একটি টেলিগ্রাম হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহারই টেলিগ্রাম। শঙ্কর খুলিয়া পড়িল, মায়ের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, বাবা অবিলম্বে বাড়ি যাইতে বলিয়াছেন।

১৯

গঙ্গার তীরে নির্জন বালুচরে একটি ছোট খড়ের ঘর। সেই ঘরের মধ্যে ইটের উনানে একটি ছোট মালসা চাপাইয়া ভনুটুর মেজকাকা ভাত রাঁধিতেছিলেন। ঘুঁটেগুলো সম্ভবত ভিজা ছিল, উনুন ভাল ধরিতেছিল না। সুতরাং যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া ভনুটুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েকটি সবল ফুৎকার চুল্লিমধ্যে প্রেরণ করিলেন। আশানুরূপ ফল ফলিল না। শিখার পরিবর্তে ধূমই প্রবলতর বেগে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আরক্ত সজল চক্ষু দুইটি মার্জনা করিতে করিতে মুক্তানন্দ অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুত বাহির না হইয়া উপায় ছিল না, সমস্ত ঘরটি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ঈষৎ-স্থূল ভক্ত-গোছের একটি

সুতরাং মুক্তানন্দের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্বেশ্বরবাবুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুক্তানন্দ সর্বেশ্বরবাবুর পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন।

ভন্টুর মেজকাকা ওরফে মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারীর আসল নাম উমেশচন্দ্র। ইনি ভন্টুর বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। বাল্যকাল হইতে উমেশের সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি অনাস্থা দেখা গিয়াছিল। লেখাপড়ার দিকে মন তো ছিলই না, অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারেও কোন আগ্রহ প্রকাশ পাইত না। ছেলেবেলায় নদীর ধারে, মাঠে অথবা বন-বাদাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোটা তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান বিলাস ছিল। আর কিছু নয়, একা একা টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। এই বেড়াইয়া বেড়ানোর নেশাতেই বোধ হয় এককালে তিনি এক যাত্রাদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যান এবং কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে কাটান। সেই সময়ে গান-বাজনাটা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার দলের জীবনও তাঁহার বেশিদিন ভাল লাগে নাই, তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসেন এবং মনোযোগ দিয়া আবার লেখাপড়া শুরু করেন। সেই মনোযোগের যুগেই তিনি এন্ট্রান্সটা পাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আরও হয়তো অগ্রসর হইতেন, যদি না তাঁহার ছোট ভাই রমেশ অকস্মাৎ বিসূচিকায় মারা যাইত। রমেশ মারা যাওয়ায় উমেশের জীবনে সহসা যেন ছন্দপতন ঘটিয়া গেল। উমেশ অনুভব করিলেন, সংসারে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন; সংসারের সাধারণ পথে স্বচ্ছন্দে তিনি চলিতে পারিবেন না। অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু অসাধারণ পথও তিনি সহজে খুঁজিয়া পাইলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাধারণ পথেই তাঁহাকে আরও কিছুকাল চলিতে হইল। একটা চাকরি জুটিল, বড়দার ছোট ছেলে ভন্টুটা ক্রমশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। বড়দার বড় ছেলে বিষ্ণুচরণের সাতিশয় সঙ্কীর্ণ সাংসারিকতার জন্য তাঁহাকে উমেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষত বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুচরণ যখন কয়েকটি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, তখন উমেশ আর তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যেই তাহাকে 'ঘুণ' 'কীট' প্রভৃতি নানা আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচরণ ও উমেশ সমবয়সী ছিলেন।

এইভাবেই চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পরিচয় হইলে উমেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, ভগবান ইঁহাকেই তাঁহার পারের কাণ্ডারী করিয়া পাঠাইয়াছেন।

উমেশ আকুল অন্তরে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইলেন। এই ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যদি সাধারণ শিষ্যলোলুপ ব্যবসায়ী গুরু হইতেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সহজে হইয়া যাইত, তিনি উমেশকে যথারীতি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সম্ভবত সত্যসত্যই সংসারবিরাগী বলিয়া তাহা পারিলেন না। অতিশয় সহজভাবে উমেশকে বলিলেন, আমি তো কিছুই জানি না, তোমাকে কি বলব ?

ইহাতে উলটা ফল হইল। উমেশের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল।

না, আপনাকে রাস্তা ব'লে দিতেই হবে, কিছু ভাল লাগছে না আমার।

কি ভাল লাগছে না ?

সংসার।

বেশ তো, সংসার ত্যাগ কর।

সে তো এখুনি করতে পারি, তার পর কি করব ?

কি করতে চাও ?

ভগবানের নাম করতে চাই।

বেশ তো, তাই কর না, বাধা কিসের ?

আপনি উপদেশ দিন।

ভগবানের অনেক নাম আছে, যেটা তোমার পছন্দ হয় বেছে নিয়ে তাই জপ কর কোন নির্জন স্থানে ব'সে। উপদেশ আর কি দেব ?

আপনি একটা দিন আমাকে।

মন্তর ? মন্তর নিয়ে কি হবে ? তুমি কি মনে কর, সংস্কৃত ভাষায় না বললে ভগবান তোমার কথা বুঝতে পারবেন না ? যিনি কীটের ভাষা বোঝেন, তিনি তোমারও ভাষা বুঝবেন।

সহসা উমেশ ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

আহা, ও কি কর? পা ছাড়। কি মুশকিল! কি চাও তুমি?

মুক্তি চাই, আনন্দ চাই—

উমেশ হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বেশ, মুক্তানন্দ নাম তোমার দেওয়া গেল, তুমি পছন্দমতই একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভগবানের নাম কর গিয়ে, মুক্তি আনন্দ—সব পাবে।

কি কি বিধিনিয়ম পালন করতে হবে ব'লে দিন তা হ'লে।

চক্ষুজল মুছিয়া উমেশ উন্মুখ হইয়া বসিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন, কিছু একটা না বলিলে নিস্তার নাই। অপরের মুখনিঃসৃত একটা উপদেশের ভেলা না পাইলে এ লোকটি নিছক নিজের জোরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে না। উমেশের অসহায় মুখচ্ছবি তাঁহাকে বিচলিত করিল। একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, মাছ-মাংসের প্রতি কি তোমার খুব বেশি লোভ আছে?

আজ্ঞে না, মোটেই নেই।

তা হ'লে নিরামিষ আহারই কর—স্বপাক।

ঘি দুধ?

ঘি দুধ খাবে বইকি, কিন্তু গব্য। গেরুয়াও পর, সুবিধে হবে।

কোথা যাব ব'লে দিন।

ঠাকুরের হাসি পাইতেছিল। তথাপি কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, কাশী যাও, সেখানে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের নাম জপ কর।

আবার কবে আপনার দর্শন পাব?

আমি কোথায় কখন থাকি তার তো ঠিক নেই, আপাতত আমি ভাগলপুর যাচ্ছি।

ঠিকানাটা আমাকে দিন?

একটু ইতস্তত করিয়া একটা ঠিকানা অবশেষে তিনি দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। উমেশও চাকরি পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে আত্মগোপন করিয়া মুক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাশীবাসের পর উমেশের ভবঘুরে মন আবার উসখুস করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বিশ্বেশ্বরের নাম

জপ করিয়া তিনি কেমন যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, ঠাকুরের নিকট নূতন একটা কিছু প্রেরণা লাভ করিবার আশায় তিনি ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, ঠাকুর যশোহরে গিয়াছেন, কিছুদিন পরে আবার ফিরিবেন। ভাগলপুরেই ফিরিবার কথা আছে। ভাগলপুরের গঙ্গার ঘাটে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া মুক্তানন্দ সহসা স্থির করিলেন, একবার কলিকাতাটা ঘুরিয়া আসা যাক, জনটুটা কেমন আছে কে জানে, অনেক দিন তাহার কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হইল। মুক্তানন্দের জীবনের এই অংশটুকুর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। মুক্তানন্দ দেখিলেন যে, সংসারের ব্যাপার যেরূপ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় তাঁহাকে রীতিমত সংসারী হইতে হইবে, না হয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। চলিয়া যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন এবং চুপিচুপি একদিন সরিয়া পড়িলেন। পুনরায় ভাগলপুরে আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুর আসিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না, আবার যদি জড়াইয়া পড়েন? ঠাকুরের কাছে গিয়াই বা কি হইবে? তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা তো করা হয় নাই, কাশীতে বসিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম একমনে জপ করিতে পারিলাম কই? কিন্তু অত ভিড়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করা যে অসম্ভব! ঠাকুর অবশ্য যে-কোন নির্জন স্থানে বসিয়া নামজপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মুক্তানন্দ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ছিলেন। সহসা দেখিলেন, একটা মাল-বোঝাই নৌকা ছাড়িতেছে। মুক্তানন্দ দাঁড়াইয়া মাঝিকে ডাকিলেন। মাঝি আসিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে কোন গ্রামের কাছে নদীতীরে একটু নির্জন জায়গায় নামাইয়া দেয়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। এখনও এ দেশে গৈরিক বসনের সম্মান আছে, ইহারই জোরে প্রায় নিঃসম্বল মুক্তানন্দ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং কিছুদূর গিয়া একটি জাহাজঘাটের নিকট বালুচরে নামাইয়া দিল। চরটি নির্জন।

কিন্তু কিছুদূরেই জাহাজঘাট ছিল এবং জাহাজঘাটে সর্বেশ্বরবাবু ছিলেন, সুতরাং মুক্তানন্দকে বেশিদিন নির্জনতা উপভোগ করিতে হইল না।

এই অবসরে ঠাকুরেরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। ঠাকুর আমাদের পূর্বপরিচিত মুকুজ্জেমশাই। মুকুজ্জেমশাইয়ের বন্ধনহীন চলা-ফেরা, সহজ সহৃদয় ব্যবহার, থান কাপড়, খালি পা, একমাথা বড় চুল, একমুখ দাড়ি, শিক্ষিতজনসুলভ কথাবার্তা, পরোপকার-প্রবৃত্তি—সমস্তটা মিলিয়া এমন একটা অসাধারণ যোগাযোগ, যাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনিবার্যভাবে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়। এই ভক্তের দল মুকজ্জেমশাইকে 'ঠাকুর' আখ্যা দিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু এই ভক্তদের বড় ভয় করেন এবং যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন। ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তিনি যা-হোক একটা ব্যবস্থা বাতলাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। নানা স্থানে মুকুজ্জেমশাইয়ের গতিবিধি, সুতরাং একটি ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমশ গজাইয়া উঠিয়াছে এবং বহমান নদীস্রোতে খড়-কুটার মতই সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই ইহাদের লইয়া নানা কৌতুক বিদ্রূপ করেন, ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু ইহারা নাছোড়বান্দা। মুকুজ্জেমশাইয়ের ভর্ৎসনা যত তীব্র হয়, ইহাদের ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া মুকুজ্জেমশাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ইহাদের সহিত অভিনয় না করিয়া উপায় নাই। ইহারা সত্য মানুষটাকে চায় না, একটা ছদ্ম কল্পমূর্তি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট। সুতরাং অভিনয় করিতে হয়। এই জাতীয় কোন ভক্তের সহিত দেখা হইলে (যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে দেখা না হয়) তিনি ঠাকুরোচিত গুরু-গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিলে তাহাকে যা-হোক একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেন। কাহাকেও বলেন—তেল মাখিও না; কাহাকেও বলেন—নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া এস; কাহাকেও কিছুদিন নির্বাক থাকিতে আদেশ করেন। তাহারাও যথাসাধ্য আদেশ পালন করে। ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন সদুপায় তিনি ভাবিয়া পান নাই।

মুকুজ্জেমশাইয়ের আসল কর্মক্ষেত্র নানাদুঃখপীড়িত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়, এবং সেখানেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

সর্বেশ্বরবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া মুক্তানন্দ ভোজ্য দ্রব্যগুলি পরিদর্শন করিলেন। সর্বেশ্বরবাবু আহারের ভাল যোগাড়ই করিয়াছিলেন। আলোচাল, মুগের ডাল, আলু, পটল, দুধ, ঘি।

ওটা গাওয়া ঘি তো?

আজ্ঞে না, ভঁয়সা,—তবে খুব উৎকৃষ্ট জিনিস।

হাজার উৎকৃষ্ট হোক, ভঁয়সা চলবে না।

যে আজ্ঞে।

গব্য ঘৃত পাওয়া যাবে না এখানে?

পাওয়া শক্ত। আচ্ছা, দেখছি তবু চেষ্টা ক'রে।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই এক বালতি জল, একটি ঘটি এবং গামছা স্বহস্তে বহিয়া আনিয়া বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, আপনি ততক্ষণ হাত-পাটা ধুয়ে ফেলুন। আমি ঘিয়ের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।

সর্বেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন, এবং মুক্তানন্দ হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

২০

করালীচরণ বক্সি তন্ময় হইয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। বামহস্তে জ্বলন্ত সিগারেট নিঃশব্দে পুড়িতেছিল। সিগারেটের ভস্মীভূত খানিকটা অংশ পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ঝাড়া হয় নাই—করালীচরণের ঝাড়িবার অবসর ছিল না। একাগ্রচিত্তে তিনি বর্জাইস অক্ষরে ছাপা উপন্যাসখানি গ্রাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছিল, একমাত্র চক্ষুটিও কখনও নিষ্প্রভ কখনও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেই সিগারেটের লম্বা পোড়া ছাইটা পুস্তকের উপর পড়িয়া গেল। করালীচরণ বিরক্তভাবে সিগারেটটার দিকে চাহিলেন এবং

তাহাতে গোটা দুই লম্বা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর ফুঁ দিয়া ছাইগুলি পুস্তকের পাতা হইতে পরিষ্কার করিতে গিয়া কিন্তু মুশকিলে পড়িয়া গেলেন, ফুৎকারে মোমবাতিটা নিবিয়া গেল।

বাই নারায়ণ!

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিতে গিয়া একটা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে ঠেকিল। ভন্টু যে ঠিকুজি-কোষ্ঠীগুলা সকালে দিয়া গিয়াছে, সেইগুলাই সম্ভবত তেমনই পড়িয়া আছে, খুলিয়া পর্যন্ত দেখা হয় নাই। দেশলাইটা গেল কোথা? বসিয়া বসিয়াই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিলেন, পাওয়া গেল না। বিরক্ত করালীচরণ অতিশয় অপ্রসন্নচিত্তে শেষে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মোড়ের ওই পানওয়ালীটার শরণাপন্ন হইতে হইবে শেষকালে—যদি অবশ্য তাহার দোকান এত রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে। কাজল-পরা, মাথায় ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো প্রৌঢ়া পানওয়ালীটাকে দেখিলে করালীচরণের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, অথচ এই পানওয়ালীটিই ছোটখাটো আপদে বিপদে তাঁহাকে সর্বদা উদ্ধার করে। ধারে সিগারেট দেশলাই তো সে ক্রমাগত দিয়া চলিয়াছে। ভন্টুর হাতে টাকাকড়ি। আগের মত যখন-তখন যেমন-তেমন ভাবে খরচ করিবার উপায় নাই। ওই পানওয়ালীটির কৃপায় তবু মাঝে মাঝে ফাঁকি দিয়া খানিকটা খরচ করিয়া ফেলিবার সুবিধা আছে। ধারে জিনিস দেয় এবং ভন্টুকে বাধ্য হইয়া তাহা শোধ করিতে হয়। করালীচরণ অন্ধকারেই পথ খুঁজিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, পানওয়ালী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি মুশকিল! সামান্য একটা দিয়াশলাইয়ের অভাবে পড়া হইবে না—সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে? নির্লোম ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তিনি গলির প্রান্তস্থিত পানওয়ালীর বন্ধ দোকানের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। ভন্টুর বাইসিক্‌লের ঘণ্টা শোনা গেল এবং ক্ষণপরেই ভন্টু আসিয়া সহাস্যমুখে বাইক্ হইতে অবতরণ করিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে যে?

আরে, আমি তো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, মিস মারগারেট কার্নিস ধ'রে শূন্যে ঝুলছে।

মিস্ মারগারেট !

দেশলাই আছে কি না আগে বলুন ?

আছে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক, আমার বাইকে লাইট নেই দেখে এক চাম চন্নু তাড়া করেছিল এখুনি, পালিয়ে এসেছি আমি, এখানে আবার না এসে পড়ে ব্যাটা। চলুন, ভেতরে ঢুকে পড়া যাক।

চন্নু মানে—পুলিস ? আপনি একদিন একটা কেলেঙ্কারি না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি। লাইট কিনে ফেলুন না একটা।

উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভনটু বাইকটাকেও টানিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতিটি জালিয়া দিল। বলিল, এ যে নিতান্ত অলিশ শুটুকু দেখছি।

সত্যই মোমবাতিটি অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল, বেশিক্ষণ টিকিবে বলিয়া মনে হয় না।

মোমবাতি জলিতেই করালীচরণ পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, ভনটুর কথা শুনিয়া বলিলেন, দেখুন তো, ও-দিকের তাকটায় একটা মোমবাতি আছে বোধ হয়।

আলমারির পাশেই যে ছোট তাকটি তিনি দেখাইলেন, সেটিতে কতকগুলি ধূলিধূসর পুস্তক হেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভনটু সেগুলি সরাইয়া দেখিতে লাগিল, করালীচরণ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়িতে লাগিলেন। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। ওরে বাপ রে—চাম গ্যানূঢঅ—

ভনটু সহসা চিৎকার করিয়া পিছাইয়া আসিল।

করালীচরণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, কি, হ'ল কি ?

ভীষণ টিকটিকি একটা—গোদা চাম—দেখুন দেখুন।

সত্যই বেশ বড় একটা টিকটিকি দেওয়ালের উপর উঠিয়া আসিয়াছিল। করালীচরণ বলিলেন, কেন বিরক্ত করছেন ওকে ? ও অনেক দিন থেকে

আছে আমার কাছে। আলোর কাছে এসে পোকামাকড় ধ'রে-ট'রে খায়, থাকে ওই বইগুলোর পেছনে, ছেড়ে দিন, বিরক্ত করবেন না ওকে।

করালীচরণ পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। ভন্টু মুখবিকৃতি করিয়া তাঁহাকে পিছন হইতে ভ্যাংচাইতে লাগিল। বেশ খানিকক্ষণ ভ্যাংচাইয়া অবশেষে ভন্টু সহজকণ্ঠে বলিল, কই, এখানে মোমবাতি তো নেই!

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া করালীচরণ বলিলেন, মোমবাতি যোগাড় করুন তা হ'লে একটা, এটা তো গেল।

ক পাতা বাকি আছে আপনার আর?

পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠাটি উলটাইয়া দেখিয়া করালীচরণ বলিলেন, বেশি নেই, আর পাতা কুড়ি আছে। তাহার পর ভন্টুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, অদ্ভুত বই, বাই নারায়ণ! শেষে করতে হবে এখুনি। যান, আপনি মোমবাতি নিয়ে আসুন। কথা বলবেন না, যান, সময় নষ্ট হচ্ছে আমার।

হ্রস্বায়মান মোমবাতিটির দিকে চকিতে চাহিয়া করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার পড়িতে শুরু করিলেন। ভন্টু চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া বিকৃতমুখে খানিকক্ষণ করালীচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে দুইটি আঙুলের মত সরু সরু মোমবাতি বাহির করিল—একটি লাল আর একটি সবুজ।

দেখুন তো, এতে হবে?

করালীচরণ কোনও উত্তর দিলেন না, গল্পে আবার তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

ভন্টু পুনরায় বলিল, দেখুন না, এতে হবে কি না!

বিরক্ত করালীচরণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আঃ, কি গোলমাল করছেন বার বার! ও মোমবাতি পেলেন কোথা থেকে? ভয়ঙ্কর সরু যে, কোথা থেকে পেলেন বলুন তো?

আমার কাছেই ছিল। বাইকে বাতি নেই, কাগজের ঠোঙার ভেতর এইগুলো জেলেই চালাতে হচ্ছে আজকাল।

করালীচরণ ভন্টুর শেষের কথাগুলি শুনিলেন কি না সন্দেহ, কারণ

আবার তিনি পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। ভন্টু স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অবশ্য পড়া বন্ধ করিয়া নূতন একটি মোমবাতি ধরাইবার প্রয়োজন হইল।

ভন্টু বলিল, আপনি এইটে জ্বালিয়ে পড়তে থাকুন, আমি আর একটা জ্বালিয়ে ততক্ষণ চট্‌ ক'রে কিছু বড় মোমবাতি কিনে আনি, ঘোর জ্বালে ফেললেন দেখছি আজকে।

করালীচরণ কোনও উত্তর না দিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভন্টু বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু যখন ফিরিল, তখন করালীচরণের উপন্যাস শেষ হইয়াছে। ভন্টু দেখিল, তিনি নির্বাণোন্মুখ মোমবাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ভন্টু আসিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। সেই স্বল্পালোকেই ভন্টু লক্ষ্য করিল, তাঁহার চক্ষুটি অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অক্ষিকোটরের মধ্যে একখণ্ড অঙ্গার যেন জ্বলিতেছে। ভন্টু কেমন যেন ভয় পাইয়া গেল।

মোমবাতি এনেছেন?

এনেছি।

একটু থামিয়া ভন্টু বলিল, আচ্ছা, আপনি রোজ মোমবাতি জ্বালান কেন বলুন তো? একটা লণ্ঠন কিনলে অনেক সস্তায় হয়।

সস্তা? হ্যাঁ, তা বোধ হয় হয়।

করালীচরণ আর কিছু বলিলেন না, নির্বাণোন্মুখ কম্পিত শিখাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু মোমবাতির প্যাকেট হইতে একটি মোমবাতি তাড়াতাড়ি ধরাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কেমন সুন্দর দেখুন তো!

নূতন শিখাটির পানে করালীচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, আপনি আরব্য উপন্যাস পড়েছেন ভন্টুবাবু?

পড়েছি।

তাতে গোড়াতেই আছে, শাহরিয়ার নামে এক স্থলতান রোজ একটা মেয়েকে বিয়ে করত, আর রোজ তাকে মেরে ফেলত। মনে আছে?

মনে আছে বইকি।

আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমিও তাই করতাম। সে ক্ষমতা নেই, তাই তার বদলে রোজ নতুন নতুন মোমবাতি জ্বালাই। একটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা জ্বালাই, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলে আর একটা। সারাজীবন ক্রমাগত মোমবাতি জ্বালিয়ে যাব একটার পর একটা, একটার পর একটা—

লণ্ঠন জ্বালালে একটু সস্তা হয়, তাই বলছিলাম।

লণ্ঠন! পুরনো কালিঝুলি-মাখা একটা লণ্ঠন সামনে জ্বালিয়ে আজীবন কাটিয়ে দেব সস্তায় হবে ব'লে? বলেন কি আপনি?

করালীচরণের কথাবার্তা ভন্টুর ঠিক বোধগম্য হইতেছিল না। সে মোমবাতি-প্রসঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করা নিরাপদ মনে করিল না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যে কুষ্ঠি দুটো দিয়ে গিয়েছিলাম, দেখেছেন? টাকা দিয়ে দিয়েছে তারা।

কই টাকা? দিন।

করালীচরণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ভন্টু পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, সব নেবেন নাকি? পাস-বুকে জমা করতে হবে না?

আজ থাক্, সমস্ত দিন মদ খেতে পাই নি। আপনি কাল যেটুকু দিয়ে গেলেন, সকালেই শেষ হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে তাই ও-বইটা নিয়ে বসতে হ'ল।

কি বই ওটা?

ডিটেকটিভ আর পর্নোগ্রাফি কম্বাইণ্ড্। চমৎকার নেশা হয়, ওয়াণ্ডারফুল!

ভন্‌টু আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, দশটা টাকা আমাকে দিন, আপনার কাছে থাকলেই তো খরচ হয়ে যাবে।

না, আজ থাক্‌।

করালীচরণ টাকাগুলি তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন, যেন ভন্‌টু ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর অকস্মাৎ ভন্‌টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার পাঁচ শো টাকার আর বাকি কত? কত জমল?

এ রকমভাবে খরচ করলে আর জমবে কি ক'রে? সেদিনও তো আপনি পঁচিশটা টাকা নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, আমাদের প্রোটোটাইপ গ্রহশান্তির জন্যে কিছু খরচ করতে চায়, কত পড়বে বলুন তো?

টাকা পঁচিশেক।

তাই ব'লে দেব তা হ'লে। হবে কিছু?

কিছু হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনি তা হ'লে আজ যান ভন্‌টুবাবু, কাল আমি কুষ্ঠি দুটো ঠিক ক'রে রাখব।

আচ্ছা।

ভন্‌টু বাহিরে আসিয়া বাইকের উপর সওয়ার হইল।

ভন্‌টু চলিয়া গেল। করালীচরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা আলোটা ফুঁ দিয়া নিবাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ হনহন করিয়া হাঁটিবার পর অবশেষে তিনি যে পল্লীতে উপনীত হইলেন, তাহা বেশ্যা-পল্লী। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, স্বল্পালোকিত গলিটিতে বিশেষ কেহ ছিল না। একটা খোলার ঘরের সামনে একটিমাত্র রূপোপজীবিনী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। করালীচরণ সোজা গিয়া তাহারই সম্মুখীন হইলেন।

মেয়েটি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

করালীচরণ স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে আবার চলিতে শুরু করিলেন। দোতলার একটা ঘর হইতে গান

বাজনা হাসির হর্‌রা সহসা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিল, এক চক্ষু তুলিয়া করালীচরণ একবার আলোকিত জানালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিলেন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকক্ষণ হাঁটিয়া করালীচরণ অবশেষে একটা হোটেলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সহসা অনুভব করিলেন, অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

খানিকটা মাংস আর রুটি দিন তো।

কতখানি মাংস, ক পীস রুটি?

প্রচুর দিন, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে।

এক প্লেট মাংস আর চার পীস রুটি দিই?

দিন। মদ আছে?

আনিয়ে দিতে পারি।

হুইস্কি আনিয়ে দিন এক বোতল।

টাকা লইয়া একজন হুইস্কি আনিতে চলিয়া গেল এবং একটি বালকভৃত্য মাংস ও রুটি আনিয়া করালীচরণের সম্মুখে ধরিতেই করালীচরণ গপগপ করিয়া গিলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সেই পানওয়ালীটিকে মনে পড়িল। সেই কাজল-পরা, মাথায়-ফুল-গোঁজা, দাঁতে-মিশি-লাগানো নীলাম্বরী-কাপড়-পরা বুড়ীটা—ছুঁড়ী সাজিয়া লোক ভুলাইতে চায়! অসহ্য! ভাবিলেও গায়ে জ্বর আসে। জ্বর আসুক, কিন্তু ওই বোধ হয় একমাত্র নারী, যে করালীচরণকে একটু মমতার চক্ষে দেখে। বাকি সবাই তো তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেহই তো তাহাকে আমল দিতে চায় না, টাকা দিতে চাহিলেও প্রত্যাখ্যান করে—এমন কি বেশ্যারাও।

বাই নারায়ণ!

হিংস্র বুভুক্ষু শ্বাপদের ন্যায় করালীচরণ মাংসের হাড়গুলা কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

৯

ভন্টু সেদিন অত রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, দত্ত মহাশয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের মুদীর দোকান আছে এবং সেই

দোকান ভন্টুর সংসারে ধারে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়িয়াছে। ভন্টু আজ নিশ্চয়ই কিছু দিবে বলিয়াছিল, সেই আশায় দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন।

দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া ভন্টু করজোড়ে বলিল, বড় লজ্জিত হলাম দাদা, বিশ্বাস করুন, কিছুতেই যোগাড় করতে পারলাম না। আজও এক জায়গা থেকে নির্ঘাত পাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সব হোনুডল-মোনুডল হয়ে গেল।

দত্ত মহাশয় নীরবে সমস্ত শুনিলেন এবং নীরবে উঠিয়া গেলেন।

বউদিদি মুখ বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, দত্ত কি বললে?

চুপসে গেল।

ওর টাকাটা কাল যেমন ক'রে হোক দিয়ে দাও বাপু তুমি। না হয় আমার বালাটা কোথাও বাঁধা দাও।

গম্ভীর গাড্ডা মিস্টার বিড্‌ডিকার, দুটো 'ড' নয়, পাঁচ-সাতটা 'ড'। বালাটাকে দকুচে আর লাভ কি? চল, খেতে দেবে চল—ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। আগে গিলি, তার পর অন্য কথা।

রান্না তো হয়ে গেছে, এস না।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

২১

শঙ্কর বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, মায়ের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহার পাগলামি এত বাড়িয়াছে যে, তাঁহাকে একটা ঘরে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাধ্য হইয়াই বাঁধিতে হইয়াছে, কারণ তিনি এমন সব কাণ্ড করিতেছিলেন যে, বাঁধিয়া রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। শঙ্কর দেখিল, তাহার বাবার মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। শুনিল, মা নাকি উন্মত্ত অবস্থায় একটা বাসন ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। শঙ্কর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল, বন্দী-অবস্থাতেও মা বিড়বিড় করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন।

মা!

কোন সাড়া নাই, উন্মাদিনী অস্ফুটভাবে ক্রমাগত কি বলিতেছে!

মা, ও মা! দেখ, আমি এসেছি।

শঙ্কর হেঁট হইয়া পদধূলি লইল।

দূর হ, দূর হ, দূর হ—যত সব পাপ আপদ বালাই—দূর হয়ে যা সব—

শঙ্করের বাবা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, শঙ্কু, চ'লে আয় তুই, ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে ডাক্তারে মানা করেছে। ওতে পাগলামি বাড়ে শুধু। বেরিয়ে আয়।

শঙ্কর বাহির হইয়া আসিল। তাহার অমন মা এই হইয়া গিয়াছে!

কোন্ ডাক্তার দেখছে?

কোন ডাক্তার বাকি নেই, এ অঞ্চলে সবাই দেখেছে, এমন কি সিভিল সার্জন পর্যন্ত।

কি বলছেন তাঁরা?

বলবেন আর কি? কেউ বলছেন ডব্লিউ. সি. রায়, কেউ দিচ্ছেন ব্রোমাইড, কেউ বা আর কোন ঘুমের ওষুধ। ওই টেম্পরারি কিছু ফল হয়, তারপর যে-কে সেই। কবরেজিও করেছি—কিচ্ছু হয় নি।

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার বাবা বলিলেন, চল, বাইরে চল—আরও কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বাহিরের ঘরে আসিয়া শঙ্করের বাবা একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং আর একটি চেয়ার দেখাইয়া শঙ্করকে বলিলেন, ব'স্ তুই, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেবে আর কি হবে বল্, সবই অদৃষ্ট।

শঙ্কর নীরবে উপবেশন করিল।

শঙ্করের পিতা অম্বিকাচরণ রিটায়ার্ড ডেপুটি, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, গম্ভীর রাশভারী লোক। দেখিলেই সম্ভ্রম হয়, মনে হয়, এ লোকটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলিবে না। কোথাও বসিলে পা দোলানো তাঁহার স্বভাব, কিন্তু তাহাও এমন গম্ভীর চালে করিয়া থাকেন যে, ছন্দপতন হয় না, হাকিমী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেশ মানাইয়া যায়।

চেয়ারে বসিয়া তিনি গম্ভীরভাবে পা দোলাইতে লাগিলেন। শঙ্কর নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে অম্বিকাবাবু একটা মোটা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরবেই ধূমপান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে?

ভালই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অম্বিকাচরণই পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, তোমাকে টেলিগ্রাম ক'রে আনলাম এইজন্তে যে, তুমি যদি পার কলকাতায় একটা বাসা ঠিক কর গিয়ে। নিয়ে যাবার মত অবস্থা হ'লে কলকাতাতেই নিয়ে যাই ওকে, সেখানে নানারকম স্পেশালিস্ট্ আছেন, দেখা যাক একবার চেষ্টা ক'রে।

চুরুটে দুই-একটা টান দিয়া পুনরায় বলিলেন, আক্ষেপ থাকে কেন?

শঙ্করের বলিবার কিছু ছিল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চুরুটের ছাইটা সন্তর্পণে ঝাড়িয়া অম্বিকাবাবু বলিলেন, আরও একটা কথা বলবার আছে তোমাকে। নানা জায়গা থেকে তোমার বিয়ের প্রস্তাব আসছে, আমি তাড়াতাড়ি তোমার বিয়েটাও দিয়ে দিতে চাই। কারণ, আমার ব্লাডপ্রেসারের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তা ছাড়া বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন দেরি করার কোন মানে হয় না। আরও একটা কথা আছে, দু-একজন ডাক্তার বলেছেন যে, বউয়ের মুখ দেখে ওঁর পাগলামি খানিকটা কমবে, অন্তত সম্ভাবনা আছে।

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, এই অবস্থায় এখন বিয়ে!

ডাক্তারদের মতে অবস্থা পরিবর্তনের জন্তেই বিয়ের দরকার।

অম্বিকাবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারে আরও একটা টান দিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, তা ছাড়া, বেশি বয়সে বিয়ে করার আমি পক্ষপাতীও নই।

শঙ্করের মনে রিনির মুখখানি ভাসিয়া উঠিল; মনে হইল, তাহার সচকিত নয়ন দুইটি যেন ক্ষণিকের জন্ত তাহার পানে চাহিয়া আবার আনমিত হইল।

শঙ্কর বলিল, এখন আমি বিয়ে করতে পারব না।

অম্বিকাবাবুর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি চোখ তুলিয়া পুত্রের

মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের কালে বাপ-মায়া বিয়ে দেওয়ার সময় ছেলেদের মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। আজকাল আমরা ছেলেদের সে সম্মানটা দিয়েছি; এটাও প্রত্যাশা করি যে, ছেলেরাও আমাদের সম্মান রাখবে।

শঙ্কর বলিল, এতে সম্মানের কোন প্রশ্নই উঠছে না।

উঠছে বইকি। আমি তোমাকে আদেশ না ক'রে অনুরোধ করলাম, সে অনুরোধ তুমি যদি না রাখ, তা হ'লে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বইকি।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এত বড় একটা দায়িত্ব নেবার আগে আমি একটু ভেবে দেখতে চাই। সময় দিন আমাকে কিছু।

আবার রিনির মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি চক্ষু বুজিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিগারটাতে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন।

ভেবে দেখতে চাও, দেখ। দায়িত্বের কথা নিয়ে আস্ফালন করাটা আজকাল তোমাদের একটা ফ্যাশান হয়েছে বটে, আসলে কিন্তু ওটা অন্তঃসারশূন্য ডেঁপোমি। বিয়ে করার দায়িত্ব যে কতখানি, আর সে ভার বহন করবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না—এটা ভাল ক'রে ভেবে দেখবার বয়স অথবা অভিজ্ঞতা তোমার হয় নি।

যখন হবে, তখনই বিয়ে করব।

যখন হবে তখন বিয়ে করাটা নিরর্থক—It is no good marrying at fortyfive or fifty. তার আগে অভিজ্ঞতা হয় না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অম্বিকাবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আসলে আজকালকার ছেলেরা অতিশয় স্বার্থপর। তাদের মতলবটা, হালকা মেঘের মত গায়ে ফুঁ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব, যা রোজগার করব নিজের সুখের জন্যেই সেটা খরচ করব, স্ত্রীপরিবারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাব না। তারা ভুলে

যায় কিংবা ভুলে থাকতে চায় যে, যে সমাজ তাদের মানুষ করেছে, সেই সমাজের প্রতিও তাদের একটা কর্তব্য আছে। সামান্য কুলি-মজুরও রোজগার ক'রে তাদের স্ত্রীপরিবার পালন করছে। দুঃখ-ভোগ করছে তা স্বীকার করি, কিন্তু দুঃখ-ভোগ করাটাও যে একটা ট্রেনিং, একটা প্রয়োজনীয় জিনিস, স্টিমুলাস ফর স্ট্রাগ্‌ল—তোমরা আজকাল সেটা এড়িয়ে চলতে চাও।

কুলি-মজুরদের মত জীবন-যাপন করাটা কি বাঞ্ছনীয় ?

তা তো আমি বলছি না। আমি বলছি, দুঃখের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রাম কর। ভীরুর মত পালিয়ে যাওয়াতে কোন বাহাদুরি নেই। বড়াই কর—লড়াই ক'রে জেতো। হারলেও লজ্জা নেই। কিন্তু যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা কোন কালেই গৌরবের নয়। আজকাল তোমরা তাই করছ।

শঙ্কর কোনও উত্তর দিল না।

অম্বিকাচরণ চোখ বুজিয়া সিগারে টান দিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, বেশ, ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখ। তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আমার শরীর ভাল নয়, তোমার মায়ের অবস্থা তো দেখছই—বাড়িতে কোন দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও নেই যে, আমাদের দেখাশোনা করে। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরই তোমার মায়ের পাগলামি শুরু হয়েছে, তোমার বিয়ে হ'লে হয়তো সেরেও যেতে পারে—কিছু বলা যায় না। সমস্ত জিনিসটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, টেক টাইম দেয়ার ইজ নো হারি। আচ্ছা, যাও এখন। কয়েকখানা চিঠি লিখতে হবে আমাকে।

শঙ্কর উঠিয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ির ভিতরে গিয়াই সে শুনিতে পাইল, মা চিৎকার করিতেছেন—শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশাঙ্ক এসেছে। দেখতে পাচ্ছিস না তোরা, চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি সব ?

শশাঙ্ক শঙ্করের ছোট ভাই, কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে।

শঙ্কর একা রাত্রে বিছানায় শুইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার কথাগুলি যুক্তিহীন নয়, কিন্তু রিনি ? রিনিকে যে সে ভালবাসিয়াছে ! যদিও মুখে সে রিনিকে কিছু বলে নাই, কিন্তু রিনি কি বোঝে না ? একটুও

না? অসম্ভব। তাহার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার একটু আভাসও কি রিনি পায় না? তাহার মনে সামান্যতম স্পন্দনও কি জাগে নাই? নিশ্চয়ই জাগিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর তাহা জানিবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করা তো অসম্ভব। অথচ—। হঠাৎ দারুণ একটা চিৎকারে শঙ্করের চিন্তাস্রোত ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাগলিনী চিৎকার করিতেছেন। সে চিৎকার এত করুণ, এত তীব্র, এত মর্মস্পর্শী যে, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, চতুর্দিকের অন্ধকার যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে, নানারূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। অদ্ভুত সব মূর্তি!...সহসা চিৎকারটা থামিয়া গেল; চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। সহসা দালানের ঘড়িটার শব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, দূরে চৌকিদার হাঁকিয়া গেল। শঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সে যেন এ বাড়ির কেহ নহে, কোন আগন্তুক যেন হঠাৎ আসিয়া এক রাত্রির জন্য আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, কাল সকালেই উঠিয়া চলিয়া যাইবে। পাশ-বালিশটা জড়াইয়া ঘুমাইবার জন্য সে ভাল করিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম তাহার আসিল না। মুদিত নয়নের সম্মুখে রিনি আনত নয়নে সারারাত বসিয়া রহিল।

২২

দ্রুতগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় বোস সাহেব বসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, কষ্ট হইবার কথা নয়, তথাপি বোস সাহেবের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। তিনি দিল্লী হইতে ফিরিতেছিলেন, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছিলেন। যে সাহেবটিকে তোয়াজ করিতে তিনি গিয়াছিলেন, নানারূপ তোয়াজ সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। এমন একটিও আশাপ্রদ কথা সাহেবের মুখ দিয়া নির্গত হয় নাই, যাহার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায়; অথচ তাঁহার ধারণা ছিল, ক্যামেরন সাহেব...

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বোস সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

মিস্টার এল. কে. বোস (ললিতকুমার বোস) বাঙালী-সমাজের আদর্শ পুরুষ। বরাবর ভাল করিয়া পরীক্ষা পাস করিয়াছেন, সুপারিশ এবং বিদ্যার জোরে ভাল চাকুরি যোগাড় করিয়াছেন, চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কলা-কৌশল শিখিয়াছেন, মোটা রকম পণ লইয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আনিয়াছেন, ইহার মধ্যে কলিকাতা শহরে খানিকটা জমি কিনিয়া ফেলিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন দুই-একজনের চাকরি করিয়া দিয়াছেন, করেন নাই কি? সুতরাং পরিচিত-মহলে নিদারুণ সাহেবিয়ানা সত্ত্বেও বোস সাহেবের নামে সকলের মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই জাগে। গোপনে গোপনে দুই-চারিজন বোস সাহেবের সাহেবিয়ানা লইয়া যে টিটকারি দেন না তাহা নয়, কিন্তু টিটকারিতে বোস সাহেবের কিছু আসে-যায় না। সেজন্যও বটে এবং সাহেবিয়ানাটা তাঁহার চাকরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ—এই বিশ্বাসের ফলেও বটে, অধিকাংশ লোকই তাঁহার সাহেবিয়ানা লইয়া আর মাথা ঘামায় না। বোস সাহেব একজন বড় অফিসার, এই মহিমার জ্যোতিতেই সকলের চোখ ধাঁধিয়া আছে। তাঁহার চারিত্রিক নানা দোষও তাই মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই বোস সাহেব উদ্যমশীল ব্যক্তি, নিত্য নব উপায়ে চাকুরির উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন, শাসন-যন্ত্রের কোন্ চাকাটিতে কখন কোন্ তৈল নিষেক করিলে সুফল ফলিবে—ইহা আবিষ্কার করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহাতে তিনি খানিকটা সফলকাম হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শৈলকে তিনি সুখী করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা নিতান্তই অবান্তর প্রশ্ন, তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না, তিনি নিজেও না। শৈলকে তিনি মিসেস এল. কে. বোসের মর্যাদা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট নয় কি? ইহার অধিক আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, জীবনে তাঁহাকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, বিবাহিত স্ত্রীকে লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করিবার অবসরই বা কোথায়?

একটা ছোট স্টেশনে এক মিনিট থামিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চলিতে শুরু করিল। অনেক দূরে তাহাকে যাইতে হইবে, অনেক স্টেশন পার হইতে হইবে, ছোট স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিবার তাহারও অবসর নাই।

এক্সপ্রেস ছুটিতে লাগিল।

মিস বেলা মল্লিক তন্ময় হইয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। গাহিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন গানখানা—মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো। এই পুরাতন গানটাই বেলা মল্লিকের কণ্ঠে নূতন লালিত্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশের বাড়িতে মুগ্ধ লক্ষ্মণবাবু খবরের কাগজটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহা শুনিতেছিল। তাহার তন্ময় নিস্পন্দ ভাবটা বেলাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছে। সেদিন বেলা একটি পত্রযোগে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্মণবাবুকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোষ্ঠীর অমিল সত্ত্বেও বিবাহ দিবার মত দৃঢ় মনোভাব তাঁহার দাদার অর্থাৎ প্রিয়বাবুর নাই, তাঁহার নিজেরও এ সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে, সুতরাং বিবাহ হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্মণবাবু যেন অনুগ্রহ করিয়া এ প্রস্তাব আর না উত্থাপিত করেন, কারণ তাহা এ ক্ষেত্রে অকারণ ক্ষোভেরই সৃষ্টি করিবে। প্রিয়বাবুও বেলার জেদে পড়িয়া এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণবাবুকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কুষ্ঠির যখন মিল হচ্ছে না, তখন আর উপায় কি? কিন্তু মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন, আহা, এমন পাত্রটা ফসকাইয়া গেল! বেলাটা যে দিন দিন কি হইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই।

গানটা খানিকক্ষণ গাহিয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অঙ্গভঙ্গী-সহকারে গা ভাঙিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর এস্রাজখানা পাড়িয়া বাজাইতে লাগিলেন। ওই গানখানাই বাজাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণবাবু আর বাতায়নে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গেল।

বেলা বাজাইতেছেন, এমন সময় প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য বেচারীকে অনেকটা দূর হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁহাকে চাকরি ছাড়া ইন্সিওরেন্সের দালালিও করিতে হয়। একটি শিকারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সহসা সঙ্গীতনিরতা বেলাকে দেখিয়া

তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, আমি খাটিয়া খাটিয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিলাম, আর এ দিব্যি বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছে! বিবাহ করিবার নাম নাই, পাত্র আনিলে কোন না কোন ছুতায় সেটাকে তাড়াইয়া দিতেছে। মেয়েমানুষ বলিয়া মাথা কিনিয়াছে একেবারে।

প্রিয়নাথ মল্লিকের সহসা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সম্প্রতি ভগ্নীর চালচলন ভাবগতিক এমন একটা বেপরোয়া মূর্তি ধারণ করিয়াছে যে, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, তোর মতলবটা কি, বল্ দেখি খুলে?

ভ্রূভঙ্গীসহকারে বেলা উত্তর দিলেন, কিসের মতলব?

কিসের আবার, বিয়ে-থা করবি, না, না?

সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন তিনি।

বেলা ছড়টা পাশে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন? তুমি নিজে বিয়ে কর না, যদি ইচ্ছে হয়। কর না, বেশ আমার একটা সঙ্গী হোক।

প্রিয় মল্লিক ব্যঙ্গতিক্ত একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি বিয়ে করব! এই কলকাতা শহরে একটা অবিবাহিত বোন ঘাড়ে নিয়ে একশো টাকা মাইনেয় বিয়ে করা চলে? বললেই হ'ল—বিয়ে কর!

গ্রীবা বাঁকাইয়া অধর দংশন করিয়া বেলা বলিলেন, ঘাড়ে ক'রে মানে? আমিই কি তোমার বিয়ের পথে বাধা নাকি?

তাঁহার চক্ষু দুইটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন, সে কথা কি এখনও বুঝতে পার নি? আর কিছু না হোক, তোমার বুদ্ধির উপর আমার কিঞ্চিৎ আস্থা ছিল।

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, বেশ, তুমি পাত্রী দেখ, আমি তোমার ঘাড় থেকে এখুনি নেবে যাচ্ছি। এ কথাটা আগে বললে আগেই ব্যবস্থা করতাম, মিছামিছি তোমার সময় নষ্ট হ'ল

এতদিন।—এস্রাজটা কোল হইতে নামাইয়া বেলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কোন কথা না বলিয়া সম্মুখের আলনাটা হইতে নিজের কাপড়-জামা প্রভৃতি টানিয়া নামাইয়া পাট করিতে শুরু করিয়া দিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, এর মানে?

বেলা কোন উত্তর দিলেন না। একটির পর একটি কাপড় পাট করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এর মানে কি?

তথাপি বেলা নিরুত্তর।

একটু বিব্রতকণ্ঠে প্রিয়নাথ আবার বলিলেন, হঠাৎ কাপড় গোছাবার মানে কি, আমি জানতে চাই।

বেলা ঘাড় ফিরাইয়া নির্বিকারভাবে বলিলেন, কাপড়গুলো কি তা হ'লে রেখেই যাব? তুমি এগুলো কিনে দিয়েছ অবশ্য, ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পার।

ইচ্ছে করলে কেড়ে নিতে পারি!

বিহ্বল প্রিয়নাথ যন্ত্রচালিতবৎ কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

পার বইকি। বেশ, নেব না এগুলো, রইল।

দ্রুতপদে বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হাতে লইলেন শুধু ছোট হাতব্যাগটা। স্তম্ভিত প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর উঠিয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, মেয়েটা সত্য সত্যই গেল কোথা! কিছু দেখা গেল না। তখন তিনিও রাস্তায় বাহির হইলেন। দেখিলেন, দূরে দ্রুতপদে বেলা চলিয়াছেন। ঘাড় ফিরাইয়া প্রিয়নাথকে দেখিয়া ডান দিকের গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রিয়নাথ কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণবাবু বাহির হইয়া আসিল এবং সস্মিত মুখে প্রশ্ন করিল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন যে এমন ক'রে? আসল কথাটা প্রিয়নাথ বলিতে পারিলেন না। কেমন যেন বাধিয়া গেল। বলিলেন, দেখছি, যদি রিক্‌শা-টিক্‌শা একটা পাওয়া যায়।

কোথাও বেরুবেন নাকি?

মনে করছি তো।

প্রিয়বাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণবাবুও এ-দিক ও-দিক চাহিয়া অকারণে সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেটি কেমন আছে আজ?

লক্ষ্মণবাবুর কোন উৎকণ্ঠা ছিল না, এমনিই জিজ্ঞাসা করিল। সামনের বাড়ির ভদ্রলোক জানালার সামনে বসিয়া কামাইতেছিলেন, আবছা-গোছের একটা উত্তর দিলেন, চলছে।

উপরের বাতায়ন হইতে বেলাকে বাহির হইয়া যাইতে লক্ষ্মণবাবু দেখিয়াছিল, সুতরাং শীঘ্র আর সঙ্গীতের সম্ভাবনা নাই। সে বাইকটি বাহির করিয়া দোকানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ দ্রুতপদে হাঁটিয়া বেলাকে অবশেষে গতিবেগ মন্থর করিতে হইল। শিয়ালদহের জনবহুল মোড়টাতে দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইবার কি করা যায়? এক রিনিদের বাড়ি ছাড়া চেনাশোনা আর কোন স্থান তো কলিকাতা শহরে নাই! কিন্তু রিনিদের বাড়ি যাইতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল, সেখানে গিয়া কি বলিবেন? তাহা ছাড়া, তাঁহার দাদা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া খোঁজ করিবেন এবং অবশেষে একটা নাটকীয় ব্যাপার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। এরূপ অপমানের পর আর তিনি দাদার আশ্রয়ে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবেন না, তাহাতে অদৃষ্টে যত কষ্টই থাক্। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। রোদও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে। শিয়ালদহের বড় ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে বারোটা বাজিয়াছে, ক্ষুধারও একটু উদ্রেক হইয়াছে। সহসা বেলার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে একটু পরীক্ষা করিয়া! হাতব্যাগটা খুলিয়া দেখিলেন, আনা তিনেক পয়সা রহিয়াছে। উহাতেই হইবে। একটু আগাইয়া গিয়া বড়-গোছের একটা

দোকানে বেলা উঠিলেন এবং স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, দয়া ক'রে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে দেবেন কি?

নিশ্চয়, এই যে আসুন।

দোকানদার ভদ্রলোক ভদ্রতার আতিশয্যে টুলটা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ফোনটা আগাইয়া দিলেন। নিকটেই ডাইরেক্টরিখানা ছিল, বেলা অপূর্ববাবুর আপিসের ফোন-নম্বরটা বাহির করিয়া অপূর্ববাবুকে ফোন করিলেন। বলিলেন, তিনি বড় বিপদে পড়িয়া শিয়ালদহের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ববাবুকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি যদি অবিলম্বে একবার আসিতে পারেন বড় ভাল হয়, না আসিলে বড় মুশকিলে পড়িতে হইবে।

অপূর্ব বলিলেন, খুব চেষ্টা করছি আমি যেতে, ছুটি পেলে নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

ছুটি নিন যেমন ক'রে হোক।

দেখি।

ফোনটি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বেলা দেবী ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে দুই আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু দোকানী ভদ্রলোক কিছুতেই তাহা লইতে রাজী হইলেন না। বেলা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অপূর্ববাবুর প্রতীক্ষায় ট্রাম-লাইনের ধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে শিয়ালদহের মোড়ে আসিতে একটু সময় লাগে, বেলা অলস-ভাবে দাঁড়াইয়া প্রাচীরগাত্রের এবং ল্যাম্পপোস্টের উপর যে বিজ্ঞাপনগুলি ছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলেন। হরেকরকমের নানাবিধ বিজ্ঞাপন, অধিকাংশই বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত। দেখিতে দেখিতে একটি বিজ্ঞাপন সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটি ছোট মেয়েকে গান শিখাইবার জন্য ও পড়াইবার জন্য একটি শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক। দুই বেলা পড়াইতে হইবে, বেতন যোগ্যতা অনুসারে। আবেদনকারিণী যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বেলা অধর দংশন করিয়া খানিকক্ষণ বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর রাস্তা পার হইয়া সেই ফোনওয়ালা দোকানে গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করতে এলাম। এক টুকরো কাগজ আর একটা পেনসিল যদি দেন—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ কাগজ-পেনসিল দিলেন। বেলা কাগজে ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া হাতব্যাগে সেটি রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়া ট্রাম-লাইনের ধারে গিয়া অপূর্ববাবুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই অপূর্ববাবু আসিয়া পড়িলেন। ট্রাম হইতে নামিয়া কোঁচাটি ঝাড়িয়া পাঞ্জাবির পকেটে পুরিতে পুরিতে মিহি গলায় মৃদু হাসিয়া অথচ একটু চিন্তিত কণ্ঠে অপূর্ববাবু বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

ব্যাপার গুরুতর।

তার মানে?

তার মানে, দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, রাস্তায় এসে তাই দাঁড়িয়েছি, আপনি এখন একটা ব্যবস্থা করুন আমার।

অপরূপ গ্রীবাভঙ্গীসহকারে অধর দংশন করিয়া বেলা অপূর্ববাবুর পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ববাবু ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। আপিসে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ এ কি কাণ্ড!

দাদা তাড়িয়ে দিয়েছেন? বলেন কি?

বলছি তো। কেন তাড়িয়ে দিয়েছেন, কি বৃত্তান্ত পরে শুনবেন। এখন আমার একটা দাঁড়াবার জায়গা ঠিক করুন তো আগে। আপনি যে মেসে থাকেন, সেখানে সুবিধে হতে পারে কিছু? প্রস্তাবটার অসমীচীনতায় বেলা নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পুনরায় বলিলেন, বলুন না, সেখানে আমার জায়গা হতে পারে কি না!

অপূর্ববাবু পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটা মুছিয়া ফেলিলেন ও আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমার মেসে? মানে, সেটা একটু দৃষ্টিকটু হবে না? মানে, অন্য কিছু নয়, অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু আবার ঘামিতে লাগিলেন।

বেলা পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, আমার সম্বলের মধ্যে মাত্র তিন আনা রয়েছে এই ব্যাগে। তা না হ'লে আপাতত একটা হোটেলে উঠলেও চলত, কিন্তু—

অপূর্ববাবু পুনরায় মুখটা মুছিয়া বলিলেন, মাসের শেষ কিনা, আমারও হাত একদম খালি, মানে—

কুটিল হাসি হাসিয়া বেলা বলিলেন, তা ছাড়া সেদিন রিনিকে অমন দামী দুখানা বই কিনে দিতে হ'ল তো। শঙ্করবাবুকে সে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি ?

না, এখনও দেওয়া হয় নি, দেখাই হয় না ভদ্রলোকের সঙ্গে।

এমন সময় অভাবিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

রোক্‌কে—রোক্‌কে—

চলন্ত ট্রাম হইতে শঙ্কর লাফাইয়া পড়িল।

বিস্মিত বেলা বলিলেন, এ কি, শঙ্করবাবু যে! অনেক দিন বাঁচবেন আপনি, এইমাত্র আপনার নাম হচ্ছিল। হঠাৎ এখানে কোথা থেকে ?

বাড়ি গিয়েছিলাম, এইমাত্র নাবলাম ট্রেন থেকে। হস্টেলে ফিরছিলাম, আপনাদের দেখে নেবে পড়লাম। অপূর্ববাবুকে একটু যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি ?

অপূর্ববাবু বারম্বার ঘাড় ও মুখ মুছিতে লাগিলেন।

বেলা অপাঙ্গে সেদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিব্রতই করেছি ওঁকে একটু। আপনিও শুনুন তা হ'লে ব্যাপারটা, এবং যদি ইচ্ছে করেন, বিব্রত হোন।

বেলা দেবী সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত করিলেন।

শঙ্কর বলিল, তার জন্যে আর ভাবনা কি ? এই ট্যাক্সি!

ট্যাক্সি ডাকলেন যে ?

চলুন আমার হস্টেলে। সেখানে একটা কমন-রুম আছে তো। সেখানেই না হয় বসবেন খানিকক্ষণ, তার পর খাওয়া-দাওয়া ক'রে যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেই হবে। ওর জন্যে আর ভাবনা কি, চলুন।

সেখানে কি ব'লে আমায় পরিচয় দেবেন ?

বোন।

না, বোন আমি হতে চাই না কারও। একজনের বোন হয়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, পরিচয় যা হোক একটা দিলেই হবে, ওর জন্যে কিছু আটকাবে না, এখন উঠুন।

বেলাকে লইয়া শঙ্কর ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

বেলা অপূর্ববাবুকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, অনর্থক কষ্ট দিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না।

না না, কিছু না—

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

অপ্রস্তুত মুখে সেই দিকে চাহিয়া অপূর্ববাবু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৪

প্রফেসার গুপ্ত কালিদাসের কাব্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য চর্চা করা তাঁহার জীবনের প্রথমতম বিলাস। যদিও তাঁহার পরিধানে রিমলেস চশমা, হস্তে বিলাতী সিগারেট, অঙ্গে মুসলমানী ঢিলা পাঞ্জাবি ও পায়জামা; কিন্তু মনে মনে তিনি উজ্জয়িনীবাসিনী মালবিকা-নিপুণিকা-চতুরিকার প্রণয়ী। তাঁহার কুশন-দেওয়া রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি নগাধিরাজ হিমালয়ের গভীর গাম্ভীর্যের মধ্যে অথবা অলকাপুরীর মায়াময় স্বপ্নলোকে তন্ময়চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন। ছন্দে গাঁথিয়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা যদিও তিনি অদ্যাপি লেখেন নাই, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহার নিজের জীবনটাতেই নানা কবিতার উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কোনদিন ছন্দোবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না। ছাত্রস্থানীয় শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কারণও এই কবিত্বপ্রীতি। শঙ্করের কবিতা যদিও ছাপা

হয় নাই, কিন্তু তাহা অপরূপ। তাহার মধ্যে তিনি উদীয়মান কবি-প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সুখ হয়, তাহার মনের সংস্পর্শে আসিলে নিজের মনের সুর বিচিত্র লীলায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। বয়স এবং সম্পর্কের অনৈক্য সত্ত্বেও তাই শঙ্করের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে।

প্রফেসার গুপ্ত তন্ময়চিত্তে শকুন্তলায় মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি বিলাত হইতে আসিয়াছে—পরিচিত হস্তাক্ষর। প্রফেসার গুপ্তের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। ইভার চিঠি। সেই ইভা, যাহাকে ঘিরিয়া একদিন কত স্বপ্নই না পরিগ্রহ করিয়াছিল! সে স্বপ্নগুলি আজ কোথায়? লণ্ডনবাসিনী বিপণি-পরিচারিকা ইভার মনেও কি এখনও তাহারা সজীব হইয়া আছে? হয়তো নাই। না থাকুক, কিন্তু একদিন এই ইভাই তাঁহার প্রবাস-জীবন অনন্ত মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। একদিন ইহা জীবন্ত সত্য ছিল বলিয়াই আজও পত্রধারার নির্জীব অভিনয় চালাইতে হইতেছে। ইভাও তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই, তিনিও ইভার ধ্যানে মগ্ন নহেন, চিঠি লেখাটা এখনও তবু চলিতেছে। অতীত জীবনের সেই পরম রমণীয় ভঙ্গুর স্বপ্নটি যদিও আজ ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তো তাহা একদিন ছিল! ইভার ছবিটা মনে ভাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চক্ষু দুইটিতে, সোনালী অলকে, রক্তিম অধরে, পীবর বক্ষে এখনও কি সেই মাদকতা আছে? চক্ষু মুদিত করিয়া প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নিমীলিত নয়নে তিনি ইভাকেই দেখিতে লাগিলেন—যে ইভা তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করে নাই, যে ইভা সর্বস্ব দিয়াও তাঁহাকে একটু খুশি করিতে পারিলে বর্তিয়া যাইত, সে ইভা কি এখনও বাঁচিয়া আছে? প্রফেসার গুপ্ত কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; মনে হইল, তিনি যেন কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়াছেন, অদূরে আশ্রমবাসিনী বল্কলবসনা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এ কি, শকুন্তলার মুখখানা ঠিক যেন ইভার মত! এ যে একেবারে অবিকল ইভা!

খুট করিয়া একটা শব্দ হইল, স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

প্রফেসার গুপ্ত তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মাথা তুলিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, অধর দংশন করিয়া একটি তন্বী যুবতী অপরূপ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—পাশে শঙ্কর দাঁড়াইয়া।

শঙ্কর বলিল, এই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?

না, ঘুমুই নি ঠিক, একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ব'স ব'স। ইনি কে ? আসুন, বসুন।

প্রফেসার গুপ্ত সম্ভ্রমভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেলাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর পরিচয় করাইয়া দিল।

যথাবিধি নমস্কারান্তে সকলে যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন শঙ্কর বলিল, আপনি মানুতুর জন্যে একজন গানের মাস্টার খুঁজছিলেন, ইচ্ছে করলে এঁকে রাখতে পারেন। গান-বাজনায় খুব ভাল ইনি।

বেশ তো।

শঙ্কর সংক্ষেপে বেলার পরিচয় দিয়া এবং তাঁহার গৃহত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিল, অতিশয় স্বাধীনপ্রকৃতির মহিলা ইনি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না, নিজে রোজগার ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন—এই এঁর প্রতিজ্ঞা।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিলেন, এ তো খুব ভাল কথা। দেশের যা অবস্থা, তাতে মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় জাগা খুবই উচিত। খালি গানই শেখান আপনি ? পড়াতে পারবেন ?

বেলা এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না। খালি গানই শেখাই। পড়াশোনা আমার বেশিদূর নয়, ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম, পাস করতে পারি নি। প্রাইভেটে বাড়িতে প'ড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, হ'ল না।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, ম্যাট্রিকটা পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার! একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায়।

পড়াশোনায় কোনদিনই বেশি মন নেই আমার। গান-বাজনাই বেশি ভাল লাগে, সেইটেই ভাল ক'রে শিখেছি।

সহসা বেলা লক্ষ্য করিলেন, প্রফেসার গুপ্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

বেলা দৃষ্টি নত করিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দাদার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছি, এখন আপনারা একটু সাহায্য না করলে মুশকিলে পড়ব।

সাহায্য নিশ্চয়ই করব। মাইনে কত চান আপনি?

মাইনে যা হয় দেবেন, আপনার মেয়েকে বেশ ভাল ক'রে গান-বাজনা শিখিয়ে দেব আমি। আমার খাওয়া-পরা-থাকার খরচটা চ'লে গেলেই হ'ল।

বেলা দেবী আবার চক্ষু দুইটি আনত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত কিছু না বলিয়া বেলার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, কি ভাবছেন?

একটু হাসিয়া গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ভাবব আবার কি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রফেসার গুপ্ত পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথায় আছেন?

শঙ্করই উত্তর দিল, মহৎ আশ্রমে।

হোটেলে থাকা কি বেশিদিন সুবিধে হবে?

বেলা বলিলেন, সে তো অসম্ভব। ঠিক করেছি, কোথাও একটা রুম নিয়ে ইক্‌মিকে রেঁধে খাব। কিন্তু তার আগে রোজগারের একটা ঠিকঠাক করতে হবে, সেই অনুপাতেই সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! আরও দু-একটা টিউশনি যোগাড় করতে হবে। ক'রে দেবেন তো শঙ্করবাবু?

দেখব চেষ্টা ক'রে নিশ্চয়।—বলিয়া শঙ্কর শকুন্তলাটা টানিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। সকলেই মিনিটখানেক নীরব হইয়া রহিলেন।

তাহার পর বেলা বলিলেন, আপনার মেয়ে কোথা? ডাকুন না, আলাপ করি একটু।

তারা এখন এখানে কেউ নেই, মামার বাড়ি গেছে। এই কলকাতাতেই অবশ্য মামার বাড়ি, কালই বোধ হয় আসবে তারা।

আপনার মেয়ের বয়স কত ?

বছর বারো হবে।

আগে গান শিখেছিল কারও কাছে ?

তেমন কিছু নয়, এমনিই শুনে শুনে যা দু-একটা শিখেছে। তবে গলাটা মিষ্টি, সুর-বোধও আছে ব'লে মনে হয়, তা ছাড়া বিয়ের বাজারেও গানটা দরকারে লাগবে।

প্রফেসার গুপ্ত একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলেন, গোড়াতেই কিন্তু মাইনের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়া ভাল। আমি টাকা কুড়ির বেশি এখন দিতে পারব না। তবে একটা কাজ আমি করতে পারি ; আপাতত আপনার থাকবার ব্যবস্থা একটা আমি ক'রে দিতে পারি। আমার এক বন্ধুর একটা ছোট বাড়ি আমার চার্জে আছে, ভাড়াটে এখনও পর্যন্ত জোটে নি। ভাড়াটে যতদিন না জুটছে, ততদিন সেটাতে আপনি পুট-আপ করতে পারেন।

বেলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়িটার ভাড়া কত ?

ভাড়া পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বাড়িটা ভাল।

কোন্ পাড়ায় বাড়িটা ?

বাগবাজারে।

বেশ তো, যতদিন ভাড়াটে না জোটে, আমি না হয় থাকি ; অত না পারি কিছু ভাড়া দেব। আরও গোটা দুই টিউশনি যদি যোগাড় করতে পারি আমিই না হয় থেকে যাব। কি বলেন শঙ্করবাবু ?

হ্যাঁ।

শঙ্কর অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল। সে শকুন্তলায় নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তা হ'লে কালই চ'লে আসুন সে বাড়িটাতে, মিছিমিছি হোটেলে আর পয়সা দিয়ে লাভ কি ? দাঁড়ান, চাবিটা এনে দিই আপনাকে।

প্রফেসার গুপ্ত উঠিয়া ভিতরের দিকে গেলেন। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চা আনতে বলি, কি বলেন ?

শঙ্কর বলিল, বলুন।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলে শঙ্কর শকুন্তলাটা মুড়িয়া রাখিয়া দিল এবং বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

হাসলেন যে ?

এমনিই।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, প্রায় তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখছি! আমার বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হয়ে এল ভেবে দুঃখ হচ্ছে। হাসিটা ছদ্মবেশ মাত্র।

দেখুন, কবিত্বশক্তি ভগবান যতটুকু দিয়েছেন, সবটুকু আমার ওপর নিঃশেষ ক'রে ফেলবেন না। রিনি বেচারীও তো আশা ক'রে ব'সে আছে!

রিনি! রিনির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?

সম্বন্ধ নেই ব'লেই সম্বন্ধ গভীর। সব জানি আমি, বৃথা লুকোচ্ছেন কেন ?

অধর দংশন করিয়া বেলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছু বলিল না, কেবল ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাবটা ফুটাইতে চেষ্টা করিল।

প্রফেসার গুপ্ত চাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, এই নিন। আসুন, এইবার একটু গল্প করা যাক।

বেলা বলিলেন, আপনি পড়াশোনা করছিলেন, আপনাকে হয়তো বিরক্ত করছি।

না না, কিছু না। এসে তো দেখলেন, ঘুমুচ্ছিলাম। আসুন, একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মত বিদ্যে আমার নেই, শঙ্করবাবু হয়তো পারবেন।

বেলা দেবী হাসিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত বলিলেন, আড্ডা দেওয়ার মধ্যে পাণ্ডিত্যের স্থান কোথায় তা তো বুঝি না। তা ছাড়া— আচ্ছা, থাক্, এত অল্প পরিচয়ে সে কথাটা বলা ঠিক হবে না।

কি কথা ?

থাক্, সে পরে বলব কোনদিন, অবশ্য সে দিন যদি আসে।

প্রফেসার গুপ্ত বেলার মুখের পানে চাহিয়া একটু রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তাহার পর অন্য কথা পাড়িলেন।

আপনি ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে ফেলুন।

কি আর লাভ হবে তাতে ?

চাকরি। আপনার পড়বার আমি সুবিধে ক'রে দিতে পারি। ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত পাস করা থাকলে অনেক রকম স্কোপ পাওয়া যায়, কি বল শঙ্কর ?

শঙ্কর পুনরায় শকুন্তলাটা উল্‌টাইতেছিল।

মুখ না তুলিয়াই বলিল, নিশ্চয়।

প্রফেসার গুপ্ত সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, পাস ক'রে ফেলুন ম্যাট্রিকটা, ম্যাট্রিক পাস করা কি আর এমন শক্ত ব্যাপার ? প্রাইভেটেই দিন আবার।

বেলা কিছু না বলিয়া প্রফেসার গুপ্তের মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিলেন। ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং বেলা নিজেই উঠিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা প্রস্তুত করিলেন।

প্রফেসার গুপ্ত চা-পরিবেশনকারিণী বেলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনাদের এই মূর্তিই কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে আমার।

ঘাড় ফিরাইয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, কোন্ মূর্তি ?

অন্নপূর্ণা-মূর্তি।

শঙ্কর বলিল, আমার চায়ে একটু বেশি চিনি দেবেন, একটু বেশি মিষ্টি খাই আমি।

বেলা বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আজ সকালে বলছিলেন, আপনি খুব ঝালেরও ভক্ত। মাংসে ঝাল না হ'লে ভাল লাগে না।

শঙ্কর কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

তিন চামচ দিয়েছি, আর দেব ?

না, ওতেই হবে।

সকলে মিলিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলেন।

২৫

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। কই, আজও তো মৃন্ময় আসিল না? কোথায় গেল সে? তিন দিন তাহার কোনও খবর নাই। জানালার ধারে জনবিরল গলিটার পানে চাহিয়া হাসি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আজ মৃন্ময় নিশ্চয় আসিবে, সে বড় আশা করিয়াছিল। রাত বারোটা বাজিয়া গেল। গুনিতে ভুল হয় নাই তো? সে উঠিয়া গিয়া ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, না, ঠিক বারোটাই বাজিয়াছে। আজও কি তাহা হইলে আসিবে না? শুষ্কমুখে হাসি পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল। বড় ভয় করে তাহার। তিন-চার দিন হইতে ডান চোখের পাতাটা এমন নাচিতেছে! তিন দিন পূর্বে 'এখনই আসিতেছি' বলিয়া মৃন্ময় সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নাই। এই তিন দিন হাসি খায় নাই, ঘুমায় নাই, কেবল ঘর আর বাহির করিয়াছে। ঘরের এই জানালাটার ধারে সে সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বসিয়াছে; দেখিতে দেখিতে বারোটা বাজিয়া গেল। ঠাকুরপোও তো এখনও পর্যন্ত ফিরিল না! ভন্টুবাবুর বাড়ি কতদূর? অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা হাসির দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, টপটপ করিয়া কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা কপোল বাহিয়া আঙুলের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাহার কপালে ভগবান এত দুঃখ লিখিয়াছেন কেন? কি দোষ করিয়াছে সে? অতি শৈশবেই বাপ মা ভাই তাহাকে ফেলিয়া একে একে মরিয়া গেল। সে মরিল না কেন? মরে নাই বোধ হয় মেয়েমানুষ বলিয়া। অফুরন্ত পরমায়ু লইয়া অসীম দুঃখ সহ্য করিতে হইবে যে! মুকুজ্জেমশাইয়ের উপর সহসা হাসির রাগ হইল, কেন তিনি তাহাকে লইয়া গিয়া দূর-সম্পর্কের বড়লোক পিসামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিলেন, কেন তাহাকে অনাহারে মরিয়া যাইতে দিলেন না? সে মরিয়া গেলে কাহার কি

ক্ষতি হইত? কাহারও না। এমন তো কত লোক রোজ মরিয়া যাইতেছে। সকলকে কি বুকুজেমশাই বাঁচাইতে যাইতেছেন? তাহাকে বাঁচাইতে গেলেন কেন? ছেলেবেলায় সব শেষ হইয়া গেলেই তো ভাল হইত। এখন মৃন্ময়কে ছাড়িয়া মরিতেও ইচ্ছা করে না। মরা দূরের কথা, তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতেও কষ্ট হয়। অথচ কপালগুণে এমন একটা চাকরি জুটিয়াছে যে, দিনরাত বাহিরে না থাকিলে উপায় নাই। এবারও কি চাকরির কাজেই বাহিরে গিয়াছে? প্রতিবারেই তো যাইবার আগে বলিয়া যায়; তা ছাড়া এখনই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে যে! হঠাৎ কোন জরুরি দরকারে যদি বাহিরে যাইতেই হয়, বাড়িতে আসিয়া সেটা বলিয়া যাইবারও কি অবসর ছিল না? না, আপিসের কাজ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে।

হাসি অন্ধকারে একা একা বসিয়া অকূলপাথার ভাবিতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার তাহার মনে হইল, মৃন্ময় তাহাকে ভালবাসে তো? তাহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে তো? তাহার মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয়, কেমন যেন কোথায় কিসের একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে,—সেটা যে কি, তাহা হাসি ধরিতে পারে না। ধরিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে। আর কাহাকেও কি মৃন্ময় ভালবাসে? কাহাকে? কেমন দেখিতে সে মেয়েটি? সহসা হাসির মনে হইল, ছি ছি, সে এ কি করিতেছে? স্বামীর সম্বন্ধে এসব কথা চিন্তা করাও পাপ। তিনি ভাল হোন, মন্দ হোন, সে সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, ইহাই কি আমার মত অভাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমিই কি আমার স্বামীর যোগ্য? অমন সুন্দর সুপুরুষ বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহধর্মিণী হইবার মত কি যোগ্যতা আছে আমার?

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের পাতা উপচাইয়া গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সে মুছিবার চেষ্টা করিল না। পাথরের মূর্তির মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

সঙ্কীর্ণ গলিটা রাত্রে একেবারে নির্জন। কোথাও কাহারও সাড়া নাই, সকলেই ঘুমাইতেছে। সহসা পদশব্দ শোনা গেল। ওই যে, চিন্ময় আর ভন্টুবাবুর গলার স্বর শোনা যাইতেছে। আরও কে যেন একজন সঙ্গে রহিয়াছে, গলার স্বরটা হাসির ঠিক চেনা নয়।

ভন্টু, চিন্ময় এবং শঙ্কর বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। হাসি যে এত রাত্রে বৈঠকখানায় আসিয়া রাস্তার ধারে জানালায় বসিয়া থাকিতে পারে, চিন্ময় তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনরূপ সাবধানতার প্রয়োজন সে অনুভব করিল না। অসঙ্কোচেই ভন্টুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভন্টুদা, বউদিকে কি বলবেন, এখনই ঠিক ক'রে নিন। দাদা যে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছেন—এ কথা তো বউদিকে বলা চলবে না।

হাসি রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সে আমি সামলে নেব।

কি বলবেন?

শঙ্কর, বল্ না—কি করা যায়, তুই তো মিথ্যে কথার গুরুমশাই একটি।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, সত্যি কথাটা বললে ক্ষতি কি?

ভন্টু মুখটি সূচালো করিয়া কয়েক সেকেণ্ড শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিল এবং মুখটি সূচালো করিয়া রাখিয়াই উচ্চারণ করিল, সত্যি কথা!

তাহার পর সহজভাবে বলিল, বাপের টাকায় মজাসে হস্টেলে আছিস—সত্যি-মিথ্যের হদিস তুই কি বুঝবি?

চিন্ময় বলিল, না শঙ্করবাবু, সত্যি কথা বললে বউদি ভয়ানক কান্নাকাটি করবেন, এমনিই না খেয়ে আছেন কদিন থেকে।

ভন্টু বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি। ওর কথা শুনছিস কেন তুই? কড়া নাড়্, বারোটা বাজে, ফিরতে হবে তো আবার।

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, সত্যি-ফত্যি ভুলে যা—দাবকে ঢোঁক গিলে যা। রাস্তায় চলতে গেলে যেমন গায়ে ধুলো লাগবেই, সংসার

করতে গেলে তেমনই ক্রমাগত মিথ্যে বলতে হবে। মিথ্যের হরির লুট দিতে দিতে যেতে পারলে আরও ভাল হয়।

হাসি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ওঁর কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো? হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে আছেন উনি? আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু, লক্ষ্মীটি, শিগগির বল, কি হয়েছে?

হাসির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। অপরিচিত শঙ্কর এবং স্বল্পপরিচিত ভন্টুকে দেখিয়া সহজ অবস্থায় সে হয়তো ঘোমটা দিত, এখন কিছুই করিল না।

বলা বাহুল্য, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময় বলিল, চল, ভেতরে চল, সব বলছি।

না, আগে বল তুমি।

সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি বলা যায়? ভেতরে চল, বলছি সব।

সকলে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

চিন্ময় শঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু, আপনি একটু বাইরের ঘরটায় বসুন, আমরা আসছি এখনি। আসুন ভন্টুদা।

ভন্টু, চিন্ময় ও হাসি ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্কর বাহিরের ঘরের চেয়ারটায় বসিয়া রহিল। সে বেলাকে মহৎ আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া হস্টেলে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে পথে ভন্টুর সহিত দেখা। ভন্টুর সহিত চিন্ময়ও ছিল। ভন্টুর মুখেই শঙ্কর শুনিল যে, গত তিন দিন যাবৎ মোমবাতির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখন জানা গিয়াছে যে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে। একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি তাহাকে নাকি চাপা দিয়াছে! ভন্টুর আগ্রহাতিশয্যে সে হস্টেল হইতে ছুটি লইয়া সেই হইতে ইহাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে। রিনির কাছে যাইবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া আর একটা কর্তব্যও এখনও পর্যন্ত অসমাপ্ত রহিয়াছে। বাবা একটা বাড়ি ভাড়া করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার

এখনও কিছু করা হয় নাই। বেলা এবং ভন্‌টুর পাল্লায় পড়িয়া সমস্ত সন্ধ্যেটাই তাহার মাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইহাদের সঙ্গ এত লোভনীয় যে, জোর করিয়া চলিয়া যাইতেও ইচ্ছে হয় না। যাই হোক, কাল সকালে উঠিয়াই প্রথমে রিনির ওখানে যাইতে হইবে এবং যেমন করিয়া হোক একটা বাড়ির সন্ধান করিতে হইবে। সহসা তাহার মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। ভন্‌টু ও চিন্ময়ের সঙ্গে সেও হাসপাতালে গিয়াছিল। অচেতন মৃন্ময় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিল, প্রশান্ত মুখখানায় কেমন যেন একটা আত্মসমাহিত ভাব। সেদিন রাত্রের সেই চিঠিখানার কথাও মনে পড়িল। চিঠিটা এখনও তাহার কাছে আছে। সেদিন রাত্রে ঘরে এই মেয়েটিই তো ছিল। স্বর্ণলতা তাহা হইলে কে?

ভীম জাল!

ভন্‌টু আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

ভীম জাল টু দি পাওয়ার এন।

মানে?

মানে, খুজবুজ হাসপাতালে যেতে চাইছে।

খুজবুজ কে?

মোমবাতির বউ। বলছে, আমি শুধু একটিবার নিজের চোখে দেখতে চাই তাকে। ভয়ানক উইপিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর বলিল, এত রাত্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? সেখানে ঢুকতে দেবে কি?

আমাদের পাড়ার ধীরেন ডাক্তার চেষ্টা করলে করতে পারে ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে সে সব করতে পারে, কারণ রিয়েলি সে চাম লদ্‌। চল্ যাই।

কোথায়?

ধীরেন ডাক্তারের কাছে।

আমাকে আবার টানছিস কেন ভাই?

উত্তরে ভন্‌টু শুধু মুখ-বিকৃতি করিল।

প্রভাত হইবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

শঙ্কর একা দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছিল। সে ক্যাম্বে হাসপাতাল হইতে ফিরিতেছিল। হাসিকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং অসময়ে রোগীর কাছে যাইবার অনুমতি সংগ্রহের জন্য কম বেগ পাইতে হয় নাই। অনেক বলা-কহার পরে তবে অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। হাসি গিয়া মৃন্ময়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছে, এবং এখনও নড়ানো যাইতেছে না। এখন হাসি যাহাতে সেখানে থাকিতে পায়, নিরুপায় ভন্টু অগত্যা নানাভাবে সেই তদ্বির করিতেছে।

ভন্টুর সঙ্গে চিন্ময়ও আছে। শঙ্কর কিন্তু আর সেখানে থাকিতে পারিল না। বেদনাতুর হাসির অশ্রুছলছল মুখখানি শঙ্করকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া দিল। শঙ্কর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ হাঁটিবার পর সে যখন রিনিদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোরের মৃদু আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তা হইতে বাড়িটা দেখা যায়, শঙ্কর বাড়িটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে গেটের নিকট গিয়া দেখিল, গেট ভিতর হইতে তালা-বন্ধ। শঙ্কর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এভাবে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা যে অশোভন, সে চেতনাও তখন তাহার ছিল না। সে অপলকদৃষ্টিতে বাড়িটার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা দ্বিতলের একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল এবং শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে রিনি দাঁড়াইয়া আছে।

কেহ কোন কথা বলিল না। নির্নিমেষ শঙ্কর ও নিস্পন্দ রিনির মধ্যে তালাবদ্ধ লোহার গেটটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬

রাস্তাটা খুব বড় নহে, গলি বলিলেই চলে, বাড়িটি কিন্তু প্রকাণ্ড। রাত্রি গভীর হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড দামী মোটরকার নিঃশব্দে আসিয়া বাড়িটার সম্মুখে থামিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন। গাড়িতে

আর কেহ ছিল না। গাড়ি হইতে নামিয়া অচিনবাবু একবার ভাল করিয়া চতুর্দিকে দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড বাড়িটার বন্ধ দরজার উপরে চারিটি টোকা দিলেন। টোকা দিবার মধ্যেও একটু কায়দা ছিল। প্রথম দুইটি টোকা ঘন ঘন এবং শেষ দুইটি বেশ দেরি করিয়া করিয়া। দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল, কিন্তু নিষ্কাশিত-অসি বিরাটকায় এক পাঠান আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। অচিনবাবু তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটি টাকা, একটি আধুলি, একটি সিকি এবং একটি দুয়ানি তাহার হস্তে দিলেন। পাঠান পকেট হইতে একটি টর্চ বাহির করিয়া মুদ্রাগুলি উলটাইয়া প্রত্যেকটির সাল দেখিতে লাগিল। তাহার পর মুদ্রাগুলি ফেরত দিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া একটি ইলেকট্রিক বেল টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং অচিনবাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া গেলেন। উপরে যে ঘরে গিয়া তিনি হাজির হইলেন, সেই ঘরের একটি ঘরের কোণে বিস্তৃত ফরাশের উপর সর্বাঙ্গে দামী শাল জড়াইয়া একটি বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। অচিনবাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, তিনখানা কারের অর্ডার দিয়েছেন মালিক। একখানা নিজের জন্যে, একখানা জামাইবাবুর, আর একখানা যাবে এস্টেটের ম্যানেজারের ওখানে। তার পর সে ছোকরার খবর কি?

এখনও মরে নি, হাসপাতালে রয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল বোধ হয়।

ড্রাইভারটা কিন্তু ধরা পড়েছে শুনলাম?

হ্যাঁ, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধ বলিলেন, এ ঠিক সেই ছোকরাই তো, মৃন্ময় না কি নাম বলছিলেন? ভুলে অন্য কোন লোককে আবার চাপা দিলে না তো?

অচিনবাবু বলিলেন, না না, আমি নিজে তার ফোটো তুলে নিয়েছি, নিজে সেই ড্রাইভারকে ফোটো দিয়েছি, তা ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে দেখিয়েও দিয়েছি একদিন। ভুল হয় নি।

একটু থামিয়া অচিনবাবু বলিলেন, ড্রাইভারটাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।

আপনারই কথামত তাকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে, টাকা দিয়ে যা করা সম্ভব, তা আমরা করব তাকে বাঁচাবার জন্যে।

নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে ঢালা হুকুম আছে কর্তার। উকিল-টুকিল ব্যবস্থা ক'রে দিন। ফাইন হয়, দেব আমরা। জেল হয়, তার পরিবারের ভরণপোষণের খরচা ছাড়াও কম্‌পেন্‌সেশন দেব। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই। কত টাকা চাই, বলুন না?

শ পাঁচেক এখনই দরকার।

ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন ও দেওয়ালে পোঁতা একটা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া অচিনবাবুর হস্তে দিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, নতুন মাল কবে দিচ্ছেন? কর্তা যে ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে!

অচিনবাবু বলিলেন, শিক্ষয়িত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন তো দিয়েছি। একটা সুবিধেমত পেলে হাজির ক'রে দেব।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যা হয় করুন একটা।

সর্বদাই চেষ্টায় আছি। আচ্ছা, এবার চলি আমি, ব্যবস্থা করতে হবে অনেক।

আসুন তা হ'লে।

অচিনবাবু উঠিয়া পড়িলেন ও যথাবিহিত নমস্কারান্তে নামিয়া আসিলেন। বাহির হইবার সময় কোনরূপ বেগ পাইতে হইল না। মোটরে চড়িয়া স্টিয়ারিং ধরিয়া মিনিটখানেক কি যেন ভাবিলেন। ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটিতে অতি মৃদু চাপা একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মোটরে স্টার্ট দিয়া নিঃশব্দ-গতিতে গলি হইতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অচিনবাবু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া গিয়া দেওয়ালে লাগানো একটি বোতাম টিপিলেন। প্রকাণ্ড বাড়িটার দ্বিতলের সুদূর একটা অংশে ইলেক্‌ট্রিক বেল ঝনৎকার দিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ গাঁট্টাগোঁট্টা-গোছের একটা লোক আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, নিয়ে আয় এবার।

লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আরও দুইজন লোকের সাহায্যে একটি অজ্ঞান যুবতীর দেহ বহন করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ফরাশের উপর শোয়াইয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কতক্ষণ বাদে এর জ্ঞান হবে, ডাক্তার বলেছে কিছু?

গ্যাঁট্টাগোঁট্টা লোকটি উত্তর দিল, ঘণ্টা দুই বাদে।

কিছু খাওয়ানো হয়েছে?

গ্লুকোজ না কি একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, বলেছেন, আজ রাত্রে আর খাওয়াবার দরকার নেই কিছু।

আচ্ছা, যা তোরা, এখন কর্তার পছন্দ হ'লে হয়! ভ্যালা এক চাকরি হয়েছে আমার! তোরা সব বাড়ি চ'লে যা, ওই পাঠানটাকেও বাড়ি যেতে বল্‌। কর্তা আজ আসবেন।

আচ্ছা হুজুর।

ভৃত্য তিনজন বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহাদের পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, একটু পরে আর শোনা গেল না। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শালখানা অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িল, কুব্জ দেহটাকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে পাশবিক ক্ষুধা মূর্তি পরিগ্রহ করিল, লুব্ধ চাহনি অচেতন মেয়েটির সর্বাঙ্গ যেন লেহন করিয়া ফিরিতে লাগিল, নিশ্বাসের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে। বাহিরের কপাটটা বন্ধ করিয়া চকিত দৃষ্টি মেলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। না, কেহ কোথাও নাই। ত্বরিতপদে আবার তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েটি এখনও অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। একবার সেদিকে চাহিয়া আলমারি হইতে কয়েকটা বড়ি বাহির করিয়া

কি একটা আরক সহযোগে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শাল মুড়ি দিয়া বসিলেন এবং অপলকদৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

পূর্বপুরুষ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন; টাকা দিয়া যাহা সম্ভব সব হইতেছে, এবং দেখা যাইতেছে, সবই বোধ হয় সম্ভব। এমন কি, সুনামটি পর্যন্ত বজায় আছে। চাকরবাকর পর্যন্ত জানে যে, কোন অজ্ঞাত লম্পটের জন্য এই সব আয়োজন, এই বৃদ্ধ তাহাদেরই মত বেতনভুক একজন ভৃত্য মাত্র। বৃদ্ধ যে নিজেই কর্তা—এ কথা বৃদ্ধ ছাড়া আর কেহ জানে না।

নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধ সংজ্ঞাহীন নারী-দেহটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শিকারলুব্ধ বৃদ্ধ অজগরের লোলুপতা মূর্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

২৭

রাত্রি গভীর হইয়াছে।

ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমাইতেছে, নিশাচর ভন্টুও এই কিছুক্ষণ আগে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছে এবং দালানে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। বাকু এখনও উঠেন নাই, যদিও উঠিবার আর বেশি দেরিও নাই। ভন্টুর বউদিদি ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন, আস্তে আস্তে নিজের তোরঙ্গটির নিকটে গেলেন এবং অতি সন্তর্পণে তোরঙ্গের চাবি খুলিলেন। তাহার পর তোরঙ্গের ভিতর হইতে কতকগুলি রঙিন চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। মার্জিত-রুচি কোন লোকের চোখে কাগজগুলি হয়তো তেমন সুদৃশ্য বলিয়া মনে হইবে না, বউদিদির নিকট উহাই কিন্তু যথেষ্ট সুন্দর। স্বামী যাইবার সময় কিনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কাগজ বাহির করিয়া বউদিদি ইতস্তত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—ভন্টুটা দোয়াত কলম যে কোথায় ফেলে, তাহার ঠিক নাই। ঠাকুরপোর কাছে এত মার খায়, তবু ছেলেটার স্বভাব বদলাইল না। ঘরের কোণে কমানো বাতিটি আস্তে উস্‌কাইয়া দিয়া সেটি

হাতে করিয়া লইয়া বউদিদি সন্তর্পণে ঘরের তাকগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে দোয়াত কলম তাকেই ছিল, মিলিয়া গেল। বউদিদি প্রসন্নমুখে ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটি বিছাইয়া তাহার উপর বসিলেন এবং আলোটি কাছে সরাইয়া আনিয়া অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কলমের নিবটা ভাল নয়, কাগজ অতি সাধারণ, দোয়াতে কালি জলবৎ। বউদিদির চিঠির ভাষাও উচ্চাঙ্গের নহে। বানান-ভুল অজস্র হইতেছে। তথাপি কিন্তু এই নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে চুরি করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখার মধ্যে যে মাধুর্য, যে মহিমা, স্পন্দিত বিরহের যে আকূতি বউদিদির গোলগাল কালো মুখমণ্ডলকে মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নহে। স্বল্পালোকিত ঘরে ছিন্ন মাদুরের উপর উপুড় হইয়া বউদিদি দীর্ঘ একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। পত্র লেখা শেষ করিয়া পত্রখানি আর একবার পড়িলেন, পুনশ্চ দিয়া আবার খানিকটা কি লিখিলেন, অবশেষে খামের মধ্যে পত্রটি পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া সেটি বিছানার নীচে রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর প্রাচীর-বিলম্বিত জগদ্ধাত্রীর ছবিটির নিকট গিয়া গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল।

২৮

শঙ্কর সকালে উঠিয়াই একখানি পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উৎপল বিলাতে নাকি কোন এক মেমসাহেবের প্রেমে পড়িয়াছে! পত্রখানি লিখিতেছেন উৎপলের একজন আত্মীয়। পত্রখানির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে অবশ্য শঙ্করের দেরি হইল না। কারণ যদিও পত্রখানির ভাষায় আত্মীয়-সুলভ চিন্তা ও ক্ষোভই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাষার অন্তরালে যে অন্তর্নিহিত খোঁচাটি অপ্রত্যক্ষ রহিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা হৃদয়গ্রাহী নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভাবটি এই—ভারি যে উহার শ্বশুর উহাকে বাহাদুরি

করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছিল, এইবার মজাটা বুঝুক। শঙ্কর ভাবিয়া দেখিল, গিয়া অবধি উৎপলও তাহাকে বিশেষ কোন চিঠিপত্র লেখে নাই। বিলাতে পৌঁছিয়াই সে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়-কাহিনী কিছু ছিল না, ছিল ভ্রমণ-কাহিনী। তাহার পর যে দুই-একখানা পত্র সে লিখিয়াছে, তাহা নিতান্তই নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, দুই-চারি ছত্রের মামুলি চিঠি। শঙ্কর নিজে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে হয়তো উৎপলের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হইত; কিন্তু উৎপলের বিলাত যাওয়ার পর হইতে তাহার নিজেরই মানসিক জগতে যে বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহাতে বাহিরের কোন কিছুতে বিচলিত হইবার তাহার উপায় ছিল না। মায়ের এতবড় শোচনীয় অসুখও তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে যাহা করিতেছিল কর্তব্যের অনুরোধেই করিতেছিল, প্রাণের তাগিদে নহে। সহসা সুরমার কথা তাহার মনে পড়িল, সুরমার পূর্বপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রলাপের কিছু অর্থও তাহার যেন বোধগম্য হইল। উৎপলের আত্মীয়ের পত্রখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া শঙ্কর কলেজের পড়া করিতে বসিল। অনেক দিন বই ছোঁওয়া হয় নাই। রিনির বই পড়িতেই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, নিজের পড়া কিছুই হয় নাই। ক্লাসে বসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে প্রবেশ করে, কিন্তু মনে প্রবেশ করে না। ক্লাসে ভাল করিয়া মন দিয়া শুনিলে বাড়িতে পড়িবার ততটা দরকার হয় না, কিন্তু বিশেষ করিয়া ক্লাসেই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। ক্লাসের জনতার মধ্যেই সে সেই নির্জনতা পায়, যাহা তাহার পক্ষে এখন একান্তভাবে প্রয়োজন। ক্লাসের বাহিরে ভন্টু আছে, বেলা আছে, শৈল আছে, আরও কত অগণ্য প্রাণী আছে, যাহাদের সংস্পর্শে না আসিলে চলে না, যাহাদের সংস্পর্শ অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কিন্তু যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে ধ্যান ভাঙিয়া যায়, মনের প্রত্যক্ষলোক হইতে লজ্জিতা রিনি সরিয়া যায়। ক্লাসের এক কোণে বসিয়া মনের মধ্যে সে যে একাকীত্ব অনুভব করে, রিনিকে মনে মনে যেমন একান্তভাবে পায়, এমন আর কোথাও সম্ভব হয় না। ক্লাসে তাই তাহার পড়া হয় না। অথচ এই মোটা মোটা বইগুলা পড়িতে হইবে তো!

শঙ্কর বাহিরে গিয়া চাকরকে আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিল এবং ঘটা করিয়া ফিজিক্সের একখানা বহি লইয়া পড়িতে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া দুই-চারি দিন এইবার পড়িতে হইবে। বাবা একখানা বাড়ি দেখিতে বলিয়াছিলেন,—তাহা সে দেখিয়াছে, বাবাকে চিঠিও লিখিয়া দিয়েছে। তাঁহার আসিবার পূর্বে পড়াটাও কিছুদূর আগাইয়া রাখিতে হইবে, কারণ তাঁহারা আসিলে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা আছে। রিনি তো আছেই। কিন্তু হায় রে, বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই যদি পড়া হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! শঙ্কর খোলা বইটার উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল বটে, কিন্তু এক বর্ণও তাহার মাথার ভিতর ঢুকিল না। চাকরে চা দিয়া গেল, চা পান করিয়াও বিশেষ ফলোদয় হইল না। বরং কিছুক্ষণ পরে সে সহসা স্থির করিয়া ফেলিল যে, এমনভাবে বসিয়া শুধু সময় নষ্ট হইতেছে মাত্র, আর কিছুই হইতেছে না। ইহার অপেক্ষা বরং রিনির কাছে যাওয়াই ভাল। তাহার মনে একটা কথা কয়েক দিন হইতে জাগিতেছে, সোনাদিদি-মিষ্টিদিদিকে আসল কথাটা খুলিয়া বলিলে ক্ষতি কি? এই মহিলা দুইজনের সহিত তরল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তাহার এমন একটা অন্তরঙ্গতা হইয়াছে যে, ইঁহাদিগকে যেন মনের গোপন কথাটি বলা যায়। তবু কিন্তু সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, ভাষায় প্রকাশ করিলেই যেন ইহার পবিত্রতা, ইহার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আর তো চাপিয়া রাখা যায় না! এমনভাবে লুকাইয়া কতদিন আর থাকা সম্ভব! তাহা ছাড়া মনের ভাব এমন করিয়া গোপন করিয়া ওখানে প্রত্যহ যাতায়াত করা শুধু যে কষ্টকর, তাহা নয়—ভণ্ডামিও। তাহার তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই, সে রিনিকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া পত্নীত্বে বরণ করিতে চায়। ইহাতে অগৌরবের বা অসম্মানের কিছুই নাই। প্রফেসার মিত্রকে সে কিন্তু নিজে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিবে না। রিনিকে কিছু বলা আরও অসম্ভব। সোনাদিদি অথবা মিষ্টিদিদিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাঁহারা ইহাতে যদি আপত্তিকর কিছু না দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাই প্রফেসার মিত্রকে বলিবেন এবং রিনির মনোভাব জানিয়া লইবেন। রিনির মনোভাব শঙ্করের জানাই

আছে। মুখে কেহ কাহাকেও কোনদিন কিছু বলে নাই সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার মনের নিগূঢ় বার্তাটি নিগূঢ় উপায়েই সে যেন জানিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, এসব বিষয়ে অন্তর্যামী মনের কখনও ভুল হয় না। শঙ্করের বাবা সনাতনপন্থী লোক, তিনি হয়তো এ বিবাহে আপত্তি করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে, তিনি যদি না বোঝেন, তাঁহার অমতেই বিবাহ করিবে সে। আজকাল কুল-গোত্র-গণ-কোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। পাত্রী হিসাবে রিনি—। শঙ্কর আর ভাবিতে চাহিল না। পাত্রী হিসাবে রিনি অযোগ্য কি সুযোগ্য—এ আলোচনা মনে মনে করিতেও শঙ্করের বাধিল। তাহার মনে হইল, পাত্রীর বাজারে রিনিকে দাঁড় করাইয়া অন্যান্য পাত্রীর সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিলে রিনিকে অপমান করা হইবে। তাহাকে এমনভাবে মনে মনে খাটো করিবারই বা তাহার কি অধিকার আছে? জামা জুতা পরিয়া শঙ্কর দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল বটে, কিন্তু পথে আসিয়া তাহার গতিবেগ পুনরায় মন্থর হইয়া আসিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এখনই গিয়া এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হইবে? প্রথমে কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যাইবে, তাহাই তো পরম সমস্যা। এই সব ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, একটা রাস্তার মোড়ে একটা পাগলকে ঘিরিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। পাগল আমাদের পূর্বপরিচিত মোস্তাক। শঙ্কর ইহাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই, সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। অঙ্গে একটা ছেঁড়া কোট ছাড়া আর কিছু নাই, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, চক্ষু দুইটি লাল। নূতনত্বের মধ্যে খবরের কাগজের একটা শিরস্ত্রাণ বানাইয়া মাথায় পরিয়াছে এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে, মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিতেছে। একবার দুইবার নয়, 'রাইট অ্যাবাউট টার্ন' করিতে করিতে ক্রমাগত সেলাম করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া শঙ্করও কিছুক্ষণ মোস্তাকের পাগলামি উপভোগ করিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এই উন্মাদটার সেলাম-প্রবণতায় তাহার কবি-মনে অদ্ভুত একটা রূপকের আভাস জাগিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, এই উন্মাদটা যেন সমস্ত বাঙালী জাতির প্রতীক, কারণে অকারণে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলকে সেলাম করিয়া চলিয়াছে। বেশিক্ষণ ভাল লাগিল না, আবার সে চলিতে শুরু করিল।

ও শঙ্করবাবু!

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ব্ববাবু; আরও কে একজন তাঁহার সহিত রহিয়াছেন, অপর দিকের ফুটপাথ হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন। শঙ্কর থামিতেই তাঁহারা রাস্তাটা পার হইয়া শঙ্কর যে ফুটপাথে ছিল তাহাতেই আসিয়া হাজির হইলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি আমরা।

বিনীতকণ্ঠে আনতচক্ষে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া অপূর্ব্ববাবু শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। শঙ্কর দেখিল, অপূর্ব্ববাবু ঠিক তেমনই আছেন। সেই কোঁচানো কাপড়, গিলে-করা পাঞ্জাবি, মুখে স্নো-পাউডার। সেই নম্রনত লীলায়িত হাবভাব। অপর ভদ্রলোকটিকে শঙ্কর আগে দেখে নাই। ভদ্রলোকটির চেহারা কেমন যেন শুষ্ক, রুক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত। দেখিলে মনে হয়, যেন রাত্রে ঘুম হয় নাই।

আমাকে খুঁজছেন? কেন বলুন তো?

মানে, ইনি হচ্ছেন বেলার দাদা, মিছিমিছি একটা রাগারাগি ক'রে সামান্য জিনিস নিয়ে হঠাৎ এমন একটা—মানে, মিটে গেলেই—অনর্থক একটা—বুঝতেই পারছেন—

অপূর্ব্ববাবু কোন কথাই সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে পারেন না। কিছুদূর বলিয়া চুপ করিয়া যান, এবং এমন একটা ভাব করেন, যেন এত অধিক বাক্যব্যয় করিয়া তিনি অত্যন্ত একটা অন্যায় কার্য করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ উপায় নাই।

প্রিয়বাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, বেলা কোথায় আছে, জানেন আপনি?

শঙ্কর বলিল, এখন তো ঠিক জানি না। আমাদের কলেজের এক প্রফেসারের মেয়েকে গান শেখাবার ভার নিয়েছেন তিনি। সেই প্রফেসারের

বন্ধুর একটা খালি বাড়ি আছে, তাতেই উঠে গেছেন পরশু-দিন। ঠিকানাটা পরে এনে দিতে পারব আমি, এখন তো জানি না।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার প্রফেসারের ঠিকানাটা দিন না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি গিয়ে; আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?

বেশ।

প্রফেসার গুপ্তের ঠিকানাটা শঙ্কর বলিয়া দিল। উভয়েই শঙ্করকে অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। অপূর্ববাবুর উচ্ছ্বাসটা কিছু যেন অধিক বলিয়াই বোধ হইল; অসম্পূর্ণ বাক্যাবলী অসংলগ্নভাবে খানিকক্ষণ বলিয়া বিনীত নমস্কারান্তে অপূর্ববাবু বিদায় লইলেন। প্রিয়বাবুও সঙ্গে গেলেন। শঙ্কর পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন অবশেষে প্রফেসার মিত্রের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। রিনি ও প্রফেসার মিত্র কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িতে সোনাদিদি ও মিষ্টিদিদি রহিয়াছেন। শঙ্করকে তাঁহারা এই সময়ে প্রত্যাশা করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সোনাদিদি কোথায় যেন বাহির হইতেছিলেন, শঙ্কর আসাতে যাওয়া স্থগিত করিলেন ও সবিস্ময়ে বলিলেন, এমন সময়ে যে, মানে—এমন অসময়ে যে? এ কি অঘটন!

মিষ্টিদিদি বলিলেন, ছুটি আছে বোধ হয়, নয়! বসুন।

শঙ্কর বলিল, না, ছুটি নয়, এমনই এলাম।

সোনাদিদি কিছু না বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন। শঙ্কর উপবেশন করিয়া বলিল, একটু চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। কিন্তু এই অসময়ে চা কেন, ব্যাপার কি বলুন তো আজ?

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ব্যাপার কিছু নয়, এমনই কিছু ভাল লাগছে না ব'লে এলাম এখানে। শরীরটাও ভাল নেই।

ডক্টর সেন বলছিলেন, কলকাতাতেও নাকি ম্যালেরিয়া হচ্ছে আজকাল, কুইনিন খাবেন?—বলিয়া সোনাদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি, ডক্টর সেন বলছিলেন সেদিন।

কুইনিন খাবার দরকার নেই, আপনি কথা ব'লে যান, তা হ'লেই কাজ হবে, কি বলুন মিষ্টিদি ?

উভয়েই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সোনাদিদির পানে কোণকটাক্ষে চাহিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, কেমন, জব্দ হয়েছিস তো এবার ? থামুন, চায়ের কথাটা ব'লে দিই। এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। সোনাদিদি হাসিভরা চক্ষু দুইটি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া পুনরায় বলিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো সত্যি ক'রে ?

শঙ্কর বলিয়া ফেলিল, থাকতে পারলাম না।

থাকতে পারলেন না ? তার মানে ?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার না-থাকতে-পারার প্রতিকার কি এ বাড়িতে আছে নাকি ?

তা কি আপনি জানেন না ?

শঙ্কর গম্ভীরমুখে বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সোনাদিদি বলিলেন, আপনার অজ্ঞাতসারে একটা কাজ ক'রে ফেলেছি কিন্তু। রাগ করবেন না তো ?

কাজটা কি ?

আপনার সেই কবিতাটা একটা কাগজে দিয়ে দিয়েছি। সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে দেখালুম, তিনি এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেলেন।

কোন্ কাগজে ?

তা এখন বলছি না, বেরুলে দেখবেন।

কোন্ কবিতাটা দিয়েছেন ? আমি তো অনেকগুলো কবিতা দিয়েছিলাম আপনাকে।

সেই যে, যার গোড়ার লাইনটা হচ্ছে—'রসনা নীরব মম চিত্ত মম নিত্য মুখরিত'—

ও।

শঙ্কর আবার গম্ভীর হইয়া পড়িল। মিষ্টিদিদি ফিরিয়া আসিলেন। এই

অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রসাধনের একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছেন দেখা গেল।

শঙ্করকে গম্ভীর দেখিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, সোনা বুঝি আবার ঝগড়া করেছে আপনার সঙ্গে?

না।

শঙ্কর সস্মিত দৃষ্টি মিষ্টিদিদির দিকে ফিরাইল।

চায়ের কতদূর?

ব'লে দিয়েছি, এখুনি আসছে।

বলিতে বলিতেই চা আসিয়া পড়িল। সোনাদিদি উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অলিখিত আইন অনুসারে সোনাদিদিই এসব কার্য সাধারণত করিয়া থাকেন।

সহসা শঙ্কর গাঢ়স্বরে বলিল, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আজ একটা বলব ব'লে এসেছি। আমার একটা শুধু অনুরোধ, হাসি-ঠাট্টা ক'রে জিনিসটাকে হালকা ক'রে ফেলবেন না। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।

চা ঢালিতে ঢালিতে সোনাদিদি চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন এবং একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, সে কি, আপনার কাছে যেটা এত সিরিয়াস ব্যাপার, তা আমরা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেব! ছি ছি, এতটা খেলো লোক ভাবেন আপনি আমাদের!

শঙ্কর গাঢ়স্বরেই বলিল, খেলো লোক ভাবলে আসতাম না আপনাদের কাছে। আপনারা খেলো লোক নন ব'লেই অসঙ্কোচে এত বড় একটা কথা বলতে এসেছি।

সোনাদিদি নীরবেই এক কাপ চা শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিলেন। মিষ্টিদিদির দিকে চাহিতেই মিষ্টিদিদি বলিলেন, দে, আমিও খাই একটু—আচ্ছা, একটু কড়া হোক, পাতলা চা আমি খেতে পারি না বাপু।

সোনাদিদি নিজের জন্য এক কাপ ছাঁকিয়া লইলেন।

শঙ্কর ধীরে ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগিল।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, কথাটা কি, শুনিই না?

শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, রিনিকে আমি ভালবেসেছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

সোনাদিদি সহসা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদবেগে বহিতেছিল।

মিষ্টিদিদি উঠিয়া নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আপনাকে আমরা নিজের আত্মীয়রূপে পাব—এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে? কিন্তু সকলের চেয়ে আগে রিনির মত নেওয়াটা দরকার নয় কি?

রিনির অমত হবে না।

জিজ্ঞেস করেছিলেন?

না, আমি জানি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, তবু ফর্মালি জিজ্ঞেস করাটা একবার দরকার।

সে আপনি করবেন। প্রফেসার মিত্রকেও আপনি বলবেন—আমি পারব না, আমার ভারি লজ্জা করবে। আমার বাবা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। যদি করেন, তাঁর মতের বিরুদ্ধেই আমি বিয়ে করব।

সেটা কি ঠিক হবে?

বাবা হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন। যাই হোক, সে আমি বুঝব।

শঙ্কর বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সহসা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এবার উঠি আমি, ক্লাস আছে। আসব কাল।

শঙ্কর হঠাৎ উঠিয়া আচমকা বাহির হইয়া পড়িল। বারান্দায় দেখিল,

অতিশয় গম্ভীর মুখে সোনাদিদি এক প্রান্তে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। শঙ্করের পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, এক নিমেষের জন্ত তাঁহার চক্ষু দুইটি শঙ্করের উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার পর ত্বরিতপদে তিনি পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িলেন। শঙ্কর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

শঙ্কর কলেজে যায় নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন হস্টেলে ফিরিল, তখন দেখিল, মিষ্টিদিদির চাকর একটি চিঠি লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চাকরের উপর আদেশ ছিল—শঙ্করবাবু ছাড়া অপর কাহাকেও যেন চিঠি দেওয়া না হয়। শঙ্কর তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

আপনি এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন যে, একটা দরকারী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। একটা গুজব রটেছে যে, বেলা মল্লিক নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আপনার আশ্রয়ে কোথায় আছে। বেলার দাদা বেলাকে খুঁজতে এসেছিলেন। অপূর্ববাবু বললেন, বেলা আপনার আশ্রয়ে আছে। রিনিও কথাটা শুনেছে। আসলে ব্যাপারটা কি, পত্রবাহক মারফৎ জানাবেন। কারণ এ বিষয়ে সবিশেষ না জানলে— বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা! আশা করি, এটা সিরিয়াস কিছু নয়। সব কথা খুলে লিখবেন। ইতি—

মিষ্টিদিদি

বেলার সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহাই শঙ্কর সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইয়া দিল এবং লিখিল যে, তিনি প্রফেসার মিত্র ও রিনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফলাফল যেন তাহাকে পত্রযোগেই অনুগ্রহ করিয়া জানান। তৎপূর্বে সে ওখানে যাইবে না, অর্থাৎ যাইতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির চাকর চলিয়া যাইবার পর হস্টেলের চাকর আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের বাড়ি হইতে মাঈজী এই জিনিস ও চিঠি দিয়াছেন। শঙ্কর খুলিয়া দেখিল শৈলর চিঠি।—

শঙ্করদা,

তোমার জন্মে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনেছি। তুমি যেমন বলেছিলে—নীল রঙের সঙ্গে সাদা রঙই দিয়েছি। বুনতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, শীত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। গায়ে ঠিক হয়েছে কি না জানিও। তুমি একদিন এস না সময় ক'রে। একবারও তো এদিক মাড়াও না। কেমন আছ? ইতি—

শৈল

শঙ্কর প্যাকেট খুলিয়া সোয়েটারটা বাহির করিল। বেশ বুনিয়াছে তো! গায়ে দিয়া দেখিল, ঠিক ফিট করে নাই। বগলের কাছটা আঁট, গলাটা ঢিলা। তবু কিছুক্ষণ শঙ্কর সেটা পরিয়া রহিল। সহসা তাহার মনে একখানি মুখ ভাসিয়া আসিল—একমাথা কোঁকড়ানো চুল, দুষ্টামি-ভরা হাসি-হাসি মুখখানি। সেই কতকাল আগেকার কিশোরী শৈল!

২৯

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আপিস হইতে ফিরিয়া ভন্টু যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। অনেক কষ্টে অনেক রকম ফিকির-ধান্দা করিয়া কোনক্রমে সে সংসারটিকে চালাইতেছে, তাহার উপর যদি এই সব কাণ্ড ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে তো সে নাচার। নানারূপ ফন্দি করিয়া সে কিছু টাকা যোগাড় করিয়াছিল এবং সমস্ত মাসের চাল ডাল নুন তেল মসলা প্রভৃতি কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ বাসায় ফিরিয়া সে শুনিতেছে, শন্টু ফন্তি নাকি ভাঁড়ার-ঘরে লুকাচুরি খেলিতে গিয়া সমস্ত তেলের ভাঁড়টি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। লুকাচুরি খেলিতে গিয়া! ভন্টুর সমস্ত মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল।

বউদিদিকে প্রশ্ন করিল, তুমি ওদের ভাঁড়ার-ঘরে যেতে দিয়েছিলে কেন?

বউদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। বঁটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিলেন,

আমি কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা কেউ? তুমি বাড়ি থেকে সবে বেরুবে, আর অমনই সমস্ত বাড়ি মাথায় ক'রে দাপাদাপি করবে ওরা। আমি কি করব, বল?

ভন্‌টু কিছু না বলিয়া শন্‌টু ও ফন্‌তিকে একটা ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া খিল দিল। তাহার পর আলমারির মাথা হইতে বেতটা পাড়িয়া মার শুরু করিল। চোরের শাস্তি! দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের মত ভন্‌টু বেত চালাইতে লাগিল। তাহার যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। শন্‌টু ও ফন্‌তির আর্ত হাহাকারে সমস্ত বাসাটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাকি শিশুগুলি ভয়ে শুষ্কমুখে নীরবে এক কোণে বসিয়া কাঁপিতেছিল, কারণ তাহারাও অপরাধী, তাহারাও লুকাচুরি খেলিয়াছিল। বউদিদি নীরবে নির্বিকারভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। বাকু কানে কিছুই শুনিতে পান না, সুতরাং তিনিও নির্বিকারভাবে তাম্রকূট-চর্চায় মগ্ন রহিলেন। ভন্‌টু আজ যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। মারিতে মারিতে বেতটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল, তবু তাহার রাগ কমিতেছে না। কতক্ষণ এভাবে চলিত বলা যায় না, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা খোলাই ছিল। শঙ্কর সন্ধ্যা পর্যন্ত মিষ্টিদিদির নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে রাস্তায় ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ভন্‌টুকে লইয়া সেই জ্যোতিষীর বাড়ি গেলে হয়। ধার করিয়া কিছু টাকা যোগাড় করিয়া তাই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কোষ্ঠীর ছক তো ভন্‌টুর কাছেই আছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়াই এই নিদারুণ কোলাহল শুনিয়া সে দ্বারের নিকটেই থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড!

শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি উঠিয়া পড়িলেন, প্রতিকারের যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে গিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঠাকুরপো বড্ড রেগে গেছে, তুমি যদি পার একটু সামলাও ওকে। আমি বললে কিছু হবে না, বরং উল্‌টে আরও রেগে যাবে। সেইজন্যে আমি কখনও কিছু বলি না।

শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, তুমি

একটু ডাক ওকে শঙ্কর-ঠাকুরপো, অনেকক্ষণ ধ'রে বড্ড মারছে, আহা! ম'রে গেল ওরা!

বউদিদির কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বদ্ধ দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল—ভনটু, এই ভনটু, কপাট খোল্—করছিস কি তুই?

শঙ্করের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভনটুর যেন চৈতন্য হইল, সে বেতটা ফেলিয়া দিয়া কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল্, বাইরে চল্। থাম্, টিন্‌চার আইওডিনটা লাগিয়ে দিয়ে আসি আগে।

কিসে টিন্‌চার আইওডিন লাগাবি?

কেটে গেছে, ওই নিয়ে পরে আবার আমাকেই ভুগতে হবে।

ভনটু টিন্‌চার আইওডিন লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চল্, বাইরে চল্।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাপার কি বল্ তো? হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভনটু উত্তর দিল, শরীরে রক্তমাংস আছে ব'লে।

রক্তমাংস আছে ব'লে তুই খুন করবি?

ভনটু উত্তর দিল না। অন্ধকার গলিটা উভয়ে নীরবেই পার হইল। বড় রাস্তায় পড়িয়া শঙ্কর দেখিল, ভনটু দুই হাতে চোখ কচলাইতেছে এবং চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে।

কি হ'ল?

পোকা না কি একটা পড়েছে মনে হচ্ছে।

রাস্তার একটা কলে তখনও জল ছিল এবং কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছিল। ভনটু সেখানে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ ধুইয়া ফেলিল। পকেট হইতে মলিন রুমালটি বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল, পয়সা আছে সঙ্গে?

আছে কিছু, কেন বল্ দেখি?

সহাস্যে ভন্টু বলিল, ভয়ানক খিদে পেয়েছে। চল্, একটা চায়ের দোকানে ঢোকা যাক।

চল্।

কাছে-পিঠে মনোমত চায়ের দোকান পাওয়া গেল না। উভয়ে পুনরায় হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ভন্টু বলিল, উঃ, পেটের ভেতর যেন একটা শেয়াল ঢুকেছে, নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

শঙ্কর কিছু বলিল না। সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় ভন্টুকে লইয়া জ্যোতিষীর বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কি না! রিনির কথাটা এখন ভন্টুকে বলা কি উচিত? তা ছাড়া—

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল। একটা ভাল চায়ের দোকান চোখে পড়িতেই ভন্টু বলিল, চল্, জেকলিশ অ্যাফেয়ারে ঢোকা যাক।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, তোর কানা করালীর ঠিকানাটা কি রে?

কেন?

যাব সেখানে, একটু প্রাইভেট দরকার আছে।

চল্, আমিও যাচ্ছি।

আমাকে একা যেতে দে আজ, পরে সব বলব তোকে।

মটন চপটা বাগাইতে বাগাইতে ভন্টু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল।

পরে সব বলব তোকে, আজ আমাকে একা যেতে দে ভাই।

ভন্টু চপে একটা কামড় বসাইয়াছিল, উত্তর দিল না। মাংসটা গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, দেখিস, গাড্ডায় পড়িস না যেন, করালী সোজা লোক নয়।

শঙ্কর বলিল, সে আমি ঠিক ক'রে নেব তাকে। আমার ছকটা কোথা?

আমার পকেটেই ডায়েরিতে টোকা আছে। আগে তুই খেয়ে নে না, সব দিচ্ছি আমি।

উভয়ে আহার করিতে লাগিল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া করালীচরণ তাড়াতাড়ি বাক্সটি লুকাইয়া ফেলিলেন ও হাতের আয়নাটি টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া বলিলেন, কে ?

আমি শঙ্কর, কপাটটা খুলুন একবার।

বাই নারায়ণ !

অস্ফুটস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া করালীচরণ উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন।

কি চান আপনি ?

ভন্টুর উপদেশ অনুযায়ী শঙ্কর হেঁট হইয়া প্রণাম করিল ও বলিল, কুষ্ঠি গণনা করাতে এসেছি।

এখন হবে না।

ভন্টুর কাছ থেকে আসছি আমি। ভন্টু এই টাকা দশটা আর ছকটা দিতে বললে আপনাকে।

ভন্টুবাবু পাঠিয়েছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসময়ে যত বখেড়া ভন্টুবাবুর !

সহসা করালীচরণের চক্ষুটি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আমি কি ভন্টুবাবুর চাকর ? টাকা দশটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি আমার মাথাটা কিনে ফেলবেন ভেবেছেন নাকি ?

ভন্টুর নির্দেশ অনুযায়ী শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল ও সবিস্ময়ে এই একচক্ষু জ্যোতির্বীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। বোতলের মুখে গোঁজা মোমবাতি জ্বলিতেছে, কাছে আর একটা মদের বোতল, ফাটা একটা গ্লাস, চতুর্দিকে এলোমেলো স্তূপীকৃত একগাদা বই।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছকটা দেখিতেছিলেন।

কার কুষ্ঠি এটা ?

আমার।

বেশ, কাল আসবেন।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বড় উদ্বেগের মধ্যে আছি, একটা কথা যদি শুধু ব'লে দিতেন, তা হ'লে বড় উপকার হ'ত আমার।

ঘোড়াটা কি বাইরে বেঁধে রেখে এসেছেন? বাই নারায়ণ! এসব কি তাড়াতাড়ির জিনিস? কি জানতে চান আপনি? একসঙ্গে হবে।

আমার বিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাই খালি—কবে হবে আর কি রকম স্ত্রী হবে?

বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চক্ষুটিতে বিদ্রূপ-করুণা-মিশ্রিত অদ্ভুত একটা চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। আর একবার ছকটার পানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ঘুরে আসুন তা হ'লে।

কতক্ষণ পরে আসব?

ঘণ্টা দুই পরে। এখন কটা বেজেছে?

আটটা।

দশটা নাগাদ আসবেন। দশটার বেশি দেরি করবেন না যেন, দশটার পর আমি বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা।

নমস্কার করিয়া শঙ্কর বাহির হইয়া গেল।

করালীচরণ খানিকটা মদ্যপান করিয়া মুখবিকৃতিসহকারে স্বগতোক্তি করিলেন, বাই নারায়ণ! এসব কান্ট্রি-ফান্ট্রি কি আমার পোষায়! ভন্টু-বাবুর ধাপ্পায় প'ড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

মুখটা মুছিয়া খানিকক্ষণ তিনি মোমবাতির শিখাটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লুকানো ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আগ্রহভরে সেটি খুলিয়া চ্যাপ্টা সাদা-গোছের কি একটা বাহির করিয়া অতিশয় কৌতূহলভরে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া টেবিলের উপর হইতে উপুড়-করা আয়নাটা তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে সেই চ্যাপটা বস্তুটি চক্ষুহীন অক্ষিকোটরের ভিতর বসাইয়া দিয়া বিস্মিত

দৃষ্টি মেলিয়া দর্পণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পাথরের চোখ। নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছে না তো! স্পন্দিতবক্ষে করালীচরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আয়নাটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং করিয়া শব্দ হইল—সাড়ে আটটা বাজিল বোধ হয়। করালীচরণ চক্ষুটি খুলিয়া রাখিয়া শঙ্করের ছকে মনোনিবেশ করিলেন।

শঙ্কর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর যদিও একই চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সে যদিও রিনির কথাই ভাবিতেছিল; কিন্তু পরিপূর্ণ নদীস্রোতে ভাসিয়া-আসা একটা ফুল যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নদীকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া ছোট ফুলটাকেই আমরা যেমন লক্ষ্য করি, আজিকার সন্ধ্যায় ভন্টুর বাড়ির ব্যাপারটাও তেমনই শঙ্করের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিল। বউদিদির আর্ত অসহায় মুখচ্ছবিটা কিছুতেই সে ভুলিতে পারিতেছিল না। এখনও যেন তাহার কানে বউদিদির করুণ কথাগুলি বাজিতেছে, আহা, ম'রে গেল ওরা! ভন্টুটা সময়ে সময়ে এমন নিষ্ঠুরও হইতে পারে! অথচ সে বেচারারই বা দোষ কি? এমন অবস্থায় কাহার না রাগ হয়? কত দিক সামলাইবে সে? সমস্ত মাসের খরচ এক ভাঁড় তেল পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে রাগ হয় বইকি! এই তো সে এখনই আবার হন্যে কুকুরের মত টাকা ধার করিতে ছুটিল—দাদাকে টাকা পাঠাইতে হইবে, বাবাকে বালাপোশ করাইয়া দিতে হইবে। বাকুর জামা আছে, র‍্যাপার আছে, সোয়েটার আছে, কান-কাটা টুপি আছে, তথাপি বালাপোশ দরকার। শীতটা ফুরাইয়া যাইবার পূর্বেই বালাপোশটা করাইয়া দেওয়া চাই, তাহা না হইলে বউদিদিরই মুশকিল—বাক্যবাণ তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইবে। অথচ ভন্টুর কতই বা আয়? ধার করিয়া চলিতেছে। সেই চায়ের দোকানের ভদ্রলোকের সহিত আলাপ জমাইয়াছে, উদ্দেশ্য—যদি কিছু সেখান হইতে হস্তগত করিতে পারে।...সহসা শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। মনিব্যাগটা খুলিয়া দেখিল, গোটা দশেক টাকা এখনও আছে। এক মাসে কত তেল খরচ হয়? কিছুই তো জানে না সে।

পৃথিবী হইতে কোন্ নক্ষত্রের দূরত্ব কত 'লাইট ইয়ার', তাহা সে হয়তো নির্ভুল বলিতে পারিবে; কিন্তু একটা সাধারণ সংসারে মাসে কত চাল ডাল নুন তেল লাগে, এ সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। কিছু দূর হাঁটিয়া সে একটা মুদীর দোকান পাইল। সেখানে গিয়া উপবিষ্ট দোকানদারটিকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, সের পাঁচেক সরষের তেলে একটা সংসারের এক মাস চলা উচিত, কি বলেন?

মুদী যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিল, সে সংসার বুঝে, রাবণের সংসারে পাঁচ সের তেলে কি হবে?

রাবণের সংসার নয়, ছোটখাটো সাধারণ সংসার, দু-তিনজন বড় লোক, চার-পাঁচটি ছেলেপিলে। পাঁচ সেরে হবে না?

ভেসে যাবে।

দিন তা হ'লে পাঁচ সের তেল আমাকে। আর একটা পাত্রও আপনাকেই দিতে হবে, একটা টিন-ফিন হ'লেই ভাল হয়।

দিচ্ছি সব ঠিক ক'রে, বসুন আপনি। ওরে, মোড়াটা এগিয়ে দে, আর মহেশের দোকান থেকে পাঁচসেরী একটা টিন আন্‌গে চট ক'রে।

দোকানের বালক-ভৃত্যটি মোড়া আগাইয়া দিয়া টিন আনিতে চলিয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই টিন আনিয়া হাজির করিল।

মুদী টিনটি ওজন করিয়া তাহার পর তেল মাপিতে বসিল।

ভাল তেল তো? একটু ভাল দেখে দেবেন দয়া ক'রে।

মুদী ওজন-দাঁড়ির পাল্লার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে সহাস্যে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল জিনিস দেব বইকি। খাঁটি ঘানির তেল। নসীরামের দোকানে চালাকিটি চলবার জো নেই। খেয়ে অপছন্দ হয়, নগদ মূল্য ফেরত দিয়ে দেব।

ওজন সমাপ্ত করিয়া পাঁচ সেরের উপরে আরও এক পলা ফাউ দিয়া টিনের মুখটি মুদী বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল এবং শঙ্করের প্রদত্ত মূল্য বেশ করিয়া বাজাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কাঠের বাক্সের ছিদ্রমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

শঙ্কর মুদীর কার্যতৎপরতায় খুশি হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নামই কি নসীরাম?

আজ্ঞে না, আমার ঠাকুরের নাম নসীরাম, অধীনের নাম কেবলরাম।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে, নমস্কার।

কেবলরাম সবিনয়ে প্রতি-নমস্কার করিল।

তেলের টিন লইয়া শঙ্কর একটা রিক্‌শ করিল। রাস্তায় একটা ঘড়িতে দেখিল, পৌনে নয়টা বাজিয়াছে। রিক্‌শ এবং ট্রামের সহায়তায় সে অনায়াসে ভন্টুদের বাড়িতে তেলটা দিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ভন্টু এখন বাড়িতে নাই সে জানে, সুতরাং বেশি দেরি হইবে না।

ভন্টুর বাড়ির সামনে রিক্‌শ হইতে নামিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। কিন্তু এত দূর যখন আসিয়াছে, ফেরা যায় না,—কড়া নাড়িতে হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল।

আচ্ছা ঠাকুরপো, আপিস থেকে এসে না খেয়েই—

বউদিদি শঙ্করকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

বন্ধুটি কোথায়?

সে এক জায়গায় গেছে, এই তেলটা কিনে দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে বললে। এই নিন।

তেলের টিনটা সে নামাইয়া দিল।

পৌঁছে দিতে বললে?

হ্যাঁ।

বউদিদির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একটু থামিয়া বলিলেন, আপিস থেকে এসে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত মুখে দেয় নি। আমাকে এমন শাস্তি দেওয়া কেন?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।

না, এখন আর বসব না, দরকারী কাজ আছে একটু আমার।

শঙ্কর আর দাঁড়াইল না। বউদিদির মুখের দিকেও আর চাহিতে পারিল না। মুখটা ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িল। রাস্তা হইতে সে শুনিতে পাইল, বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিতেছেন, বউমা, চায়ের জল চড়াও।

করালীচরণের গলিতে শঙ্কর আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন পৌনে দশটা। শীতকালের রাত্রি। গলিটা নির্জন হইয়া পড়িয়াছে। গলির মোড়ের পানের দোকানটা এখনও কেবল খোলা আছে। শঙ্কর কপাটে আঘাত করিতেই করালীচরণ বলিলেন, ভেতরে আসুন, কপাট খোলা আছে।

কপাট ঠেলিয়া শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। এক চক্ষুর দৃষ্টি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া করালীচরণ বলিলেন, আপনার বিয়ের এখন ঢের দেরি। বছর দেড়েকের আগে তো হচ্ছেই পারে না।

শঙ্করের পায়ের তলার মাটি সহসা যেন সরিয়া গেল। তথাপি সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং স্থিরকণ্ঠেই পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমার স্ত্রী কি রকম হবে একটা আইডিয়া দিতে পারেন?

নিশ্চয় পারি। শ্যামবর্ণা, নাতিদীর্ঘাঙ্গী—

লেখাপড়া কিছু জানবে কি?

বাই নারায়ণ, ওটা তো দেখি নি! দেখি, দাঁড়ান। বসুন আপনি।

করালী আবার ঝুঁকিয়া পুঁথিপত্র উলটাইতে লাগিলেন। শঙ্কর চৌকির এক পাশে বসিল। কয়েক মিনিট পরে করালীচরণ বলিলেন, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। তবে মেয়েটি লক্ষ্মী হবে।

লেখাপড়া কিচ্ছু জানবে না?

কই, সে রকম তো মনে হচ্ছে না কিছু।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। লোকটার সম্বন্ধে তাহার ধারণাই সহসা বদলাইয়া গেল। মনে মনে 'বোগাস' কথাটা উচ্চারণ করিয়া মুখে সে বলিল, আচ্ছা, উঠি এখন তবে আমি—নমস্কার।

দ্রুতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া করালীচরণ স্বগতোক্তি করিলেন, ছোকরার বউ পছন্দ হ'ল না। বাহ্ নারায়ণ! জোটেও ভন্টুবাবুর কাছে সব!

করালীচরণ উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে একটি রমণীমূর্তি আসিয়া দর্শন দিল। কালো কুচকুচে রঙ, বয়স কত তাহা বলা অসম্ভব, গালের হাড় উঁচু হইয়া রহিয়াছে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, চোখে কাজল, দাঁতে মিশি। মোড়ের সেই পানওয়ালী।

হাসিয়া বলিল, ও গণকঠাকুর, হারিয়েছে তোমার কিছু?

করালীচরণ রোষদীপ্ত চক্ষে নারীটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ফের আসিয়াছে!

ফের তুই এসেছিস এখানে? মানা ক'রে দিয়েছি না তোকে?

বাবা রে বাবা! এক চোখেই যেন আগুন ছুটছে! এসেছি কি নিজের গরজে নাকি? দশ টাকার নোটটা তখন সিগারেট কিনতে গিয়ে ফেলে এসেছিলে আমার দোকানে, তাই দিতেই এসেছি। ভালর কাল নেই। এই নাও।

করালীচরণের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হইয়া উঠিল।

দূর হ তুই—চাই না নোট—দূর হ তুই।

পানওয়ালী নোটটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, খুব রাগ করিয়াই যাইতেছে, কিন্তু পিছু ফিরিয়া হঠাৎ একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

করালীচরণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩১

সার্পেণ্টাইন লেনের একটি বাড়ির বাহিরের ঘরে ভন্টু ও নিবারণবাবু বসিয়া ছিলেন। নিবারণবাবু লোকটির সহিত ইতিপূর্বে আমাদের যৎসামান্য পরিচয় হইয়াছে। নিবারণবাবু সেই চায়ের দোকানের মালিক, যে চায়ের

দোকান কিছুদিন পূর্বে ভন্টু ও শঙ্কর প্রোটোটাইপের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, এবং যিনি ওয়েস্ট-কোট-পরিহিত মাস্টারের সঙ্গে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে উঠিয়া আসিয়া ভন্টুর দ্বারা করকোষ্ঠী বিচার করাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই নিবারণবাবুর সহিত ভন্টুর পরিচয়, এবং মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে যাতায়াত করিয়া ভন্টু সেই পরিচয়টিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। নিবারণবাবু ভন্টুর নানা গুণে মুগ্ধ। ভন্টুও নিবারণবাবুর মধ্যে একটি সহৃদয় মানুষ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে। নানারূপ ধান্দা-ফিকির করিয়া ভন্টুকে যে শুধু সংসার চালাইতে হয় তাহা নহে, অসুস্থ অগ্রজকে টাকা পাঠাইতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে নানাজাতীয় লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। কখন কাহার নিকট হইতে কোন্ উপকার পাওয়া যায় কে বলিতে পারে? নিবারণবাবু লোকটি কেবল সহৃদয় তাহাই নয়, শাঁসালোও। সুতরাং বারম্বার তাঁহার পদধূলি লইয়া, করকোষ্ঠী বিচার করিয়া, তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়া (ভন্টু আজকাল হোমিওপ্যাথি লইয়া নাড়াচাড়া করে) এবং ছোটখাটো নানা ব্যাপারে তাঁহার উপকার করিয়া ভন্টু নিবারণবাবুর অন্তরঙ্গ হইয়াছে।

নিবারণবাবু লোকটি পুরাকালে আসাম-অঞ্চলে চা-বাগানে কাজ করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নির্ঝঞ্ঝাট নন, দুইটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, গৃহিণীটি সর্বদাই অসুস্থ। এতদ্ব্যতীত মাস্টার নামক ব্যক্তিটি পূর্বপরিচয়ের সুযোগ লইয়া কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্কন্ধারূঢ় হইয়াছেন। আসামের চা-বাগানে যখন ছিলেন, তখনই এই মাস্টারের সহিত তাঁহার আলাপ। চমৎকার পাশা খেলিতে পারেন, চমৎকার চা বানাইতে পারেন, চমৎকার তবলা বাজাইতে পারেন এবং চমৎকার মাংস রাঁধিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চতুর্বিধ গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও মাস্টার বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারেন না। একটা অবশ্য সুবিধা আছে, তিনকুলে তাঁহার কেহ নাই। একটা পেট, কোন রকমে চলিয়া যাইবার কথা; কিন্তু কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে, তাহা চলাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় পূর্বপরিচিত নিবারণবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায় সমস্যার অনেকটা

সমাধান হইয়াছে। চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবু গুণী মাস্টারকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। গৃহিণীকে বলিতে হইয়াছে যে, চায়ের দোকানে কাজ এত বেশি যে, ম্যানেজার-জাতীয় একজন লোক না রাখিলে চলিতেছে না। খাওয়া-পরা এবং মাত্র পাঁচ টাকা মাহিনায় এমন একজন ভাল পরিচিত লোক যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। সস্তায় এমন একটা লোকের কর্মপটুতার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নিবারণ-গৃহিণী আপত্তি করেন নাই। মাস্টারের অবসর-বিনোদনের জন্য চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন নিবারণবাবুকে তাঁহার সহিত বসিয়া পাশা খেলিতে হয় এবং তবলা বাজাইবার সুযোগ দিবার জন্য সেতার বাজাইতে হয়। নিবারণবাবু আসাম-অঞ্চলে যখন ছিলেন, তখন তাঁহার একটু-আধটু সেতার বাজানোর শখ ছিল; কিন্তু বহুকাল চর্চা নাই, হাত আর তেমন চলে না। কিন্তু মাস্টারের প্ররোচনায় পড়িয়া আবার তাঁহাকে সাধনা করিতে হইতেছে, অর্থাৎ চায়ের দোকানে চা যত না বিক্রয় হউক, পাশা-খেলা এবং সেতার-তবলা পুরাদমে চলিয়া থাকে।

এখনও মাস্টার দোকান হইতে ফেরেন নাই। ভন্টু এই খানিকক্ষণ হইল আসিয়াছে। ভন্টুর সাহচর্য নিবারণবাবুর অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, চা হবে নাকি ভন্টুবাবু?

ভন্টু বলিল, কেন ফর নাথিং কথা ব'লে সময় নষ্ট করছেন?

ফর নাথিং মানে?

নিবারণবাবুর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। এতদিন আলাপের পরও তিনি ভন্টুবাবু লোকটির কথাবার্তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

চা তো না খাইয়ে ছাড়বেন না জানি, অনর্থক কচলা-কচলি ক'রে লাভ কি? আপনাকে চিনি না!

ভন্টু চট করিয়া নিবারণবাবুর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

আহা-হা, কি যে করেন আপনি! এই অভ্যেসটা আপনার ভারি খারাপ, যাই বলুন, ওতে অপরাধ হয়।

অপরাধ কিসের? আমরা এক জাত, আপনিই বয়োজ্যেষ্ঠ—

তা হোক, তবু ঠিক নয় এটা। আপনাকে বলাও বৃথা।

ভন্টু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, চা আনতে বলুন।

দার্জি, দার্জি, ওরে দার্জি!

কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া নিবারণবাবু উঠিয়া গেলেন। নিবারণবাবুর কন্যা দুইটির নাম একটু অদ্ভুত। বড়টির নাম দার্জিলিং, ছোটটির নাম আসাম। ভৌগোলিক কোন কারণে নয়, দুই প্রকার চায়ের নাম অনুসারেই তিনি কন্যা দুইটির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম দুইটি ডাকনাম। দার্জিলিঙের ভাল নাম শ্যামলী, আসামের ভাল নাম যমুনা। দুইজনেরই রঙ চায়ের পাতার মত কালো, হয়তো চা-ব্যবসায়ী নিবারণবাবু সেইজন্যই তাহাদের চায়ের নামে নামকরণ করিয়াছেন। দৈবক্রমে উভয়ের নামের সঙ্গে চরিত্রও ভারি খাপ খাইয়া গিয়াছে! দার্জিলিং চায়ে যেমন গন্ধ বেশি লিকার কম, নিবারণবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও সেইরূপ—একটু ভাবময়ী, কাজকর্মে তেমন পটু নয়, ইংরেজীতে যাহাকে বলে আর্টিস্টিক। আসাম ঠিক ইহার উল্টা, ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, বাড়ির কাহারও সঙ্গে তাহার ভাব নাই—কোন্দল করাই তাহার স্বভাব, কিন্তু খাটিতে পারে অসম্ভব—রান্নাঘরের সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী।···নাঃ, এ মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, হরদম সেলাই!—বলিতে বলিতে নিবারণবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একটা বিরক্তির ভাব চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, হাড়ির হাল হবে দেখছি মেয়েটার!

ভন্টু সব বুঝিতেছিল, তথাপি প্রশ্ন করিল, কার?

কার আবার, দার্জির। গিয়ে দেখি, লণ্ঠনের আলোয় ঝুঁকে প'ড়ে একটা কাপড়ের ওপর রেশমী সুতো দিয়ে ফুল তোলা হচ্ছে। টেবিলক্লথ হবে। নিজেদেরই ক্লথ জোটে না, টেবিল-ক্লথ! আর টেবিলই কোথা যে, টেবিল-ক্লথ পাতবি! ঝঞ্ঝাট বুঝুন, কাল বলবে—টেবিল চাই, ক্লথ পাতব।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ভন্টু বলিল, জুতে দিন।

আরে মশাই, জুতে দিতে কি আমি অরাজী? কিন্তু পাত্র কই? এক-

একটা খুঁজে-পেতে আনি, জলখাবার খায়, স'রে পড়ে। এই আমরাও তো বিয়ে করেছিলাম মশাই, রঙ নিয়ে তো মাথা ঘামাই নি। আজকাল সবাই চায় গোলাপী রঙ, ভুলে যায়—এটা বাংলা দেশ, বসোরা নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, বাবাও আমার বেছে বেছে এমন একটি রক্ষে-কালীর বাচ্চার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশটাই কালো হয়ে গেল। মুক্তোকেশী বেগুনের গাছে আপেল ফলবে কি ক'রে, বলুন ?

ভন্টু স্মিতমুখে বসিয়া রহিল। এ সব কথায় সায় দেওয়াও বিপদ, প্রতিবাদ করাও বিপদ। আসল কথাটা অর্থাৎ টাকার কথাটা সে কখন কি ফাঁকে পাড়িবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। এতদিন নিবারণবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভন্টু তাঁহার নিকট টাকার কথা উত্থাপনও করে নাই কোনদিন। অথচ উত্থাপন না করিলেও আর চলিতেছে না। কিছু টাকা অবিলম্বে চাইই। ধার-করা ব্যাপারে প্রথম সঙ্কোচটা কাটাইয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে পরে আর কোন গোলমাল হয় না। শুভ-অশুভ যাহা হোক, একটা মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু নিবারণবাবুর এই ক্ষোভের মুখে কথাটা পাড়িতে তাহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। হঠাৎ একবার 'না' বলিয়া ফেলিলে সেটাকে 'হাঁ' করিতে আবার বেশ কিছুদিন হয়তো সময় লাগিয়া যাইবে, হয়তো হইবেই না। ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনার ছোট মেয়েকে চুলকুনির যে একটা ওষুধ দিয়েছিলাম—

অদ্ভুত ফল হয়েছে মশাই, একেবারেই সেরে গেছে। আমাকেও এক ডোজ দেবেন তো, আঙুলের গলিগুলোতে আমারও হয়েছে।—বলিয়া তিনি চুলকাইতে লাগিলেন।

আচ্ছা, কাল আনব।

মাস্টার আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ভন্টুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ভ্রূযুগল নাচাইলেন—ভাবটা এই যে, আসিয়াছেন দেখিতেছি!

নিবারণবাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি চ'লে আসার পর খদ্দের-টদ্দে [illegible] সেছিল দু-একটা ?

খদ্দের !

এমন একটা বিস্ময়সূচক ভঙ্গীতে মাস্টার কথাটি উচ্চারণ করিলেন যে, যেন নিবারণবাবু অতিশয় অসম্ভব একটি প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মাস্টারের দৃষ্টি দেখিয়া নিবারণবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, মানে, আসেও তো মাঝে—

রাত্তির নটার পর কার দায় পড়েছে এই গলিতে চা খেতে আসবে ! একদিনও তো দেখি নি।

নিবারণবাবু প্রত্যুত্তরে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু এমন একটা মুখভাব করিয়া ভন্টুর দিকে চাহিলেন যে, বোঝা গেল, তিনি কথা-কাটাকাটি করিয়া কথা বাড়াইতে চাহেন না বটে, কিন্তু নয়টার পর কখনও তাঁহার দোকানে খরিদ্দার আসে না—এ উক্তি তিনি মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহেন। ভন্টু একটু হাসিল মাত্র। মাস্টার বসিলেন। এমন সময় দার্জি দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল। দার্জিলিঙের রঙ মায়ের মত, মুখশ্রী বাবার মত। বয়স বছর ষোলো-সতেরো। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে চায়ের পেয়ালা ভন্টু ও নিবারণবাবুর হস্তে দিয়া সে চকিতে একবার মাস্টারের পানে চাহিয়া দেখিল। মাস্টার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন, বলিলেন, আমি আর খাব না এখন, চার পেয়ালা হয়ে গেছে।

দার্জি ভিতরে চলিয়া গেল।

নিবারণবাবু পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়াই বলিলেন, কাণ্ডটা দেখেছেন !

ভন্টু তখনও চুমুক দেয় নাই, বলিল, কি, লাইট হয়েছে বুঝি ?

খেয়ে দেখুন না মশাই, লাইট তো হয়েইছে, চিনি পর্যন্ত দেয় নি। ওরে আস্‌মি ! আস্‌মি !

আসাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল।

চিনি নিয়ে আয় তো একটু। দার্জি চায়ে চিনি দেয় নি।

আসাম একটু পরেই চিনির টিন ও একটি চামচ লইয়া আসিয়া প্রবেশ

করিল এবং হাসি চাপিতে চাপিতে উভয়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইয়া দিয়া গেল। আসামের বয়স বছর চৌদ্দ হইবে, বেশ চালাক চটপটে মেয়ে, রঙ কালো হইলেও দার্জির মত অতটা কুশ্রী নয়।

চা পান করিতে করিতে নিবারণবাবু বলিলেন, ভন্টুবাবু, আপনি তো পাঁচ জায়গায় ঘোরেন—একটু খোঁজখবর রাখবেন, মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে একটু ঝাড়া-হাত-পা হওয়া যায়।

ভন্টু বলিল, বাজার বড় খারাপ। কি বলেন মাস্টারবাবু?

মাস্টার বলিলেন, হাঃ।

চা পান শেষ করিয়া ভন্টু উঠিয়া পড়িল। ভাবিয়া দেখিল, টাকার কথাটা এখন পাড়িলে ঠিক সুবিধাজনক হইবে না, অথচ প্রয়োজন কালই। কাল একবার আসিতে হইবে। উপায় কি?

এইবার উঠি আমি।

এরই মধ্যেই উঠবেন?

হ্যাঁ, কাজ আছে, আবার আসব কাল।

ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

ভন্টু চলিয়া গেলে মাস্টার খুব রহস্যময় একটি উক্তি করিলেন।

দাঁও মাফিক খুব একটা দামী কারবার করেছি আজ।

চায়ের সেই এজেন্টটা এসেছিল নাকি? আমি তাকে পাঁচ আনা পাউণ্ডের বেশি দর দিতে রাজী নই, তুমি আবার বেফাঁস কিছু বল নি তো?

আরে, না না। তুমি যে ধাঁ ক'রে একেবারে অন্য লাইনেই চ'লে গেলে!

অন্য লাইনে মানে? ঠিক লাইনেই আছি। ওই ডাস্ট চায়ের পাঁচ আনার বেশি দর দেওয়া যায়?

কি মুশকিল, কথাটা শোনই শেষ পর্যন্ত। আমি বলছি গতের কথা, তুমি একেবারে চায়ের এজেণ্ট এনে ফেললে!

গৎ? কিসের গৎ?

কি আশ্চর্য, আকাশ থেকে পড়লে যে একেবারে! বলি নি তোমাকে পরশুদিন যে, হোসেন মিঞা সেতারীর খুব ভাল একটা গতের খাতার সন্ধান

পেয়েছি একজনের কাছে? অনেক ভৈরবী ক'রে তিলোককামোদটা টুকে এনেছি আজ। দেখে এলাম, ইয়া মোটা খাতা—বহু গৎ আছে। দাঁড়াও না, সব হাতাব ক্রমশ; চা-টা খাইয়ে লোকটাকে খুব তোয়াজ করেছি আজ। একটু যেন ভিজেছে মনে হচ্ছে।

এতবড় একটা সুসংবাদ শুনিয়াও কিন্তু নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন না। নীরবে পকেট হইতে বিড়ির কৌটাটি বাহির করিয়া নীরবেই একটি বিড়ি ধরাইয়া ধূম্র উদ্‌গিরণ করিলেন। গতের খাতার মালিক সেই রোগা লম্বা লোকটিকে তিনি দেখিয়াছেন এবং মাস্টারের সঙ্গে ভাব জমাইয়া সে যে দোকানে মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় চা খাইয়া যাইতেছে, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। চা যাক, দুই-এক পেয়ালা চায়ে বিশেষ আসিয়া-যাইবে না, কিন্তু কাল হইতে উক্ত তিলোককামোদ গৎ তাঁহার উপর ভর করিবে—ইহাই ভাবিয়া নিবারণবাবু একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। 'পিলু'টাকে লইয়াই তো নাজেহাল হইতে হইয়াছে। এ বয়সে কি আর ওসব পোষায়! অথচ মাস্টার লোকটা নাছোড়বান্দা, তবলা তিনি বাজাইবেনই; এবং মুশকিল এই যে, তবলা যন্ত্রটা একা একা বাজানো যায় না।

সঙ্গত করিবার জন্য নিবারণবাবুকে সেতার বাজাইতে হয়।

এককালে অবশ্য খুবই শখ ছিল, কিন্তু এখন আর ওসব পোষায় না। নিতান্ত মাস্টারের খাতিরেই তিনি রাজী হইয়াছেন। শরণাগত আশ্রিত লোককে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না, লোকটা গুণীও বটে। অথচ—

কাল থেকে গৎখানায় হাত দিয়ে ফেল, দু-তিন দিনে রপ্ত ক'রে ফেলা চাই।

বিড়িতে একটা টান দিয়া বিমর্ষ নিবারণ বলিলেন, দেখি।

সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলিত, কিন্তু অকস্মাৎ ভন্টুর পুনরাবির্ভাবে তাহা আর ঘটিল না। ভন্টু প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদা, ঘোর জালে প'ড়ে এসেছি।

কি হ'ল?

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মনিব্যাগ গ্যাণ্ডিফায়েড।

গ্যাণ্ডিফায়েড! মানে? পকেট-মারা গেছে নাকি?

স্টোন ডেড।

এখানে ফেলে-টেলে যান নি তো?

দেখুন।

সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই খোঁজ হইল, মনিব্যাগ পাওয়া গেল না।

ভন্টু বলিল, ওতেই আমার যথাসর্বস্ব ছিল দাদা। গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিন, কাল থেকে তা না হ'লে ফাস্টিং আপিস খুলতে হবে। দয়া করুন দাদা।

ভন্টু নিবারণের পদধূলি লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

আহা! টাকা আপনাকে দিচ্ছি, অমন করছেন কেন? বসুন।

ভন্টু উপবেশন করিল।

৩২

শিরীষবাবুর বাসায় বসিয়া মুকুজ্জেমশাই পত্র লিখিতেছিলেন। শিরীষবাবুর কন্যা অমিয়া আসিয়া হাজির হইল। অমিয়ার বয়স বারো বছরের বেশি নয়, বোধ হয় কমই হইবে। অথচ ইহারই বিবাহের জন্য শিরীষবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহারই জন্য পাত্র-সংগ্রহ-কার্যে মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন—এ কথা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। এখনও মুকুজ্জেমশাই সেই কার্যেই ব্যাপৃত আছেন। মুকুজ্জেমশাইয়ের স্বভাবের বিশেষত্ব—যখন যাহাতে লাগেন, তাহার চরম করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য সহজ কঠিন সরল জটিল যত প্রকার উপায় মাথায় আসে সবগুলিই করিয়া দেখেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কলিকাতার এবং মফস্বলের যাবতীয় কলেজ হইতে অবিবাহিত কায়স্থ যুবকগণের নাম-ধাম-পরিচয় সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। ফলে, নানারকম চিঠিপত্র কোষ্ঠী জমিয়া এবং সেগুলি নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত হইয়া নানা

রঙের ফাইল স্ফীত করিয়াছিল। অর্থাৎ মুকুজ্জেমশাই ছোটখাটো একটা আপিস খুলিয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরনের কার্যেই তিনি আনন্দ পান এবং কার্যটি যতই দুঃসাধ্য ও জটিল হয়, ততই যেন তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। মধ্যবিত্ত বহু গৃহস্থের বহু কঠিন সমস্যার সমাধান মুকুজ্জেমশাই বহুবার নিঃস্বার্থভাবে করিয়াছেন। করিয়া আনন্দ পান, এইটুকুই বোধ হয় তাঁহার স্বার্থ।

এই সংক্রান্ত ছয়খানি চিঠি লেখা তিনি সকাল হইতে বসিয়া শেষ করিয়াছেন, সপ্তম চিঠিখানি লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া বলিল, মা বললে—আপনি হাত পা ধুয়ে আহ্নিক ক'রে নিন, আর ব'সে চিঠি লিখতে হবে না।

মুকুজ্জেমশাই লিখিতে লিখিতে একটু হাসিলেন।

এত চিঠি রোজ রোজ কোথায় লেখেন আপনি? এত লিখতেও পারেন!

মুকুজ্জেমশাই হাস্যস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই যে হয়ে গেল। এখন আর লিখব না, এইটে শেষ ক'রে নিই। আবার তিনি পত্ররচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অমিয়া মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিল। উজ্জ্বল শ্যাম মেয়েটির বর্ণ, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে নাক মুখ চোখে তেমন বিশেষ কোন সৌন্দর্য নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে মেয়েটির মুখশ্রীতে সুন্দর একটি লাবণ্য আছে। অতিশয় সরল পবিত্র অনাড়ম্বর অন্তরের প্রতিচ্ছবি সমস্ত মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া এমন একটি কোমল কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে।

অমিয়া আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এত চিঠি আপনি রোজ রোজ কাকে লেখেন দাদামশাই?

তোর শ্বশুর-ভাশুরকে।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ নয়—সত্যি তাই।

আমার তো বিয়ে হয় নি এখনও, শ্বশুর-ভাশুর পাবেন কোথা?

আছে এক জায়গায়।

কোথায় ?

তা এখন বলব কেন ?

মুকুজ্জেমশাই চিঠিখানি খামে পুরিতে পুরিতে খুব রহস্যময়ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। একটি প্রশ্ন অনেক দিন হইতেই অমিয়ার অন্তর আলোড়িত করিতেছিল, নিজে সে ইহার সমাধান করিতে পারে নাই, অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করা চলে বোধ হয়। একটু ইতস্তত করিয়া অমিয়া শেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল, আচ্ছা দাদামশাই, শিবপুজো করলে শিবের মত বর হয় ?

নিশ্চয়।

ওইরকম ?

অমিয়া দেওয়ালে টাঙানো একটি মহাদেবের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইল। একখানি ক্যালেণ্ডারের ছবি, জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত ভীষণ এক মহাদেব চক্ষু কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই চকিতে একবার ছবিটার পানে তাকাইয়া ছদ্মগাম্ভীর্যভরে বলিলেন, অবিকল।

অমিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ছবিটার পানে চাহিল। সে তো রোজ একাগ্রচিত্তে শিবপূজা করিয়া চলিয়াছে। ওইরকম বর হইবে শেষকালে! তাহার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিল।

আচ্ছা, সবাই তো শিবপুজো করে—বিলু, শান্তি, কমলি, টগর, সব্বারই শিবের মত বর হবে ?

সব্বারই।

রেণুদিও তো শিবপূজো করত, তার তো কেমন সুন্দর বর হয়েছে, ও-রকম তো হয় নি!

ভাল ক'রে পুজো করতে পারে নি তোমার রেণুদি, পারলে ঠিক ওই রকম হ'ত।

দরকার নেই বাবা ভাল ক'রে পেরে। ওইরকম বর চাই না।

মুকুজ্জেমশাই চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বলিলেন, বলতে নেই অমন কথা। শিব-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। বীরেন—অমিয়ার দাদা—বই খাতা লইয়া

প্রবেশ করিল। সে স্কুলে যাইতেছিল। অমিয়া বীরেন পিঠোপিঠি, সুতরাং অহি-নকুল সম্পর্ক। বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, নঞ্‌তৎপুরুষ, গল্প করা হচ্ছে তো ব'সে ব'সে? মা ডাকছে।

অমিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুকুজ্জেমশাইকে বলিল, দেখুন, ও আমাকে নঞ্‌তৎপুরুষ বলেছে! আচ্ছা, এস তুমি ইস্কুল থেকে, দেখাচ্ছি তোমাকে।

বীরেন চিমটিটি কাটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। মুকুজ্জেমশাই গম্ভীরমুখে বসিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। বীরেন সম্প্রতি ব্যাকরণ পড়িতে শুরু করিয়াছে। ন মিঞা = অমিয়া—এই বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ করিয়া সে অমিয়াকে নঞ্‌তৎপুরুষ আখ্যা দিয়াছে।

অমিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, ও কেন আমাকে নঞ্‌তৎপুরুষ বলবে খালি?

বীরেন বিদ্বান মানুষ, ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কত কি পড়ছে, আমি মুখ্যু-সুখ্যু লোক, ওর কথাবার্তা ভাল বুঝতেই পারি না, কি বলব, বল?

বিদ্বান, না, হাতী,—এবার তো সেকেন হয়ে গেছে।

শিরীষবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আপিস যাইতেছেন। পোস্ট-আপিসে চাকরি করেন। ভদ্রলোকের উদার প্রশস্ত মুখচ্ছবিতে কেমন যেন একটা ভালমানুষি মাখানো রহিয়াছে। গোঁফ দাড়ি কামানো, ভারী মুখ। শক্তির ব্যঞ্জনা থাকিলে ভয় উদ্রিক্ত করিত। কিন্তু শিরীষবাবুকে দেখিলেই ভালমানুষ নিরীহপ্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়। আসলেও তিনি অতিশয় মৃদু অসহায়প্রকৃতির লোক, মোটেই শক্তিমান পুরুষ নহেন। দৃঢ়হস্তে সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া থাকিবার মত সামর্থ্য তাঁহার মোটেই নাই। ঘরের মধ্যে গৃহিণী এবং বাহিরে মুকুজ্জেমশাই তাঁহার অবলম্বন।

শিরীষবাবু বলিলেন, দশটা বেজে গেছে, আপনি আর দেরি করবেন না, সুশীল ব'সে আছে।

এই যে উঠি।

মুকুজ্জেমশাই উঠিয়া অমিয়ার সহিত বাড়ির ভিতরে গেলেন। অনেক কাজ এখনও বাকি। স্নান করিবেন, আহ্নিক করিবেন, স্বপাক ভাতে-ভাত

দুইটি কুটাইয়া লইবেন, আহারাদি করিয়া মৃন্ময়ের একবার খবর লইবেন। যদিও খবর পাইয়াছেন যে, মৃন্ময় সুস্থ আছে, তথাপি একবার যাইতে হইবে, তাহা না হইলে পাগলীটা অনর্থ বাধাইবে।

শিরীষবাবু ক্যালেণ্ডারের শিব ও প্রাচীর-বিলম্বিত অন্যান্য ঠাকুরদেবতার ছবিকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারও আপিসের দেরি হইয়া গিয়াছে।

৩৩

এত রূঢ় আঘাত প্রিয়বাবু জীবনে আর কখনও পান নাই। বেলা যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। কি একটা সামান্য কথা হইতে কি হইয়া দাঁড়াইল! প্রথম যেদিন বেলা চলিয়া গেলেন, প্রিয়বাবু আশা করিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই রাগটা কমিলেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া গেল, বেলা ফিরিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় বেলার গানের মাস্টার অপূর্ববাবু আসিয়া হাজির হইলেন। অদ্ভুত লোক এই অপূর্ববাবু! বেলাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন! মিনমিন করিয়া কথাবার্তা কন, ভদ্রলোকের মধ্যে কিছুমাত্র যদি পদার্থ আছে! ইঁহাকেই তিনি এ যাবৎ মাসে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা গনিয়া দিয়াছেন, অথচ এই সামান্য উপকারটি ভদ্রলোক করিতে পারিলেন না। বেলা যখন তাঁহাকে ফোন করিয়া ডাকিলেন এবং সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন উনি কি হিসাবে তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্করের সহিত যাইতে দিলেন, তাহা প্রিয়বাবু ভাবিয়া পাইলেন না। রাগ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না! লোকটি কেবল ছিমছাম পোশাক করিয়া 'অনুগ্রহ ক'রে' 'আশা করি' 'যদি কিছু মনে না করেন' প্রভৃতি কতকগুলি মোলায়েম অর্থহীন বুলি অসংলগ্নভাবে আওড়াইতে পারেন, আর কোন কর্মের নন। নিরীহ অপূর্ববাবুর প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় প্রিয়বাবুর সমস্ত অন্তঃকরণ

পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকের পাউডার-মাখা মুখে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাঁহাকে ইচ্ছাটি সম্বরণ করিতে হইল। কারণ, এই জাতীয় উত্তেজনাজনিত আকস্মিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া জীবনে তিনি বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন। একবার একটা সাহেবকে মারিয়া চাকুরি গিয়াছিল; বেলাও যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহাও এই হঠকারিতার জন্য। দ্বিতীয়ত, অপূর্ববাবুকে চটাইলে বেলার নাগাল পাওয়া শক্ত হইবে। অপূর্ববাবু শঙ্করবাবুকে চেনেন। তাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অপূর্ববাবুর সাহায্যে বেলার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কে এই শঙ্করবাবু? বেলার সহিত তাহার পরিচয় কবে হইতে এবং কি সূত্রে—প্রিয়বাবু কিছুই জানেন না অপূর্ববাবুও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রিয়বাবু যদি বেলাকে ভাল করিয়া না চিনিতেন, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত শঙ্করবাবুর সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছের নাটকীয় পরিকল্পনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু বেলাকে তিনি ভাল করিয়াই চেনেন। তাঁহার অসীম অহঙ্কার এবং পুরুষ-জাতির প্রতি অসীম অবজ্ঞার কথা প্রিয়বাবুর অপেক্ষা বেশি আর কে জানে! সুলভ উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইবার মত প্রকৃতি বেলার নয়। হালকা ফুলটির মত তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবেন, কিন্তু সহজে ডুবিবেন না। ডুবিলে এতদিন ডুবিয়া যাইতেন। তরঙ্গও অনেক আসিয়াছিল এবং উচ্ছ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেলার এই পদ্মপত্র-জাতীয় অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য প্রিয়বাবু মুখে অনেক চটাচটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি এই জন্যই বেলাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং ভয়ও করেন। বেলার দুর্দমনীয় স্বভাব প্রিয়বাবুর অনেক উৎকণ্ঠার ও নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সেই দুর্দমনীয় ব্যক্তিটি যখন তাঁহার সমস্ত একগুঁয়েমি লইয়া সহসা সরিয়া গেলেন, তখন প্রিয়বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বেলাবিহীন তাঁহার জীবন মস্তবড় একটা নিরর্থক শূন্যতা। বেলা ব্যতীত অপর কেহই সে শূন্যতা

পূর্ণ করিতে পারে না। সেদিন রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, বেলার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু কথাটা যে কত বড় মিথ্যা, তাহা এখন তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন। বস্তুত বিবাহ করিবার কোন কল্পনাই তাঁহার মাথায় নাই। প্রিয়বাবু বর্তমান যুগের সুবিধাবাদী সেই যুবকগোষ্ঠীর একজন, যাহারা নানা অজুহাতে নিজেরা বিবাহ করে না, কিন্তু যাহারা নিজেদের ভগ্নীদের বিবাহ দিবার জন্য সর্বদাই সমুৎসুক—অর্থাৎ নিজেরাই শুধু যে কোন দায়িত্ব লইতে চাহে না তাহা নয়, নিজেদের বিবাহ-যোগ্যা ভগিনী অথবা অন্য কোন পোষ্যার দায়িত্বভারও ভদ্রভাবে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বর্তমান সমাজের শিথিল বিধিব্যবস্থার কল্যাণে অবিবাহিত থাকিলেও ইহাদের চলিয়া যায় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সাধ্য বিলাসপ্রবণতার স্রোতে কোন ক্রমে ভাসিয়া থাকিবার মত সামান্য কিছু হয়তো ইহারা উপার্জন করে, কিন্তু সে উপার্জন সপরিবারে বিলাসের স্রোতে ভাসিবার মত সুপ্রচুর নহে। বিলাস বর্জন করিয়া জীবনের বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে ইহারা অনিচ্ছুক। যতটা সম্ভব হালকাভাবে এবং ভালভাবে ভাসিয়া থাকিতে পারাটাই ইহাদের লক্ষ্য, ঝামেলা জুটাইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করিতে ইহারা চাহে না, পারেও না। সুতরাং প্রিয়বাবুর বিবাহ করিবারও কোনরূপ কল্পনাই ছিল না। সেদিন শুধু রাগের মাথায় আর কোন যুক্তি না পাইয়া এই মিথ্যা কথাটাকে তিনি জোর গলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য এখনও মনে মনে তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। বেলা চলিয়া যাওয়াতে আর একটা কথাও তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া বেলাকে স্কন্ধ হইতে নামাইবার বহুপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে, সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন প্রথা-অনুযায়ী। আজ বেলার অনুপস্থিতিতে তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন যে, বেলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দণ্ড থাকিতে পারিবেন না। সে মুখরা দুর্বিনীতা বোনটিকে তাঁহার চাই, সে তাঁহার জীবনের যে অংশটি জুড়িয়া বসিয়া ছিল, সেখানে আর কাহাকেও বসানো চলিবে না। যে তীক্ষ্ণ দন্তটি সুযোগ পাইলেই কুট করিয়া জিহ্বাকে কামড়াইয়া

দিত, সেই তীক্ষ্ণ দন্তটির অন্তর্ধানে জিহ্বা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই শূন্য স্থানটার বারম্বার ডগাটুকু বাড়াইয়া আকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

সেদিন শঙ্করবাবু লোকটিকে তো তেমন খারাপ বলিয়া মনে হইল না। রাস্তায় অবশ্য দুই মিনিটের জন্য দেখা, কিন্তু ওই দুই মিনিটেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে। ভদ্রলোকের চোখে মুখে কি যেন একটা ব্যঞ্জনা আছে, যাহা আকৃষ্ট করে। শঙ্করবাবুর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া প্রফেসার গুপ্তের নিকটও প্রিয়বাবু গিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তের আচার-ব্যবহারেও নিছক ভদ্রতা ছাড়া আর কোন কিছু পান নাই। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বাগবাজারের বাসার ঠিকানা তো দিলেনই, আশ্বাসও দিলেন যে, তিনি মিস মল্লিককে বুঝাইয়া বলিবেন যেন তিনি এই সামান্য কলহটা মিটাইয়া ফেলেন। প্রফেসার গুপ্তের নিকট হইতে প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংবাদ পাইয়া কিন্তু আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম, বেলা আরও দুইটি টিউশনি যোগাড় করিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহার মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা; এবং দ্বিতীয়, তিনি একটি বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই দারোয়ানকে অতিক্রম না করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করা যাইবে না। দারোয়ান-প্রসঙ্গে প্রফেসার গুপ্ত যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই।—দারোয়ানটি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ। খুব বিশ্বাসী। এককালে মিলিটারিতে ছিল, এখন পেন্‌শন পাইতেছে। প্রফেসর গুপ্ত তাহাকে কিছুদিন পূর্বে রাখিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তই বেলাকে দারোয়ানটি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বেলাকে 'বেটী' সম্বোধন করিয়াছে এবং নামমাত্র বেতন লইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যোগাযোগ অতি সুন্দর হইয়াছে। জনার্দন সিংহের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটিও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। দেশে ফিরিবার আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। বাকি 'জিন্দ্‌গী'টা সে কলিকাতা শহরেই 'বিতাইয়া' দিতে অর্থাৎ অতিবাহিত করিতে চায়। সে পেন্‌শন যাহা পায় তাহাতে তাহার খাওয়া-পরাটা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু বাড়িভাড়া করিতে গেলে সঙ্কুলান হয় না। প্রফেসার গুপ্তের ওখানে সে আনন্দেই ছিল, কিন্তু মুখরা

মাঈজীর অত্যাচারে সে টিকিতে পারে নাই। কোথাও মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই পাইলেই তাহার চলে, সামান্য কিছু বেতন পাইলে আরও ভাল, কিন্তু স-সম্মানে সে থাকিতে চায়। 'ছোটা বাত' বলিয়া কেহ তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিলে সে সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং বেলার সহিত তাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। অতবড় বাসাটায় বেলার পক্ষে একা থাকা শক্ত এবং জনার্দনের পক্ষেও এমন একটা বাসা পাওয়া শক্ত। জনার্দন বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, স্নেহশীল। বেলাকে সে প্রকৃতই বেটীর ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমস্ত শুনিয়া প্রিয়বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, ভোজপুরী জনার্দন হয়তো তাঁহাকে ভিতরে যাইতেই দিবে না। অবশ্য জনার্দন না থাকিলেও যে প্রিয়বাবু নিঃশঙ্কচিত্তে যাইতে পারিতেন তাহা নয়, কিন্তু জনার্দন থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বাড়িটার আশেপাশে আনাচে-কানাচে প্রিয়বাবু দুই-একদিন সঙ্গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, অপূর্ববাবুকে দূত করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিতে হইবে। বেলার জিনিসপত্র—এস্রাজ সেতার কাপড়-চোপড় অপূর্ববাবুর মারফৎ বেলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বেলার মনোভাবটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহার পর দেখা যাইবে। অপূর্ববাবুকে বেলা নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেন না।

রবিবার সকালে গাড়ির মাথায় জিনিসপত্র লইয়া অপূর্ববাবু বেলা দেবীর বাসার দরজায় আসিয়া নামিলেন। দরজা খোলা ছিল। ঢুকিতে যাইবেন, এমন সময় জনার্দন সিং বাহির হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জেরাসে ঠহর যাইয়ে বাবুসাহেব।

জনার্দন সিংহের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অপূর্ববাবু একটু তড়কাইয়া গেলেন। মুখখানা সত্যই যেন সিংহের মত। মোচার মত কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফ মহিষের শিঙের মত যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বলিষ্ঠ চোয়াল, মাংসল নাক এবং তীক্ষ্ণ-চক্ষুসম্পন্ন জনার্দন সিং কিন্তু যথোচিত বিনয়সহকারেই প্রশ্ন করিল।

কেয়া মাংতে হেঁ আপ হুজুর ?

থতমত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, মিস মল্লিকের জিনিসপত্রগুলো এনেছি। মাঈজী কাঁহা ?

মাঈজী অন্দরমে হেঁ। আপ জেরাসে ঠহর যাইয়ে, হাম তুরন্ত্ খবর দে দেতে হেঁ। হুজুরকা নাম ?

অপূর্ববাবু।

অপূরব্বাবু।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক পরেই বেলা দেবী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন।

ও, আপনি এসেছেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। গাড়ির মাথায় ওসব কি ?

গলা-খাঁকারি দিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, মানে, আপনারই জিনিসপত্রগুলো, অর্থাৎ প্রিয়বাবুর সিচুয়েশনটা একটু, আমাকে তাই রিকোয়েস্ট্ করলেন—

অপূর্ববাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেটি মুখের সামনে ধরিয়া বার দুই কাশিলেন।

বেলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। চক্ষু পুনরায় হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, আচ্ছা বেশ, নামাতে বলুন তা হ'লে ওগুলো।

জনার্দন সিং নিকটেই ছিল, বলিল, আপ লোক ভিতর যাইয়ে, হাম কুল্ বন্দোবস্ত্ কর্ দেতে হেঁ।

অপূর্ববাবু ও বেলা ভিতরে গেলেন।

অপূর্ববাবু দেখিলেন, ইহারই মধ্যে একখানি ঘর বেশ সুন্দরভাবে বেলা দেবী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাশের একটি ঘরে ইক্‌মিকে রান্না হইতেছে। বেলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কোনরকমে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা যোগাড় করেছি। আমার সবচেয়ে দুঃখ এইটে যে, আপনাকে ছাড়তে হ'ল। আমার আর একটা টিউশনি যোগাড় হ'লেই আবার আপনাকে খবর দেব আমি। আরও শিখতে চাই।

অপূর্ববাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

টাকার কথা পেড়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না, মানে, আপনার যদি দরকার হয়, এমনিই এসে আমি—মানে, সন্ধ্যাবেলাটা ফ্রীও আছি আজকাল—

সন্ধ্যাবেলা আমি যে ফ্রী নেই। তা ছাড়া বিনা পয়সায় আপনাকে আমি খাটাব কেন, বাঃ!

না না, তার জন্যে কি হয়েছে? পয়সাটাকেই সব সময় প্রমিনেন্স্ দেওয়াটা—অর্থাৎ—

অপূর্ববাবু গলা-খাঁকারি দিয়া নীরব হইলেন।

চা খাবেন এক কাপ?

বেশ তো, যদি আপনার অসুবিধে না হয়।

না, অসুবিধে আবার কিসের?

বেলা নূতন প্রাইমাস স্টোভটি জ্বালিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে, বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল এবং উপরের দাঁত কয়টি অধরকে দংশন করিতে লাগিল। অপূর্ববাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত নীরবতার মধ্যেই চা-প্রস্তুত-পর্ব শেষ হইল। চা পান করিতে করিতে অপূর্ববাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলাকে বিনা পয়সায় পড়াইলে তিনি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—এই কথাটি ঠিক কি ভাবে বলিলে বেলার পক্ষে কন্‌ভিন্‌সিং হইবে, অর্থাৎ—

আপনি যাবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে যাবেন, দাদাকে দেব। আপনি চা খান ততক্ষণ, আমি লিখে নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে।

বেলা দেবী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিজের ছোট কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো টেবিলটির উপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর লিখিলেন—

দাদা,

অপূর্ববাবুর কাছে তোমাকে খাটো করবার ইচ্ছে হ'ল না ব'লেই জিনিসগুলো ফেরত দিলাম না। কিন্তু ওগুলো আমি ব্যবহার করতে পারব না, ওসব প'ড়ে থাকবে। নতুন বউদিদির যদি গান-বাজনার শখ থাকে, এস্রাজ

আর সেতারটা কাজে লাগতে পারে হয়তো। আমি ভদ্রভাবে মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছি, আমার জন্যে অনর্থক ভেবে তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমার একটা পেট চ'লে যাবেই। ইতি—

প্রণতা বেলা

খামে মুড়িয়া পত্রখানি অপূর্ববাবুর হাতে আনিয়া দিতেই একটু ইতস্তত করিয়া রুমাল দিয়া বারকয়েক ঘাড় মুখ মুছিয়া অপূর্ববাবু অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বসিয়া থাকিবার আর কোন সঙ্গত অজুহাত নাই।

মিস মল্লিক, গানের জন্যে আমাকে যদি আপনার দরকার হয়, তা হ'লে আনুহেজিটেটিংলি, মানে—

আচ্ছা, দরকার হ'লে খবর দেব।

নমস্কার করিয়া অপূর্ববাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই প্রফেসার গুপ্তের মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত জনার্দন সিংয়ের পুরাতন মনিব। সুতরাং সে সেলাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রফেসার গুপ্ত মোটর হইতে নামিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, মাঈজীকে একটু খবর দাও।

জনার্দন ভিতরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপ্ জেরাসে ঠহর যাইয়ে হুজুর, মাঈজী আস্নান কর্ রহি হয়।

প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলার এখানে এখন আসিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই আকর্ষণ বেশি। প্রয়োজনীয় কত জিনিসই তো করিবার আছে, কিন্তু করা হয় নাই। বেলার নিকট কোন প্রয়োজন নাই, দেখা করাটাই প্রয়োজন। বাড়িতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-গ্রস্ত খিটখিটে প্রৌঢ়া গৃহিণীর নানারূপ গঞ্জনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইয়া বেড়ানোটাই প্রফেসার গুপ্তের স্বভাব। তিনি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিস লইয়া কচকচি তাঁহার ভালই লাগে না। সুযোগ পাইলেই মোটরখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বেলার বাসাটি

তাঁহার আড্ডা দিবার স্থান হইয়াছে। বেলা মেয়েটিকে এখনও কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়েটি কেমন যেন একটু রহস্যময়। কেমন যেন একটা স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহার লীলা-চঞ্চল সজীবতা, উচ্ছল যৌবন-ভঙ্গিমা, পরিহাস-মধুর কথাবার্তা মনকে উতলা করিয়া তোলে, কিন্তু হাত বাড়াইলেই কোথায় যেন ঠেকিয়া যায়। ব্যবধানটা ঠিক যেন কাচের প্রাচীর, স্বচ্ছ অথচ শক্ত—সব দেখা যায়, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই বোধ হয় মনকে আরও লোলুপ করিয়া তোলে। প্রফেসার গুপ্ত এখনও ঠিক লোলুপ হইয়া উঠেন নাই, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ঔৎসুক্যভরে তিনি এই তরুণীটিকে লক্ষ্য করিতেছেন। বেলার শুধু যে তারুণ্য আছে তাহা নয়. বৈশিষ্ট্যও আছে।

স্নান সমাপন করিয়া বেলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আপনি এমন সময় হঠাৎ যে আজ ?

প্রেফেসার গুপ্ত কয়েক সেকেণ্ড কোন উত্তরই দিলেন না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

হঠাৎ ? আজকের আসাটাকে 'হঠাৎ' ব'লে মনে হ'ল যে হঠাৎ ?

এমন সময় আর কোনদিন আসেন না তো ?

আজ রবিবার, ছুটি আছে। নিছক গল্প করতেই শুধু আসি নি, কাজের কথাও আছে। অচিনবাবু ব'লে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ ক'রে দিন।

কথাবার্তা বিশেষ চালাই নি. একটা শুধু দরখাস্ত করেছি।

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না, খবর পেলাম, লোকটা সুবিধের নয়।

তাই নাকি ?

প্রশ্ন করিয়া বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমাকে এখুনি এক জায়গায় বেরুতে হবে।

বেশ, ও-বেলা আসা যাবে, আমারও একটা কাজ আছে গড়পারের দিকে, সেরে ফেলি সেটা। আপনি কোন্ দিকে যাবেন ? ওই দিকে হয় তো আসুন, আপনাকে একটা লিফ্‌ট দিয়ে যাই।

না, ওদিকে নয়, আমি যাব ভবানীপুরের দিকে। আপনি যান।

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলেন।

বেলা কোথাও গেলেন না, কারণ তাঁহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৩৪

প্রোটোটাইপ ওরফে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার জীবনের প্রথম প্রেম যে স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা সহসা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বেলা শুধু যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ প্রিয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়। ভদ্রলোক কেমন যেন এক রকম হইয়া গিয়াছেন। বেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন অর্থহীনভাবে চাহিয়া থাকেন এবং শেষে অসম্ভব রকম একটা উত্তর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। লক্ষ্মণবাবু দুইবার প্রশ্ন করিয়া দুই রকম উত্তর পাইয়াছে। প্রিয়বাবু প্রথমবার বলিয়াছিলেন যে, বেলা মামার বাড়ি গিয়াছেন, দুই-চারি দিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন। দুই-চারি দিন পরে বেলা যখন আসিলেন না, তখন লক্ষ্মণবাবু অতিশয় সঙ্কোচভরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছে, তাহা মর্মান্তিক। অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে প্রিয়বাবু বলিয়াছিলেন, আপনাদের পাঁচজনের জন্যেই তো সে চ'লে গেল। সে ঠিক করেছে, চাকরি ক'রে স্বাধীনভাবে থাকবে।

আমাদের জন্যে ?

প্রিয়বাবু কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সেই হইতে কথাটা চিন্তা করিতেছে। তাহার নিজের মনেও ক্রমশ সন্দেহটা দৃঢ়তর হইতেছে। বেলা হয়তো উত্যক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কথা তো সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না যে, বেলাকে একবার দেখিবার জন্য, তাঁহার গান শুনিবার জন্য সে নানা ছুতায়

জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কোন অছুহাতে বেলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। হয়তো তাহার এই মনোযোগ বেলার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; হয়তো তাহার এই কাঙালপনার জন্য বেলা মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিতেন। ক্ষুব্ধ ভিখারীকে এড়াইবার জন্য লোকে যেমন সরিয়া যায়, বেলাও হয়তো তেমনই তাহার পথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আলোকিত চৌরঙ্গীর বিচিত্র সৌন্দর্য, দ্রুতগামী অসংখ্য মোটর, নানা বেশে সজ্জিত চঞ্চল জনতা—সমস্ত যেন তাহার নিকট নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার মানদণ্ডটি সহসা যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, সেবার যখন অনার্স পাইল না, তখনও মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। সে পড়াশোনায় অবহেলা করে নাই, দিনরাত্রি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিল, অথচ অনার্স পাইল না। কোন আশাই তো জীবনে তাহার পূর্ণ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এম.এ.টা ভাল করিয়া পাস করিয়া অন্তত একটা ফার্স্ট-ক্লাস অর্জন করিয়া অনার্স না পাওয়ার ক্ষোভটা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বাবা তাহাতে বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আর পড়াশোনা করিয়া কাজ নাই, দোকান দেখ গিয়া। পিতার অবাধ্য হইবার মত শিক্ষা অথবা যোগ্যতা লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। পিতার আদেশ মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই রূঢ় আঘাতটা কম বেদনাদায়ক হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. হইয়া কোন কলেজের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা ভাঙা সাইকেলের দোকানের ময়লা চটের উপর বসিয়া ফাটা টিউব-টায়ার মেরামত করিতে লাগিয়া যাওয়া লক্ষ্মণবাবুর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নাই। কিন্তু বিপত্নীক পিতার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়াছেন, দাদাও সেদিন মারা গেলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নাই। দোকান দেখিবার মত মনের অবস্থা নয়। তাঁহাকে এ অবস্থায় সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়াই লক্ষ্মণবাবু দোকানে বসিতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু কই, দোকানে বসিয়াও সে বাবাকে সুখী করিতে পারিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না! বাবা রোজই তাহাকে অকর্মণ্য

বলিয়া গালাগালি দেন, উপহাস করেন। শেষে নিজেই পুনরায় দোকানে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সামান্ত একটা সাইকেলের দোকানের ভার লইবার মত যোগ্যতাও তাহার নাই? সত্যই নাই। অনর্গল মিথ্যা সে বলিতে পারে না, অথচ সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইলে যে চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন, তাহারও অভাব। সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্ত নিজের আদর্শ খর্ব করিয়াছে। কিন্তু পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। জীবনের জন্মলগ্নে বসিয়া কোন্ দুষ্টগ্রহ যে জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিতেছে, তাহা জানিয়াও তো লাভ নাই। বক্শি মহাশয়কে দিয়া গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইয়া কি লাভ হইয়াছে? কিছু যে হইবে না, তাহা অবশ্য বক্শি মহাশয় বলিয়াছিলেন। বক্শি মহাশয়ের কথাগুলা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল—কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করলেই যদি রুষ্টগ্রহ তুষ্ট হ'ত, মানুষের ভাগ্যপরিবর্তন করা সম্ভবপর হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না। আপনারাও নাছোড়, আমারও টাকার দরকার—তাই এইসব প্রহসনের অভিনয় করতে হয়।

অদ্ভুত লোক ওই বক্শি। স্বস্ত্যয়ন করিয়া কিছু তো হয় নাই। সহসা মৃতা জননীর মুখখানা লক্ষণবাবুর মনে পড়িল। তিনি সর্বদাই যেন শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ব্রত, উপবাস, আচার, নিয়ম করিয়া তিনি আজীবন শঙ্কিতচিত্তে সকলের মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতা যে আবার বিবাহ করিয়া মায়ের স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই, এইজন্যই সে পিতার প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাহার গৌরবহীন আদর্শচ্যুত জীবনে পিতার পত্নী-নিষ্ঠাই একমাত্র জিনিস ছিল যাহা গৌরব করিবার মত। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণবাবু নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় পিতা তাহাকে দোকানে বসাইয়া যেখানে যান, তাহা ভদ্রপল্লী নহে। সেখানে তাঁহার একজন রক্ষিতা আছে। লক্ষণবাবুর জীবনে গৌরব করিবার মত আর কিছু রহিল না। সমস্ত জীবনটা একটা ভাঙা সাইকেলের দোকানে ময়লা চটের উপর বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে

কাটাইয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সাধ্বী মাতাকে প্রত্যহ একবার অপমান করিতেছে, তাহারই খোশামোদ করিয়া, তাহারই সঞ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে ধন্য মনে করিতে হইবে। তাহার পর হয়তো কালক্রমে এক অপরিচিতা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া বেলার স্মৃতি সুগোপনে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত আজীবন প্রেমের ভান করিতে হইবে। দিব্যচক্ষে লক্ষ্মণবাবু তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের এই সম্ভাব্য আলেখ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। চৌরঙ্গীর প্রতি সৌধশীর্ষে নানাবর্ণের আলো জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—আবার জ্বলিতেছে। সম্মুখের পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তা দিয়া বিচিত্র আকারের কত মোটর আসিতেছে, যাইতেছে। জনতার স্রোত নির্বিকার সমারোহে বহিয়া চলিয়াছে।

নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্মণবাবু মানবনির্মিত পথের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের দিকে চাহিল না। চাহিলে দেখিতে পাইত, অন্ধকার মহাশূন্য; কেবল অন্ধকারই নহে, সেখানে জ্যোতিষ্কও আছে।

৩৫

প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর শঙ্কর যখন হস্টেলে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। কিন্তু সমস্ত অবসাদ মুহূর্তে অপসারিত হইয়া গেল—যখন সে দেখিল, মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি তাহার জন্য একটি পত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লইয়া সে খুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। যদি দুঃসংবাদ থাকে? যদি মিষ্টিদিদি লিখিয়া থাকেন যে, বিবাহ হওয়া অসম্ভব? তখন সে কি করিবে? আর যাহাই করুক, প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আর যাওয়া চলিবে না। রিনির সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে হইবে। এই নিদারুণ পরিণতির কথা মনে হওয়া মাত্র শঙ্করের চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, কেন সে মিষ্টিদিদিকে এসব কথা বলিতে গেল? যেমন চলিতেছিল, আরও কিছুকাল তেমন ভাবেই না হয় চলিত। আরও কিছুকাল রিনির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে

মিশিয়া তাহার মনের কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর কথাটা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে এমনভাবে আবিল করিয়া তোলা ঠিক হয় নাই। পত্রখানা হাতে করিয়া শঙ্কর স্পন্দিত-বক্ষে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাও অসম্ভব। পত্রটি খুলিতে হইল।—

শঙ্করবাবু,

সুসংবাদ আছে। আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। আপনি আপনার দিকটা সামলান। অনেক কথা আছে, যা চিঠিতে লেখা ঠিক নয়। আপনি যদি আসেন আজ একবার, বড় ভাল হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সোনা দিল্লীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। আপনি সেদিন সেই দুপুরে এসেছিলেন, তার পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে সোনা চ'লে গেল। অনেক অনুরোধ করলাম, কিছুতেই থাকল না। কি যে তার হ'ল, জানি না। আপনি আজ সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় আসবেন। আমি ঘটকালি করছি, আমার কিছু মজুরি চাই, অমনই ছাড়ছি না। আসবেন নিশ্চয়ই।

—মিষ্টিদি

একবার নয়, বার বার শঙ্কর পত্রখানি পড়িল। নিজের উত্তেজনার আতিশয্যে সোনাদিদির অকস্মাৎ দিল্লী চলিয়া যাওয়ার কোন বিশেষ অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বরং তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সোনাদিদিকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি গিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি ছাড়া বাড়িতে আর কেহ নাই। মিষ্টিদিদিও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না, তিনি স্নান করিতেছিলেন। সেই বালক-ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বলিল যে, মাঈজী এখনই আসিতেছেন, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার নজরে পড়িল—টেবিলের উপর কি একখানা বই রহিয়াছে। বইখানা টানিয়া লইয়া দেখিল, জেম্‌স জয়েসের 'ইউলিসিস'। বইটার নাম শুনিয়াছিল, পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। পিছনে

এক জায়গায় পেজ-মার্ক দেওয়া ছিল, সেখানে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; এবং কখন যে সে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর স্রোতে তলাইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ফিকে সবুজ রঙের অদ্ভুত পাতলা একটা শাড়ি তাঁহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শঙ্কর চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়াছে।

মিষ্টিদিদিই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

খুব চটছেন তো একা ব'সে ব'সে? কি বই ওখানা, দেখি? ও, 'ইউলিসিস'! যা-তা সব্ গাঁজাখুরি গল্প। অমন আবার নাকি হয়? কেন যে বইখানার অত নাম, আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারা সাহিত্যিক মানুষ।

একটু হাসি গোপন করিয়া মিষ্টিদিদি সম্মুখের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন ও শঙ্করের হাত হইতে বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন করিলেন, পড়েছেন বইটা?

না।

নিয়ে যান তা হ'লে। অনেক খবর পাবেন। এইবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এসব খবর জানাও দরকার এখন আপনার।

শঙ্কর একটু হাসিল।

মিষ্টিদিদি তাহা দেখিয়া ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে হাস্য-বর্ষণ করিয়া বলিলেন, হাসছেন যে বড়? অনেক কিছু শিখতে হবে এবার নারী নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস, আর তাকে বিয়ে ক'রে সুখী করা আর এক জিনিস।—বলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বইখানি মুড়িয়া সেটি শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিই বলুন না, মেয়েরা কিসে সুখী হয়? অত বড় বই পড়বার দরকার কি? আপনি তো পড়েছেন বইখানা, নিজের অভিজ্ঞতাও আছে কিছু—

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এসব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেলে কিছু হয় না। নিজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিল। সে-ই ছাঁকিতে যাইতেছিল; মিষ্টিদিদি বলিলেন, আমিই ছাঁকছি, তুই নীচেয় যা, সায়েব হয়তো এখুনি আসবেন।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রফেসার মিত্র আসবেন কখন? কোথা গেছেন তিনি?

একটু বিরক্তকণ্ঠে মিষ্টিদিদি বলিলেন, কলেজ, মীটিং, ডিনার, লেকচার, শেলি, শেক্সপীয়ার—এই সব নিয়েই আছেন উনি, আর কারও দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই ওঁর। একটা মানুষের চেয়ে বইয়ের আলমারিটা ওঁর কাছে বেশি দরকারী।

মিষ্টিদিদি চা ছাঁকিতে লাগিলেন।

রিনি কোথা?

শঙ্কর অবশেষে মরিয়া হইয়া প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল।

রিনি? আপনি আসবেন শুনেই সে পালিয়েছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, যা লাজুক মেয়ে, দেখবেন, ওর লজ্জা ভাঙাতেই এক যুগ কাটবে আপনার।

ইহার উত্তরে শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শঙ্করকে এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার অগাইয়া দিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি জোলা পড়েছেন?

না।

মোপাসাঁ?

না।

কি পড়েছেন তা হ'লে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

মিষ্টিদিদি নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভারতচন্দ্র ?

না, এখনও পড়ি নি।

মিষ্টিদিদি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, নিতান্ত শিশু আপনি। ফীডিং-বট্‌লে দুধ খাবার অবস্থা পার হয় নি এখনও আপনার। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে' পড়েছেন তো ?

পড়েছি।

কেমন লেগেছে ?

অতি চমৎকার।

বিমলার ওপর রাগ হয় নি-তো আপনার ?

না।

'নষ্টনীড়ে'র বউদিদির ওপরেও তো চটেন নি ?

চটব কেন ? কি যে বলেন আপনি !

মিষ্টিদিদি আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চা-টুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর তখনও চা পান করে নাই, খাবারগুলি খাইতেছিল। মিষ্টিদিদি বলিলেন, চা খান, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরও খাবার আনতে বলি ? প্যাটিগুলো কেমন হয়েছে ? আরও আসুক দুখানা, কি বলেন ?

আসুক।

মিষ্টিদিদি ঘণ্টা বাজাইলেন ও বলিলেন, গরম চাও একটু আনতে বলি, এ চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়।

হাত দিয়া শঙ্করের কাপের উত্তাপ অনুভব করিয়া মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, এ তো একেবারে হিম।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল ও আদেশ লইয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর শেষ প্যাটিখানিতে কামড় দিয়া বলিল, সুন্দর হয়েছে প্যাটিগুলো।

মাথা নাড়িয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আসলে আপনার খিদে পেয়েছে খুব।

খিদে পাবে না? সেই কখন কলেজ থেকে ফিরে মাত্র খানছয়েক লুচি খেয়েছি।

বুঝেছি, আপনার খিদে একটু বেশি। চেহারা দেখলেই তা মনে হয়।

চেহারা দেখে খিদে বোঝা যায়? আপনি ফিজিওগনমিও চর্চা করেন নাকি?

তা একটু একটু করি বইকি। আপনার পুরু পুরু ঠোঁট দুটো দেখলেই মনে হয়, ভয়ানক লোভী আপনি।

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেয়ারা আরও প্যাটি ও গরম চা দিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, এ প্যাটি কি আপনার বাবুর্চি তৈরি করেছে? চমৎকার করেছে কিন্তু।

আমি করেছি, সোনার কাছে শিখেছিলাম।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি, সোনাদি হঠাৎ চ'লে গেলেন কেন বলুন তো?

মিষ্টিদিদি ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? আপনিও সেদিন দুপুরে চ'লে গেলেন, সোনাও বাক্স গোছাতে বসল, পরদিনই সন্ধ্যের ট্রেনে চ'লে গেল। এত ক'রে থাকতে বললুম, কিছুতেই রইল না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, স্বামীকে ছেড়ে আছেও তো অনেক দিন, দোষও দেওয়া যায় না বেচারাকে।

মিষ্টিদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শঙ্কর প্যাটি ও চা লইয়া ব্যস্ত ছিল, হাসিটুকু দেখিতে পাইল না। হঠাৎ মিষ্টিদিদি বলিলেন, মোপাসাঁর Une Vie পড়েন নি, না?

না।

পড়ুন তা হ'লে। পড়া উচিত আপনার, আমার প্রাইভেট লাইব্রেরিতে আছে বইখানা, দাঁড়ান দিচ্ছি, এই ঘরেই আছে।

ঘরের কোণে একটা আলমারি ছিল, তাহার কপাটগুলাও কাঠের, কাচ

নাই। মিষ্টিদিদি উঠিয়া সেই আলমারিটা খুলিয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। শঙ্কর দেখিল, আলমারিতে এক-আধখানা নয়, বহু পুস্তক রহিয়াছে! বই দেখিলেই শঙ্কর কেমন যেন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। পড়ুক আর নাই পড়ুক, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে চা-টুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া মিষ্টিদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টিদিদির পাতলা ফিকা সবুজ শাড়িটার উপর ইলেকট্রিক আলো পড়িয়া শঙ্করের মনে কেমন যেন একটা অপরূপ মোহ সৃজন করিতেছিল। মিষ্টিদিদি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছিলেন।

এই নীচের তাকেই কোথায় যে রেখেছি, মনেও থাকে না ছাই।

শঙ্কর উপরের তাক হইতে মোটা চামড়া-দিয়া-বাঁধানো একখানা বই লইয়া খুলিয়া দেখিতে গেল বইখানা কি, খুলয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য গতিহীন হইয়া আবার উন্মাদবেগে বহিতে লাগিল। বই নয়, ফোটো-অ্যাল্‌বাম। এসব কি ফোটো? শঙ্করের সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। মিষ্টিদিদি আর একটু হেঁট হইয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শঙ্কর অ্যাল্‌বামটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মিষ্টিদিদি দেখিয়া ফেলেন নাই তো? কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক, ফোটোগুলি আর একবার দেখিতে হইবে। মিষ্টিদিদির পানে সে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি তেমনই হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছেন। ফিকা সবুজ পাতলা শাড়িটার উপর প্রখর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়াছে। স্পন্দিতবক্ষে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

না, এ ঘরে নেই দেখছি। দাঁড়ান, নীচে আছে বোধ হয়, দেখে আসি। একটুখানি বসুন আপনি, বেশি দেরি হবে না আমার।

মধুর হাসিয়া মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। আলমারি খোলাই রহিল। সন্তর্পণে শঙ্কর চোরের মত উঠিয়া গিয়া অ্যাল্‌বামটি বাহির করিয়া ফোটোগুলি দেখিতে লাগিল, রোগী যেমন করিয়া আচার চুরি করিয়া খায়।

…হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ। শঙ্কর তাড়াতাড়ি অ্যালবামটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মিষ্টিদিদি নয়, রিনি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। শঙ্করকে দেখিয়া একটু সলজ্জ অথচ গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টিদিদিও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রিনি এসেছে, দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কি লজ্জা মেয়ের, কিছুতে ওপরে আসবে না।

শঙ্কর বলিল, বইটা পেলেন?

না, বইটা নীচেতেও তো নেই। এই আলমারিটাতেই তো যেন রেখেছিলাম। দাঁড়ান, দেখি আর একবার। ওদিককার ওই সুইচটা টিপে দিন তো, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল।

শঙ্কর অবশ্য আলোর অভাব অনুভব করিতেছিল না, তবু আরও একটা আলো জ্বালিয়া দিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় বইখানা খুঁজিতে লাগিলেন। হয়তো আলোর অভাবেই এতক্ষণ বইখানা পাওয়া যাইতেছিল না, এইবার পাওয়া গেল।

মিষ্টিদিদি বইখানা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিলেন, আর কাউকে দেবেন না কিন্তু। বইখানা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল। অনেক দাম ওর।

শঙ্কর বইটা খুলিয়া দেখিল, টকটকে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে—To sweet Ye from sweet O, নীচে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটা তারিখ।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, বেচারী মারা গেছে। ওরই সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি?

বইখানা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর বলিল, যত্ন ক'রে পড়ব। এখন উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন কি? রিনির সঙ্গে একটু গল্প করুন। কোনও কথাই হ'ল না যে!

না, অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আসব। আজ থাক্।

[illegible] লিখেছিলেন বাড়িতে?

[illegible]ও লিখি নি, লিখব এবার। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

[illegible] উঠিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার [illegible] মধ্যে, মনের মধ্যে, সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা শুধু যে [illegible]নীয় তাহা নহে, অভূতপূর্ব। এমন উন্মাদনা তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

নেশায় টলিতে টলিতে সে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

৩৬

যদিও মৃন্ময় হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া বাড়িতে আসিয়াছে, তবু হাসির মনে স্বস্তি নাই। হাঁটিতে গেলে এখনও হাঁটুতে খচখচ করিয়া যখন একটু বেদনা লাগিতেছে, তখন আরও কিছুদিন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া একেবারে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া উঠা-হাঁটা করিলেই তো ভাল হয়। কিন্তু মৃন্ময় কিছুতে তাহার কথা শুনিবে কি! ওই পা লইয়াই বিশ্ব জয় করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিবেশী পরেশবাবুর বাড়িতে একটি ছেলে ডাক্তারি পাস করিয়াছে। পরেশবাবুর পিসীকে ধরিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া একটি মালিশের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন হাসি লিখাইয়া লইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, এই মালিশটি দিন-কয়েক ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইয়া দিলেই ওই সামান্য ব্যথাটুকু সারিয়া যাইবে। হাসি আজ তিন দিন ধরিয়া মালিশ আনাইয়া রাখিয়াছে, মৃন্ময়ের কিন্তু ফুরসৎ হইতেছে না। রোজই একটা না একটা কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আজ হাসি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছে, যেমন করিয়া হউক মালিশ করিবেই। রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিয়া দিলে চলে, কিন্তু মৃন্ময় তাহাতে কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, বিছানা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাণের চেয়ে বিছানা বড় হইল? অদ্ভুত লোক! অথচ দিনের বেলায় নানা কাজের ছুতায় কিছুতেই করিতে দিবে না। এমন কাজ-পাগল মানুষ হাসি আর কখনও

দেখে নাই। আজ বৈকালে খাকী হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-পরা [illegible] মিনুর্সে আসিয়াছিল, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে এই সন্ধ্যা [illegible] তাহার পর তাহারই সহিত আবার বাহির হইয়া গিয়াছে। [illegible] ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই। মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে [illegible] তিন দিন ধরিয়া ওষুধটা পড়িয়া আছে, পড়িয়া পড়িয়া শেষটা হয়তো [illegible] হইয়া যাইবে। ঝাঁজ চলিয়া গেলে কখনও ফল হয়?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। চিন্ময় [illegible] দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। মুকুজ্জেমশাই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পাগলী কই রে?

যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না। আপনি আপনার অমিয়াকে নিয়ে থাকুন গিয়ে।—বলিয়া হাসি উঠিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিল।

হাসি চাপিতে চাপিতে আসনে উপবেশন করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, চ'লে যেতে বলছিস, আবার আসন পেতে দিলি যে?

ইহার উত্তর না দিয়া হাসি ঘসঘস করিয়া বেগুন কুটিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, ভারি ওঁর এক অমিয়া হয়েছেন, সেই ছুতোয় আর এদিকে মাড়ানোই হয় না! একেবারে সেইখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! আমরা যেন কেউ নই!

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সুখে আছিস। অমিয়া বেচারীর বিয়েটা দিয়ে দিই, থাম্। তোর তো দুঃখু নেই আর।

বিয়ে আর দিতে হবে না কারুর। বিয়ে দিয়ে ভারি স্বর্গে তুলেছেন আমাকে! এক অন্যমনস্ক দামাল দুরন্ত লোক, কখন কি যে ক'রে বসে তার ঠিক নেই; তাকে সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হয়েছে আমার।

...াই কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে

...ন যে বড় ? থামুন, আপনার অমিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে একদিন ...দিয়ে আসছি, সে যেন কিছুতে না বিয়ে করে। এমন পাপের ভোগ ...নেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন, কি হয়েছে তাই বল্ না ?

না, ক্ষেপবে না! তিন দিন ধ'রে মালিশের ওষুধ নিয়ে ব'সে আছি, ফুরসৎই হ ২ না বাবুর। তার পর হাঁটু ফুলে পেকে একাকার হয়ে উঠুক, আবার তাই নিয়ে ভুগি আমি কিছুদিন

কিসের মালিশ ?

আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে তবু। আজ মালিশ না করলে ও-ওষুধে আর ফলই হবে না। ওষুধ বেশি বাসী হয়ে গেলে কি আর ফল হয় ?

আরে পাগলী, কিসের ওষুধ তাই বল্ না।

মালিশ, মালিশ। সে হাঁটুর ব্যথা এখনও সারে নি, তাই নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। মালিশের ওষুধ আনিয়ে রেখেছি সেই কবে, আজ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না। আজ আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, একটু বসুন, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে।

আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে রে!

লক্ষ্মীটি, একটুখানি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে ও। তামাক খাবেন ? আপনার জন্যে হুঁকো কলকে তামাক টিকে সব আনিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনারই দেখা নেই, তামাক খাবে কে ? ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, নেবে এস না একবার।

চিন্ময় নামিয়া আসিল ও মুকুজ্জেমশাইকে দেখিয়া পুলকিত হইল।—আপনি কখন এলেন ?

মুকুজ্জেমশাই তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমে একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, এই এখুনি।

হাসি চিন্ময়কে বলিল, তুমি ওঁকে নিয়ে ওপরের ঘরটায় [illegible] তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি। উনি এখেনেই [illegible]

মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, কেন? বেশ তো ব'সে আছি।

না, এখানে বসতে হবে না, যা ঠাণ্ডা, ভিজে [illegible] হয়েছে। ওপরেই গিয়ে বসুন।

মুকুজ্জেমশাই পুনরায় বলিলেন, তোর তরকারি কোটা হয়ে গেল?

ভারি তো তরকারি কোটা। হাতে কোনও কাজ ছিল না ব'লে সকালকার জন্যে কুটে রাখছিলুম।

চিন্ময় বলিল, চলুন ওপরে।

মুকুজ্জেমশাইকে উঠিতে হইল।

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাসি উপরে আসিয়া দে[খে] বাঘ-বকরির ছক পাতিয়া মুকুজ্জেমশাই চিনুর সহিত খেলিতে বসিয়া[ছেন]। হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, দেখুন, জল ঠিক হ[য়েছে] কি না! তাহার পর বক্রকটাক্ষে চিন্ময়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখন পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না, আমি খেলতে চাইলেই যত ক্ষতি হয়?

বাঃ, রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার সঙ্গে বাঘ-বকরি খেললে আমার ক্লা[সের] টাস্ক কে ক'রে দেবে? আর ভারি তো খেলতে জানেন, খেলতে বস[লে] তো হেরে যান!

তোমার মত চুরি করতে পারি না ব'লেই হেরে যাই। মি[থ্যুক] কোথাকার, ক্লাসের টাস্ক, না, হাতী। ক্লাসে তোমাদের গীতা পড়া হয়, আনন্দমঠ পড়া হয়? জানেন দাদামশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে খালি যা-তা পড়বে ব'সে।

মুকুজ্জেমশাই হুঁকার জল ঠিক করিয়া এবং হুঁকার উপর কলিক[া] স্থাপন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চি[ত] এবং মুখে মৃদু হাসি। আরও দুই-একবার টানিয়া চিন্ময়ের দিকে ফিরি[য়া] বলিলেন, বাড়িতে আবার অত পড়া কেন? বাঘ-বকরি খেলাই তো ভাল। এস, এবার শুরু করা যাক, তুমি বাঘ হবে, না, বকরি?

[illegible] আসুন, টস করা যাক।

হাসি বিস্ফারিত নয়নে বলিল, টস! টস আবার কি?

[illegible] দাও না তুমি। আচ্ছা থাক্‌, আমার কাছেই আছে একটা।

চিন্ময় উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা পয়সা বাহির করিল এবং যথারীতি টস করিল। চিন্ময় বাঘ হইল এবং মুকুজ্জেমশাই বকরি হইলেন। হাসি নীরবে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার বলিল, জোচ্চুরির নতুন একটা ফন্দি শিখেছে দেখছি। বকরি হ'লে ও কিছুতে পারে না, খালি হেরে যায়—কেমন চালাকি ক'রে বাঘ হয়ে গেল, দেখলেন?

মুকুজ্জেমশাই যেন বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেছেন না—এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া হাসির দিকে চাহিয়া বলিলেন, সব চালাকি বার করছি, দেখ্‌ না।

এতে আবার জোচ্চুরি কোথা দেখলে তুমি?

চিন্ময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিন্ময়ের অকৃত্রিম হাসির তোড়ে হাসি বেচারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মুখে সে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, তোমাকে চিনি না আমি যেন!

খেলা চলিতে লাগিল।

হাসি মুকুজ্জেমশাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

মৃন্ময় যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মুকুজ্জেমশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, চিন্ময়ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, হাসি কেবল একা জাগিয়া বসিয়া আছে। মৃন্ময় ভিতরে ঢুকিতেই হাসি কিছু না বলিয়া কেবল তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিল, কি, হ'ল কি?

হবে আর কি, রোজ যেমন হয়, খাও-দাও শুয়ে পড়, মালিশটা পচুক।

দরকার কি মালিশের? ব্যথা তো ক'মে গেছে, প্রায় নেই বললেই হয়।

তবু একেবারে সারে নি তো? চল, আগে মালিশ ক'রে খাবে। খুব খিদে পায় নি তো?

খিদে? না, খিদে খুব পায় নি। কিন্তু এখনও আমার একটু আছে, কদিন থেকে করাই হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি সেরে নিই সেটা। আসছি আমি।

মৃন্ময় বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘরে খিল দিয়া স্বর্ণলতাকে চি লিখিতে বসিল। বাঁকা বৃন্তের উপর রক্তজবার মত বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্প জ্বলিয়া উঠিল। লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে মৃন্ময় খানিকক্ষণ চুপ করি বসিয়া রহিল। এ কয়দিন চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া সে যে স্বর্ণলতার কাছে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই চিঠি লেখ বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কই, আগে তো এমন হইত না! একটু ইতস্ত করিয়া সে লিখিতে শুরু করিল—

প্রিয়তমাসু,

আমার অপরাধ অমার্জনীয় তাহা জানি; কিন্তু আমি তোমাকেও জা সেইজন্য আমার ভয় নাই। একটা কথা আজ তোমাকে বলিতে চাই। কথা আমার সহকর্মী মিস্টার মজুমদার ছাড়া আর কেহ জানে না। হাসিকে জানাই নাই। হাসি নিতান্ত ছেলেমানুষ, শুনিলে হয়তো কাঁদিয়া ভাসাই দিবে এবং বলিবে, পুলিসের চাকরি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তোমার জন্য পুলিসে চাকরি লইয়াছি এবং তোমাকে যতদিন না খুঁজিয়া পাইতে ততদিন এ চাকরি আমি ছাড়িব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণ যা তাহাতেও আপত্তি নাই। প্রাণ তো যাইতেই বসিয়াছিল, সেই কথাই আ তোমায় বলিব। কয়েক দিন পূর্বে আমি মোটর-চাপা পড়িয়াছিলাম ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমি অন্যমনস্ক লোক বটে, কিন্তু আমা দৃঢ় বিশ্বাস, অন্যমনস্কতার জন্য আমি চাপা পড়ি নাই। যে লোক আমাকে চাপা দিয়াছিল, সে যেন পিছু পিছু ছুটিয়া তাড়া করি আমাকে চাপা দিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, লোকটা ইচ্ছা করিয়া আমাকে চাপা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একবার এক ওয়েটিং-রুমে এক

[illegible]রা আমার ফোটো লইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া [illegible] গোপনে তাহার ফোটো লই। সেই ফোটোর সাহায্যে [illegible]জুমদার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকটার নাম অচিনবাবু, [illegible]র দালালি করে। লোকটার কি উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। [illegible]সে চাকরি করা বিপজ্জনক, কিন্তু তোমার জন্য আমি সমস্ত বিপদই [illegible]ণ করিব। একটা সুসংবাদও আছে। কর্তৃপক্ষ আমার শরীররক্ষী-হিসাবে দুইজন সশস্ত্র লোক দিয়াছেন এবং আমাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, খরচ তাঁহারাই দিবেন। একটা বড় বম্‌ব্‌-কেসের অনুসন্ধানের ভারও আমার উপর পড়িয়াছে। যদি ইহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারি, কাজে উন্নতি হইবে। তখন তোমাকে খোঁজার আরও সুবিধা হইবে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমাকে হয়তো আর খুঁজিয়া পাইব না। হয়তো তুমি আর বাঁচিয়া নাই, কিংবা হয়তো বাঁচিয়া থাকিলেও আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমাকে খুঁজিতেছ কি? নানারকম অসম্ভব কথা মনে হয়। আমার এ দুর্বলতার জন্য আমাকে মাপ করিও। আমার যতদিন শক্তি আছে ততদিন তোমাকে খুঁজিব, এবং যতদিন পাগল না হইয়া যাই, তোমার আশায় থাকিব···

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিল।

হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

৩৭

শৈল আপন মনে বসিয়া আলপনা দিতেছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার উপবাস করিয়া সে লক্ষ্মীপূজা করে, তাহারই আয়োজন চলিতেছিল। ঠাকুর-দেবতার প্রতি শৈলর খুব যে একটা ভক্তি আছে তাহা নয়, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, শৈল লক্ষ্মীপূজা করে সময় কাটাইবার জন্য। সোয়েটার বোনা, লক্ষ্মীপূজা করা, আচার জেলি প্রস্তুত করা, কার্পেটে ফুল তোলা, এমন কি ঝিয়ের মেয়ের ফ্রক

অন্তরদেশ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মানস-বী
তন্ত্রীতে অপরূপ সুর সৃষ্টি করিতেছিল, প্রতি মুহূর্তে রিনিকে ঘি
বিচিত্র স্বপ্ন তাহার কল্পলোককে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল,
তাহার মনোজগতে কোন বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। মিষ্টি দিদি
নিতান্তই বাহিরের পরিজন ছিলেন এবং রিনির জন্যই শঙ্কর মিষ্টিদি
কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন মুখে না বলিলেও হাব-ভাবে আ
ইঙ্গিতে মিষ্টিদিদি যেন স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত শঙ্করের তাহাই ম
হইয়াছে। মিষ্টিদিদির এই স্বরূপ এতই ভয়ঙ্কর ও মনোরম, এতই অপ্রত্যাশিত
ও স্বাভাবিক, এতই প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট, এতই লোভনীয় ও অনুচিত যে, শঙ্ক
দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। এত দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কয়দি
সে কিছুই করিতে পারে নাই। দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম করিয়া যাইতেছে বটে, কি
তাহা যন্ত্রচালিতবৎ। ক্লাসে যাইতেছে, লেকচার শুনিতেছে, প্র্যাক্টিকাল ক্লা
করিতেছে, পরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলিতেছে, কিন্তু আসলে মে
মনে সে এই অতলস্পর্শী গহ্বরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করা ছাড়া আ
কিছুই করিতেছে না।

বাড়িতেও চিঠি লিখে নাই। বাড়ি হইতে বাবার পত্র পাইয়াছে যে
এখন মাকে কলিকাতায় লইয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। এ পত্র পাইয়া সে
নিশ্চিন্তই হইয়াছে। নিজের মায়ের এই নিদারুণ অসুখেও সে উদ্বিগ্ন হইতে
পারিতেছে না ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতেছে
কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। চিন্তিত হইবার ভান করিয়
একখানা পত্র লিখিবে ভাবিয়াছে, তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। অর্থাৎ কো
কিছু করিবার মত মানসিক সক্রিয়তা তাহার নাই। তাহার সম্মোহিত ম
একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে যেন তলাইয়া গিয়াছে, সহজভাবে কো
কিছু করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। রিনিকে দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বে
সে রিনিদের বাড়ি আর যায় নাই। শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছি
বলিয়াই যে যায় নাই তাহা নহে, মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়াছে তো! মনের কাছে
কিছুই তো অগোচর নাই! নিজের মনের এই দুর্বলতায় নিজের কাছেই সে

অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়াই রিনির নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। নিজের সংকোচ তো আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে ইহাও তাহার মনে হইতেছে যে, হয়তো তাহার চোখে মুখে ব্যবহারে রিনি তাহার অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাইবে, হয়তো ভাবিবে—কি ভাবিবে তাহা আর ভাবিতে চাহে না, জোর করিয়া অন্য কিছু ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে জবরদস্তি চলে না। রিনির বিস্মিত ব্যথিত নির্বাক মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, রিনি যেন তাহার কলুষিত সত্তার পানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কিছু বলিতেছে না। তাহার চোখের দিকে আর সে তাকাইতে পারে না। কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। রিনি তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে, ইহা চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসহ্য। কল্পনার আকাশ-কুসুমে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা, সামান্যতম গ্লানিও স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই ছিল আদর্শ। সেই আদর্শকে সহসা মলিন দেখিয়া শঙ্কর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ রবিবার। সমস্ত দিন কিছু করিবার নাই। গত কয়েক দিন ক্লাস প্রভৃতি লইয়া সময়টা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে, আজ এই অস্বস্তিকর অবকাশ তাহাকে পীড়ন করিতেছে।

আশ্চর্য মানুষের মন! একই মন তাহাকে কত রকম পরামর্শই না দিতেছে! কত পরস্পরবিরোধী যুক্তি একসঙ্গে এক নিশ্বাসে বলিতেছে ও খণ্ডন করিতেছে। তাহার মনে পড়িল, অনেক দিন আগে সে একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের সম্মুখে সুমতি কুমতির তর্ক শ্রবণ করিয়া ভাবিয়াছিল, এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাহা কর্তব্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহা যে কোন সুস্থ ব্যক্তি অবিচলিতচিত্তে করিবে। শুধু যে উচিত বলিয়াই করিবে তাহা নয়, করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া করিবে। সুস্থ সবল ব্যক্তির মনে সুমতিরই স্থান আছে, কুমতির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নিজেকেও এতদিন সুস্থ সবল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের মনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু সুমতি-কুমতি নয়, বহু প্রকার মতি আসিয়া ভিড় করিয়াছে, এবং সকলের যুক্তিই সে

সমান আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার কার্যের সমর্থক একটা যুক্তিই কিন্তু ক্রমশ মনের মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া সে ভাবিতেছিল, পুরুষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কি আছে? যে লোলুপ কামনা তাহার মনের মধ্যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রেরণা যোগাইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক্ষণ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে? সমাজ সংস্কার সমস্তই কৃত্রিম। কৃত্রিমতার জবরদস্তিতে অকৃত্রিম পৌরুষকে, বলিষ্ঠ যৌবনের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল। মিষ্টিদিদিকে সে যাহা ভাবিতেছে, তিনি তাহা নাও হইতে পারেন। জোলা মোপাসাঁ পড়িলেই যে খারাপ হইতে হইবে অথবা কতকগুলি ছবি গোপনে রাখিলেই যে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে—এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। নিছক আর্ট-প্রীতির বশেই এসব করা অসম্ভব নহে। অকস্মাৎ হয়তো সেজন্য তাহার মনের মধ্যে একটা লুব্ধ পশু, একটা ক্রুদ্ধ ঋষি এবং একটা আর্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া তিন রকম চিন্তা করিতে লাগিল। প্রেমিক চিন্তা করিতেছিল না, ধ্যান করিতেছিল, প্রার্থনা করিতেছিল—এ সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া যাক। নির্মল মনের মাঝে মিনির অকলঙ্ক সলজ্জ মুখখানি সগৌরবে আবার বিরাজ করিতে থাকুক।

সহসা বাহিরে খসখস শব্দ হইল।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদির পাচক-ভৃত্যটি পত্র লইয়া আসিয়াছে। সেলাম করিয়া জানাইল, মাইজী জবাব চাহিয়াছেন।

শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

এর মধ্যেই যে পুরোদস্তুর জামাই হয়ে উঠলেন দেখছি, নেমন্তন্ন না করলে আর আসাই হয় না! মিনি বেচারা কয়েক দিন থেকে মনমরা হয়ে আছে, আমার কথা আর নাই বললাম। উনি কাল এক বন্ধুর সঙ্গে গিরিডি গেলেন এই উইক-এণ্ডটা কাটিয়ে আসতে। ভারি একা লাগছে আমাদের। আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন নিশ্চয়ই। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন।

আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁকে ফোন ক'রে আজও রাত্তিরের মত ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। কটা নাগাদ আসবেন, এর মারফৎ জানাবেন। প্রস্তুত থাকব।
—ইতি

মিষ্টিদিদি

চাকরের হাতেই জবাব দিতে হইল, বেশিক্ষণ গবেষণা করিবার অবসর মিলিল না। লিখিয়া দিল, সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে। ব্যাপারটার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপটুভাবে শিস দিতে লাগিল।

৩৯

ওরিজিনাল অর্থাৎ দশরথ সাইকেলের দোকানে বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বেশবাস আগের মতই—টাইট-ফিটিং গলা-বন্ধ চকোলেট রঙের সোয়েটার, খাকী হাফপ্যাণ্ট, পায়ে আজানু কপিশবর্ণের মোজা, মাথায় কান-ঢাকা কালো রঙের টুপি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তিনি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূমপান করিতেছিলেন।

ভন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভন্টুরও সেই সাবেক মূর্তি। মালকোঁচা-মারা, গায়ে বুকখোলা জামা এবং পার্শ্বে সাইকেল। ভন্টু যথাবিধি নমস্কার করিয়া (ওরিজিনালের পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছা এবং সাহস ভন্টুর কোনদিন হয় নাই) বিনীত ভদ্রভাবে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

ওরিজিনাল কোনও উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভন্টু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের চোখ দুইটি লাল, হঠাৎ দেখিয়া মনে হয়, চোখ উঠিয়াছে। হয়তো বরাবরই তাঁহার চক্ষুর বর্ণ এইরূপ, কারণ ভন্টু ইতিপূর্বে এত কাছে আসিয়া তাঁহার চক্ষু লক্ষ্য করিবার

সুযোগ পায় নাই। ওরিজিনালকে চিরকালই সে দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্মণবাবুর সহিতই তাহার কারবার এবং তাহা এ যাবৎ ওরিজিনালের অগোচরেই হইয়াছে। গত তিন-চার দিন হইতে সে কিন্তু লক্ষ্মণবাবুর পাত্তা পাইতেছে না। নিবারণবাবুর চায়ের দোকানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভন্টু দেখিয়াছে, লক্ষ্মণবাবু সন্ধ্যার সময় আসে না। লক্ষ্মণবাবুর বাড়িটাও ঠিক কোন্‌খানে, তাহা ভন্টুর জানা নাই। সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে এই সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত দেখা হইত। গত দুই দিন হইতে কিন্তু প্রোটোটাইপের দেখা নাই। হয়তো তাহার দোকানের ডিউটির সময় বদলাইয়াছে, হয়তো আজকাল সে সন্ধ্যায় না আসিয়া দুপুরে আসিতেছে। ব্যাপারটা ঠিক জানিয়া লওয়া দরকার, কারণ সাইকেলটি পুনরায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে প্রোটোটাইপের হদিস না পাইলে হাঁটিয়া আপিস যাইতে হইবে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাই আজ ভন্টুকে ওরিজিনালের সম্মুখবর্তী হইতে হইয়াছে।

ওরিজিনাল কোন উত্তর দিলেন না। রক্তচক্ষু মেলিয়া ভন্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল এবং পুনরায় সবিনয়ে বলিল, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

আমি কি লক্ষ্মণবাবু?

এ প্রশ্নের জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সে অবিলম্বে দিল, আজ্ঞে না।

তা হ'লে আমার কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন?

লক্ষ্মণবাবু কখন দোকানে আসেন, তাই জানতে চাইছিলাম।

তিনি দোকানে আর আসেন না, আসবেনও না।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তা হ'লে?

দেখা হবে না।

ওরিজিনাল আবার তাঁহার গড়গড়ায় মন দিলেন।

ভন্টু বুঝিল, এখন সুবিধা হইবে না, ভদ্রলোক চরম তিরিক্ষি হইয়া রহিয়াছেন। সে সাইকেলটি ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ওরিজিনাল বলিলেন, লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে বসুন ওইখানে।

ওরিজিনাল বাম হস্ত দিয়া তাঁহার গোঁফদাড়িটা একবার চুমরাইয়া লইলেন এবং নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দোকানের সম্মুখে ফুটপাথের উপর যে টিনের চেয়ারটি ছিল, সেইটি দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন, ওইটে একটু এদিকে টেনে এনে বসুন। সাইকেল সারাবেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়, পয়সা সঙ্গে নেই। কত পড়বে, সেইটে লক্ষ্মণবাবুর কাছে জেনে নিতে এসেছিলাম।

আমি ব'লে দিচ্ছি। যে সাইকেলের দোকানে লক্ষ্মণবাবু নেই, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

নীরব থাকাই ভন্টু সমীচীন মনে করিল।

ওরিজিনাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, বলুন আপনি, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে বইকি

ওরিজিনাল তাঁহার রক্তচক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গড়গড়ায় সুদীর্ঘ একটি টান দিলেন এবং আদেশ করিলেন, মটরা, সাইকেলটা তুলে দেখ্, কি করতে হবে আর কত পড়বে। আপনি বসুন, চেয়ারটা আর একটু টেনে আসুন এদিকে।

পিছনের ঘর হইতে লুঙ্গি-পরা মটরা বাহির হইয়া আসিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সাইকেলটি পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওরিজিনালের ধমকে নিরস্ত হইল। ওরিজিনাল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলতে কি কষ্ট বোধ হচ্ছে বাবুর? গতরে কি আগুন লেগেছে হুজুরের?

মটরা অবিলম্বে সাইকেলটা দোকানের উপর তুলিয়া ফেলিল এবং কাচের আলনার মত জিনিসটার উপর চাপাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, সামনের চাকার টায়ার-টিউব দুটোই নষ্ট হয়েছে, পেছনের চাকার অ্যাক্সেলের নাটটাও বদলাতে হবে। এখন থাক্, পয়সা সঙ্গে আনি নি—

বেশ তো, কাল পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন, কটার সময় চাই কাল?

কাল সকালবেলা পেলেই ভাল হয়।

বেশ, সকালেই পাবেন, তৈরি থাকবে।

মটরা বলিল, নতুন টায়ার ফুরিয়েছে।

চৌধুরীর ওখান থেকে নিয়ে এস গিয়ে। যাও, এখুনি যাও, কাল সকালেই ওঁর চাই।

স্লিপ দেবেন?

এক ডজন টায়ারের অর্ডার আমার দেওয়াই আছে, গেলেই পাবে তুমি, পা চালিয়ে যাও।

মটরা চলিয়া গেল।

ওরিজিনাল গড়গড়ায় মন দিলেন। ভন্টুও উঠিবে কি না ভাবিতেছিল, এমন সময় ওরিজিনাল তাহাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

পৃথিবীতে ক রকম লোক আছে জানেন?

মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রো প্রভৃতি কয়েক রকম শ্রেণীবিভাগের কথা ভন্টু পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সব তাহার মনে ছিল না। নিজের বিস্মরণশক্তির পরিচয় দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে সাধারণভাবে বলিল, অনেক রকম।

অনেক রকম নয়; দু রকম—জুয়াচোর আর খাঁটি।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া ওরিজিনালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওরিজিনাল বলিয়া চলিলেন, জুয়াচোরের সংখ্যাই অধিক। খাঁটির সংখ্যা কম। আর কয়েকটি খাঁটি লোকে একদল জুয়াচোরের পাল্লায় প'ড়ে অহরহই কষ্ট পাচ্ছে, এইটেই হ'ল সার কথা।

এই ধার কথা শুনিবার জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, আগ্রহান্বিতও ছিল না। ওরিজিনালকে কথায়-বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো হইতে পারে, এই ভাবিয়া সে তাহার প্রিয় বচনটির পুনরুক্তি করিল। জাতীয় লোকের কাছে এই বচনটি আওড়াইয়া ভন্টু প্রায়ই পাইয়াছে।

হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে, মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটছে।

ওরিজিনালও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া বলিলেন, গোটা রতে মাত্র দুটি খাঁটি লোকের দেখা পাবেন, দুর্যোধন আর ভীম। বাকি চোর।

ভন্টু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া ওরিজিনালের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

ও কি?

পায়ের ধুলো নিলাম আপনার, এমন ভাল কথা একটা শোনালেন।

ওরিজিনাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভন্টু ব্যঙ্গ করিল কি না। কিন্তু ভন্টু দক্ষ অভিনেতা, সমস্ত মুখচ্ছবিতে এমন একটা গদগদ শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইল যে, শেষ পর্যন্ত ওরিজিনাল মনে মনে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ভন্টু বলিল, ওর জন্যে কিছু মনে করবেন না, আপনি লক্ষ্মণবাবুর বাবা, আপনার পায়ের ধুলো নিলে দোষ আর এমন কি আছে? লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু।

ওরিজিনাল মুখ ফিরাইয়া গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, আপনার বন্ধুটি একটি প্রকাণ্ড জুয়াচোর ছিলেন।

কে, লক্ষ্মণবাবু?

হ্যাঁ, লক্ষ্মণবাবু।

মানে?

মানে, আমি তাদেরই জুয়াচোর বলি, যাদের মনে মুখে এক নয়, যারা

ভাবে এক রকম, করে আর এক রকম। গাঁটকাটাদের আমি জুয়াচোর বলি না, তারা খাঁটি লোক।

জুয়াচোরের এবম্বিধ সংজ্ঞা ভন্টু এই প্রথম শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ওরিজিনালের আর একবার পদধূলি সে লয়, কিন্তু ওরিজিনালের কথাবার্তায় এমন একটা আন্তরিকতা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, তাঁহাকে অপদস্থ করিতে ভন্টুর ইচ্ছা হইল না। ওরিজিনাল গড়গড়ায় আবার একটি টান দিয়া বলিলেন দেখুন, আমি বেশ্যাসক্ত। রীতিমত মাইনে দিয়ে একজন রক্ষিতাকে আমি রেখেছি, তার কারণ স্ত্রীবিয়োগের পর দেখলাম, ওসব সংযম-টংযম আমার দ্বারা পোষাবে না, বিয়ে করাও পোষাবে না, তাই আইনত যেটা অন্ত উপায় আছে, সেইটেই আমি নিলাম। পেটে খিদে মুখে লাজ—এ রকম ভণ্ডামির কোন মানে আমি বুঝি না। এতে কি যে এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, তাও আমার মাথাতে আসে না। তুইও একটা রাখলে পারতিস, যার-তার আনাচে কানাচে অমন ছুং ছুং ক'রে না বেড়িয়ে পছন্দমত একটা মেয়েমানুষ রাখলেই পারতিস। টাকার তো অভাব ছিল না, ন্যায্য খরচে আমি আপত্তিও করি নি কোনদিন।

ওরিজিনাল পুনরায় গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিলেন।

ভন্টু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ওরিজিনালের এই স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সে কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ ওরিজিনাল বলিয়া উঠিলেন, জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার! এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এত বড় একটা দাগা দিতে লজ্জা করল না ওর? উনি আবার লেখাপড়া শিখেছিলেন, কচু শিখেছিলেন! গ্র্যাজুয়েট! ঝাড়ু মারি আমি অমন গ্র্যাজুয়েটের মাথায়।

ভন্টু ভাবিল, প্রোটোটাইপ নিশ্চয় কিছু টাকা মারিয়া সরিয়াছে। কি ভাবে কি ঘটিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সহসা ভন্টু লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তিনি নিষ্পলকভাবে সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া ভন্টু বলিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।